গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস

কাজী মোতাহার হোসেন

গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস

কাজী মোতাহার হোসেন

পড়ুয়া

গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস

কাজী মোতাহার হোসেন

গ্রন্থস্বত্ব	কাজী মোতাহার হোসেন ফাউন্ডেশন
প্রথম প্রকাশ	মাঘ, ১৩৭৬; ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০
পড়ুয়া সংস্করণ	শ্রাবণ, ১৪১১; জুলাই, ২০০৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ	মাঘ, ১৪২১; ফেব্রুয়ারি, ২০১৫
প্রকাশক	কবির আহমেদ পড়ুয়া আজিজ কো-অপারেটিভ সুপার মার্কেট # ৪৯ (নিচতলা) শাহবাগ, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন	৯৬৭২২২৬
web	www.porua.com.bd
প্রচ্ছদ	আনোয়ার ফারুক
মুদ্রণ	পঞ্চতারকা প্রিন্ট মিডিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট # ২৯৯ (দ্বিতীয় তলা) কাঁটাবন, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
মূল্য	দুইশো আটচল্লিশ টাকা
ISBN	984 8141 51 11

উৎসর্গ

বিজ্ঞানমনস্ক বাংলাদেশের মানুষকে

সূচিপত্র

কাজী মোতাহার হোসেন ফাউন্ডেশনের কথা ৭
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ৮
প্রথম সংস্করণের প্রসঙ্গ কথা ২৪
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ২৫
প্রথম পরিচ্ছেদ : সংখ্যার জন্ম ২৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সংখ্যা লিখন ৩০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : জ্যামিতি ও গ্রিক গণিতের স্বর্ণযুগ ৩৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আলজাব্রার গোড়ার কথা ৫৭
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ত্রিকোণমিতির অভ্যুদয় ৮০
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : লগারিদম ৯৭
সপ্তম পরিচ্ছেদ : নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) ১০৫
অষ্টম পরিচ্ছেদ : লাইবনিজ, গউস ও পরবর্তীগণ ১১৯

কাজী মোতাহার হোসেন ফাউন্ডেশনের কথা

কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) আমাদের দেশে বিংশ শতাব্দীর এক ক্ষণজন্মা পুরুষ। তিনি ছিলেন এমন এক বিরল বহুমাত্রিক ব্যক্তি যাঁর মধ্যে স্ফুরণ ও সমন্বয় ঘটেছিল অসামান্য গুণাবলীর। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের স্রোতধারা সাধারণতঃ পরস্পর ভিন্নমুখী। এই ভিন্নমুখী ধারার মিলিত স্রোতে অবগাহন খুব কম ব্যক্তির জীবনেই ঘটে। কাজী মোতাহার হোসেন সেই অসাধারণ স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিদেরই একজন।

তিনি একদিকে ছিলেন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী, অন্যদিকে বিদগ্ধ সাহিত্যিক। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর মনীষা ও খ্যাতি প্রবাদতুল্য। সহজ, সরল, বোধগম্য ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে রচনা অতি দুরূহ কর্ম। এই কর্মটি অপূর্ব দক্ষতার সাথে সম্পাদন করেছেন কাজী মোতাহার হোসেন। 'তথ্যগণিত', 'আলোকবিজ্ঞান', 'গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস' ও বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর বহু মননশীল প্রবন্ধ শুধু তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় বহন করে না, বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলা ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতা সম্প্রসারণেরও পরিচয় বহন করে। বাংলাভাষায় সৃজনশীল বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনায় তাঁর মর্যাদা আসলে পথিকৃতের।

'গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস' ১৯৭০ সালে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানের মর্মমূলে গণিতশাস্ত্রের স্থান। প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিম মানুষ যখন গুহাবাসী জীবনযাপন করত, তখন থেকেই গণনা বা বর্তমান গণিতের জন্ম। গণনা থেকে কীভাবে বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি ইত্যাদির বিকাশ হলো, কীভাবে "অঙ্কশাস্ত্র, কৃষিকার্য, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্পোন্নতি, যুদ্ধবিদ্যা, স্থাপত্য, দর্শনশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত বা উদ্বুদ্ধ হয়েছে", তা সহজ ও সরলভাবে, আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে মোতাহার হোসেন 'গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস'-এ বর্ণনা করেছেন। মৌলিক রচনা না হলেও রচনাটি অনুবাদও নয়। লেখক নিজেই বলেছেন "এ পুস্তক অনুবাদও নয়, অনুকরণও নয়— তবে অনুসরণ বটে।"

বইটি প্রকাশনার ব্যাপারে কাজী মোতাহার হোসেনের সুযোগ্যা কন্যা প্রফেসর সন্‌জীদা খাতুনের মূল্যবান পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। গণিতশাস্ত্রে উৎসাহী পাঠককূলের কাছে বইটি সমাদৃত হবে বলে আশা করি। তবেই কাজী মোতাহার হোসেন ফাউন্ডেশনের এই শুভ উদ্যোগ সার্থক হবে।

১৩ পার্ক রোড, বারিধারা
০ জুন, ২০০৪

মোহাম্মদ আবু হেনা

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন-এর লেখা 'গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস' গ্রন্থটি 'বাঙলা একাডেমী' থেকে ১৯৭০ সালে প্রথম ছাপা হয়েছিল; কিন্তু এর অন্তত এক দশক আগে বইটি রচিত হয়েছিল বলে সহজেই অনুমান করা চলে। কারণ লেখক স্বয়ং সংস্করণের ভূমিকায় স্বাক্ষরের সাথে 'জানুয়ারি ১৯৬২, ঢাকা' এ তারিখটি সংযুক্ত করেছেন। ফলত আজকের পাঠকদের হাতে বর্তমান সংস্করণের যে বইটি পৌঁছুবে সেটি আজ থেকে চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছর আগের লেখা। লেখক জীবিত থাকলে তিনি যে বইটির প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করতেন তাতে সন্দেহ নেই। সে বিশ্বাস থেকেই সম্ভবত বর্তমান প্রকাশক উপযুক্ত পণ্ডিতের সহায়তায় বইটির মুদ্রণ ঘটিত ও অন্যান্য প্রমাদ দূর করার চেষ্টা করেছেন। আমি যতদূর জানি, বইটির মূল বিষয় অক্ষুণ্ন আছে, প্রথম সংস্করণের সাথে মিলিয়ে দেখলেই পাঠক তা বুঝতে পারবেন।

বর্তমান সংস্করণের জন্য একটা ভূমিকা লেখার দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণে লেখকের একটা ভূমিকা সংযোজিত হয়েছে। তাই নতুন কোন ভূমিকার আবশ্যকতা হয়তো ছিল না। কিন্তু বর্তমান প্রকাশক মনে করছেন যে গত চল্লিশ বছরের মধ্যে গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস বিষয়ে অনেক নতুন গবেষণা হয়েছে, গণিতবিদ এবং পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, আর সে পরিপ্রেক্ষিতে নতুন যুগের পাঠকদের সামনে এ বইটিকে যথাযথ গুরুত্বের সাথে উপস্থিত করার জন্য নতুন একটি ভূমিকার প্রয়োজন। আমিও এ প্রস্তাবকে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেছি।

বইটির সূচীপত্র পাঠ করলেই পাঠক বুঝতে পারবেন যে এতে গণিতের বিভিন্ন বিষয় ও শাখার বিকাশের ইতিহাস এবং প্রাচীন ও আধুনিক গণিতবিদদের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্পর্কে লেখা হয়েছে। বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে (প্রথম সংস্করণে ১৪৪ পৃষ্ঠা, বর্তমান সংস্করণেও ১৪৪ পৃষ্ঠা) লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে গণিতের মূল বিষয়সমূহের

পরিচয় পাঠকদের সামনে উপস্থিত করেছেন। এ গ্রন্থ রচনার কাজে লেখক প্রধানত দুটো ইংরেজ বইয়ের সাহায্য নিয়েছেন বলে তিনি তাঁর ভূমিকায় জানিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ বইটি যে একটি মৌলিক রচনা এবং এতে যে লেখকের সারা জীবনের আহরিত জ্ঞানের প্রকাশ ঘটেছে তা বইটি পড়লেই বোঝা যায়। তবে, একথাও সত্যি যে, এ গ্রন্থ রচনার জন্য লেখককে ঐ দুটি বই ছাড়াও আরো অনেক গণিতবিদ ও গণিতের ঐতিহাসিকের রচনার উপর নির্ভর করতে হয়েছে। আর একথা কারো অজানা নয় যে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকরাও অনেক ভ্রান্ত চিন্তা ও সংস্কারের শিকার হয়ে থাকেন। ফলত ঐ সকল উৎসকে ভিত্তি করে যে বই লেখা হবে তাতে অবধারিতভাবে কিছু কিছু ত্রুটি থেকে যাবে।

বর্তমান গ্রন্থটিতে গণিতের যে ইতিহাস প্রদত্ত হয়েছে তা এক অর্থে বাস্তবসম্মত ইতিহাস। অর্থাৎ দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া গণিতের কালানুক্রমিক ও বিষয়ানুক্রমিক বিকাশের ইতিহাস এতে নির্ভুলভাবে বর্ণিত হয়েছে। তথাপি বর্তমান প্রজন্মের পাঠককে এটা পরিপূর্ণ তৃপ্ত নাও করতে পারে। কারণ এ যুগের চিন্তায় এতে কিছু অপূর্ণতা ধরা পড়তে পারে।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও গণিতবেত্তাদের মধ্যে কয়েকটি ভ্রান্ত সংস্কার লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত তাঁরা শ্বেতাঙ্গ জাত্যাভিমানে বিশ্বাসী এবং কৃষ্ণাঙ্গ ও এশীয়দের তুচ্ছ জ্ঞান করেন। (তাঁদের দেখাদেখি এশিয়া আফ্রিকার পণ্ডিতবর্গও নিজ নিজ দেশের জাতীয়তাবাদী উচ্চম্মন্যতার ধারণা নির্মাণ করে নিয়েছেন।) দ্বিতীয়ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা পুরুষ প্রাধান্যে বিশ্বাসী এবং তাঁদের লেখা ইতিহাসে ও গণিতের ইতিহাসে নারী জাতির অবদানের উল্লেখ সচরাচর দেখা যায় না। (এ বিষয়ে আমরাও একই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকি।) তৃতীয়ত, গণিতের ইতিহাস (এবং সাধারণ ইতিহাসও যে সামাজিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এ সত্যটা পাশ্চাত্যে বা প্রাচ্যে কোথাও যথার্থ স্বীকৃতি লাভ করেনি। এ যুগের পাঠক চাইবেন এ সকল ত্রুটিমুক্ত একটি ইতিহাস। (বলে রাখা ভাল, পাশ্চাত্যের সব পণ্ডিতই যে সংস্কারগ্রস্ত তা নয়, বস্তুত পাশ্চাত্যেই এখন পর্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে জ্ঞানের চর্চা অনেকাংশে অব্যাহত আছে। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ও গবেষকরা অনেক ক্ষেত্রেই মৌলিক সত্যকে আবিষ্কার করতে আগ্রহী; কিন্তু বর্ণগত বা জাতিগত অভিমানের বশে অনেক ঐতিহাসিকই ভ্রান্তির শিকার হন।)

বর্তমান গ্রন্থটিতে গণিতের ইতিহাস যতখানি এবং যেভাবে বিবৃত হয়েছে তা অক্ষুণ্ন রেখেও এ ভূমিকায় আমি কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই যা, আমার ধারণায়, পাঠককে তৃপ্ত করবে এবং নতুনভাবে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করবে। আমার এ ভূমিকাকে মূল গ্রন্থের পরিপূরকরূপে গণ্য করাই সংগত হবে। এ গ্রন্থে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, প্রধানত সে সব বিষয়ের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদানের ও তথ্যাদি সংযোজনের মধ্যেই আমি আমার প্রচেষ্টাকে সীমিত রাখব, তবে প্রসঙ্গক্রমে দু'একটি নতুন বিষয়ও আলোচিত হতে পারে।

মানব সমাজের বিকাশের ইতিহাসের মতোই গণিতের ইতিহাসও একটি গতিশীল ও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া — এ সত্যটা এখন পর্যন্ত পৃথিবীর পণ্ডিতবর্গ একবাক্যে মানতে সম্মত হন না। দুটো সংস্কার এ সত্যকে স্বীকার করার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। প্রথমত, পণ্ডিতরা মনে করেন, নিজ গুণে তাঁরা পণ্ডিত হয়েছেন; দ্বিতীয়ত নিজেদের জাতিকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ জাতি বলে মনে করেন। জাতির ধারণাকে বর্ধিত করে শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, ইউরোপীয়, এশীয়, খৃস্টীয়, অখৃস্টীয় ইত্যাদি কাল্পনিক জাতিভেদমূলক ধারণার প্রচার করা হচ্ছে। এর ফল হয়েছে এই যে, গণিতের আদি সূতিকাগার যে ব্যাবিলন এবং মিশর এ সত্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা সহজে মানতে চান না।

প্রাচীন গ্রীসে গণিত ও বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছিল একথা বলতে পারলে তাঁরা খুশি হন, যেহেতু গ্রীস একটি ইউরোপীয় দেশ।

আবার ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্য পণ্ডিতরাই মিশর ও ব্যাবিলনের গণিত চর্চার বিশদ পরিচয় উদ্ঘাটন করেছেন। বর্তমান গ্রন্থে সে বিষয়ে কিছু পরিমাণে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মিশর-ব্যাবিলনের বিজ্ঞান ও গণিতের সাথে পরিচিত হওয়ার ফলেই যে প্রাচীন গ্রীকরা জ্যামিতি, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা এবং বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যায় অভূতপূর্ব আবিষ্কার সাধনে সক্ষম হয়েছিল এ বিষয়টা ততখানি প্রকট হয়নি।

এ গ্রন্থে ব্যাবিলনীয়দের ষাট ভিত্তিক গণনা পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়টা বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন। ব্যাবিলনীয়রাই আজ থেকে চার পাঁচ হাজার বছর আগে, পৃথিবীতে প্রথম ৬০-ভিত্তিক স্থানিক অংকপাতন পদ্ধতি এবং শূন্য রাশির আবিষ্কার করেছিল। আমরা যেমন শূন্য সংবলিত ১০-ভিত্তিক সংখ্যা লেখন পদ্ধতি ব্যবহার করি, ব্যাবিলনীয়রা তেমনিভাবে ৬০-ভিত্তিক পদ্ধতিতে সংখ্যা লিখত। আমরা ৩৭ লিখলে যেমন ৩X১০+৭ বোঝায়, ব্যাবিলনীয়রা ৩৭ লিখলে তেমনিভাবে বোঝাত ৩X৬০+৭=১৮৭। আমরা যেমন ১ থেকে ৯ পর্যন্ত পৃথক পৃথক চিহ্ন ব্যবহার করি এবং দশ বোঝাতে লিখি একে শূন্য ১০, ব্যাবিলনীয়রা তেমনি ১ থেকে ৫৯ পর্যন্ত পৃথক পৃথক চিহ্ন ব্যবহার করত এবং ৬০ এর জন্য লিখত একে শূন্য ৬০। তবে শূন্য রাশিটার ব্যবহার করতে তাদের বহু শত বছর লেগেছিল। প্রথম অবস্থায় তারা বড় একটা ১ লিখে ৬০ বোঝাত; ১০১(=১X৬০^{২}+০X৬০+১=৩৬০১) বোঝাতে তারা একটু ফাঁক রেখে লিখত ১ ১; পরে তারা ধীরে ধীরে ১০১ লিখতে শুরু করেছিল। কিন্তু সংখ্যার ডান দিকে শূন্য লেখার বিষয়টা তারা বহুকাল পর্যন্ত কিছুতেই শিখে উঠতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত আলেকজান্ডার পারশ্য সাম্রাজ্য এবং প্রাচীন ভারতের অংশবিশেষ (বর্তমান পাকিস্তান) জয় করে নেওয়ার পর যখন ব্যাবিলন সেলুকাসের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল তারপরই (আনুমানিক ৩০০ থেকে ২০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে) ব্যাবিলনীয়রা 'একে শূন্য ষাট' লিখতে শিখল। ব্যাবিলনে গ্রীক পণ্ডিতরা ব্যাবিলনীয় পণ্ডিতদের সাথে একযোগে কাজ করতেন, তাই এটা কোন অবাস্তব সম্ভাবনা নয় যে গ্রীকদের সহযোগিতার ফলেই ব্যাবিলনীয় সংখ্যাপাতন পদ্ধতি (শূন্যসহ ৬০-ভিত্তিক লিখন পদ্ধতি) পূর্ণতা লাভ করেছিল।

গ্রীকরা ঠিকমত সংখ্যা লিখতে পারত না, তারা অক্ষরের সাহায্যে সংখ্যা লিখত এ কথা বর্তমান গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বস্তুত গ্রীকরা প্রথম ৯টা অক্ষর (আলফা, বিটা ইত্যাদি) দিয়ে ১ থেকে ৯ বোঝাত, পরের ৯টা দিয়ে ১০ থেকে ৯০ বোঝাত এবং শেষ নয়টা দিয়ে ১০০ থেকে ৯০০ বোঝাত। (গ্রীক ভাষায় ২৪টা মাত্র অক্ষর ছিল বলে অন্য ভাষা থেকে কয়েকটা চিহ্ন ধার করতে হয়েছিল।)

কিন্তু ঠিকমতো লিখতে না পারলেও গ্রীকরা মুখে মুখে দশ ভিত্তিক সংখ্যাই গণনা করত। তাই এটা খুবই সম্ভব যে গ্রীকদের প্রভাবে খ্রীস্টপূর্ব ৩০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে ব্যাবিলনে শূন্যসহ ১০-ভিত্তিক স্থানিক অংকপাতন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছিল। এজন্য গ্রীক-ব্যাবিলনীয় পণ্ডিতদের খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি। ব্যাবিলনীয়রা ৬০-এর গণ্ডীতে আটকে পড়েছিল, গ্রীকরা ১০-এর প্রচলন করল এবং শূন্যের ব্যবহার শিখে ৬০-ভিত্তিক এর বদলে ১০-ভিত্তিক সংখ্যা পাতন পদ্ধতির উদ্ভাবন করল। গ্রীকদের মাধ্যমেই এ পদ্ধতি প্রাচীন ভারতে প্রচলিত হয়ে থাকতে পারে, কারণ তৎকালীন ভারতের পশ্চিম বা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে তখন গ্রীকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

ব্যাবিলনীয় স্থানিক অংকপাতন পদ্ধতি (শূন্যসহ)

১	১১	২১	৩১	৪১	৫১
২	১২	২২	৩২	৪২	৫২
৩	১৩	২৩	৩৩	৪৩	৫৩
৪	১৪	২৪	৩৪	৪৪	৫৪
৫	১৫	২৫	৩৫	৪৫	৫৫
৬	১৬	২৬	৩৬	৪৬	৫৬
৭	১৭	২৭	৩৭	৪৭	৫৭
৮	১৮	২৮	৩৮	৪৮	৫৮
৯	১৯	২৯	৩৯	৪৯	৫৯
১০	২০	৩০	৪০	৫০	

১) ১ থেকে ৫৯ পর্যন্ত সংখ্যা

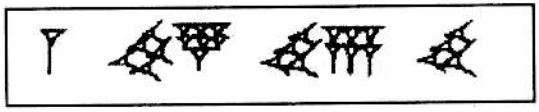

(১) (৫৭) (৪৬) (৪০)

২) ১, ৫৭, ৪৬, ৪০= ১X৬০^{৩}+৫৭X৬০^{২}+৪৬X৬০+৪০X১=৪২৪০০০

২, ২৭ বর্গ ৬,[০],৯

৩) ব্যাবিলনীয় পদ্ধতিতে ১৪৭ এর বর্গ যে ২১৬০৯ তা লেখা হয়েছে। এখানে আছে ২, ২৭ (১X২৭+২X৬০)=১৪৭, এবং বর্গ ৬,[০],৯ = ৯X১+০X৬০+৬X৩৬০০ =২১৬০৯)। ৬ এবং ৯-এর মধ্যে সমান ফাঁক রেখে শূন্যস্থান বোঝানো হয়েছে। পরবর্তীকালে শূন্যের একটি চিহ্নও উদ্ভাবিত হয়েছিল।

কিন্তু এ ব্যাখ্যা মানতে কোন দক্ষিণ এশীয় পণ্ডিত সম্মত হবেন না। এমনকি এ বিষয়ে যে কোন প্রকার অনুসন্ধান পরিচালিত হতে পারে তাও মানবেন না। পাশ্চাত্যেরা যেমন জাত্যাভিমানী, এশীয়রাও তেমনি স্বাজাত্য গর্বে গর্বিত। এ সংকীর্ণতা অবশ্য আমরা অনেকাংশে পাশ্চাত্যদের নিকট থেকেই লাভ করেছি।

ব্যাবিলনেই যে শূন্যসহ ১০-ভিত্তিক স্থানিক অংকপাতন পদ্ধতির (Place Value Notation with Zero) প্রবর্তন ঘটেছিল তা মনে করার আরো কারণ আছে। ব্যাবিলনের সভ্যতার সমকালে মিশরে ১০-ভিত্তিক গণনা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। প্রাচীন মিশরে ১, ১০, ১০০, ... , ১,০০,০০,০০০ প্রভৃতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক ব্যবহৃত হত। আর্কিমিডিস 'স্যান্ড রেকনার' (Sand-Reckoner) শীর্ষক গ্রন্থে অত্যন্ত বৃহৎ সংখ্যা লেখার পদ্ধতি বর্ণনা করেন। এটা কার্যত ব্যাবিলনীয় ৬০-ভিত্তিক পদ্ধতির অনুরূপ স্থানিক অংকপাতন পদ্ধতি— পার্থক্যের মধ্যে এর ভিত্তি ছিল ৬০-এর পরিবর্তে ১০,০০,০০,০০০ (দশ কোটি) এবং এতে শূন্য রাশিটির ব্যবহার ছিল না। আর্কিমিডিস যে ৬০-ভিত্তিক গণনা পদ্ধতির দৃষ্টান্ত দেখে তাঁর এ নতুন গণনা পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ দেখি না — ৬০-এর বদলে ১০,০০,০০,০০০-কে গণনার ভিত্তি রূপে গ্রহণ করার মতো মানসিক ক্ষমতা ও সাহস আর্কিমিডিস-এর ছিল। তবে তিনি শূন্য রাশির ব্যবহার কেন করলেন না তার দুটো কারণ থাকতে পারে। আর্কিমিডিস খ্রীস্টপূর্ব ২১২ অব্দে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তখনও হয়তো ব্যাবিলনে শূন্য রাশির সুষ্ঠু ব্যবহার প্রচলিত হয়নি। অথবা এমনও হতে পারে যে শূন্য রাশির তাৎপর্য অনুধাবন করা আর্কিমিডিসের মতো প্রতিভার পক্ষেও সম্ভব হয়নি। ব্যাবিলনীয় পুরোহিত-পণ্ডিতরা হাজার হাজার বছরের চেষ্টায় এবং অনুকূল সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় (ব্যাবিলনে তখন পরিমাপ এবং মুদ্রার মান ৬০-এর ভিত্তিতে গণনা করা হত; ৬০-ভিত্তিক গণনা পদ্ধতির উদ্ভাবনের এটা প্রধান কারণ) হাজার হাজার বছরের সাধনা এবং বহু সহস্র পণ্ডিত-কারণিকদের চেষ্টায় যে পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটেছিল, একজন ব্যক্তির পক্ষে সে অপরিচিত পদ্ধতি শুধুমাত্র প্রতিভাবলে আয়ত্ত করা কঠিন ও অসম্ভব। (বস্তুত, মিশরের কারিগরি বিদ্যা এবং মিশর-ব্যাবিলনের গণিতবিদ্যার সাথে পরিচয় না ঘটলে আর্কিমিডিসের উদয় ঘটত কিনা বলা কঠিন, ঘটত না মনে করাই অধিক সঙ্গত।)

সম্ভবত মিশরীদের ১০-ভিত্তিক সংখ্যা লেখার দৃষ্টান্ত দেখে 'স্যান্ড-রেকনার' গ্রন্থে আর্কিমিডিস অষ্টক (Octads) নামক ধারণার প্রবর্তন করে একক, দশক, শতকের মতো প্রথমে এক কোটি, ১,০০,০০,০০০, তারপর এক কোটি কোটি — এভাবে আট অংকের গুচ্ছরূপে সংখ্যাগুলোকে সাজিয়েছেন। এটা আসলে ১০-ভিত্তিক (যদিও শূন্যবিহীন) স্থানিক অংকপাতন পদ্ধতিই হল (একক, দশক, শতক, ..., কোটি, ১০ কোটি, ... ইত্যাদি); এ গ্রন্থ পাঠ করে ব্যাবিলনের পুরোহিত ও গ্রীক পণ্ডিতরা ১০-ভিত্তিক (শূন্যসহ) সংখ্যাপাতন প্রণালীর ধারণা লাভ করে থাকতে পারেন।

শূন্যসহ স্থানিক অংকপাতন পদ্ধতির প্রচলন আরো এক স্থানে দেখা যায়। সেটা হলো গুয়াতেমালায় তথা মায়া সভ্যতায় (খ্রীস্টপূর্ব আমল থেকে মোটামুটি ৯০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত)। মায়ারা ২০-ভিত্তিক ও শূন্য সংবলিত অংক লেখন পদ্ধতির প্রচলন করেছিল তবে তা ব্যাবিলনীয়দের মতো নিখুঁত ছিল না। আমি নানা দিক বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে ব্যাবিলনীয় গণনা পদ্ধতির সাথে পরিচিত ব্যক্তিবর্গ মায়া সভ্যতায় এ গণনা পদ্ধতির প্রচলন করেছিলেন (তাঁরা হয়তো ২০-ভিত্তিক গণনা পদ্ধতির সাথে পরিচিত ছিলেন, তাই ৬০-এর বদলে

২০-কে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন); মায়াদের পদ্ধতিতে অবশ্য 'শতকের' ঘরে ৪০০-র বদলে ৩৬০-কে স্থানীয় মান হিসাবে গ্রহণ করা হত (তারপর থেকে আবার প্রতি ঘরের স্থানীয় মান ২০ গুণ করে বৃদ্ধি পেত)।

মায়াদের শূন্যসহ ২০-ভিত্তিক অংকপাতন পদ্ধতি

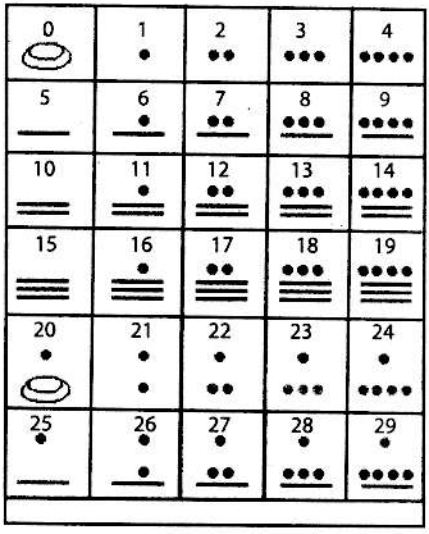

মায়াদের শূন্যসহ ২০-ভিত্তিক স্থানিক অংকপাতন পদ্ধতি। একটা বিন্দু (.) দ্বারা ১ এবং ক্ষুদ্র রেখা (−) দ্বারা ৫ বোঝানো হত এবং এদের সাহায্যে এক থেকে উনিশ পর্যন্ত লেখা হত। তারপর ছিল একে শূন্য কুড়ি, আমাদের যেমন একে শূন্য দশ। তবে মায়াদের অংক লেখায় সামান্য অসঙ্গতি ছিল — আমাদের ১০০, ১০০০ যেমন ১০X১০, ১০X১০X১০, মায়াদের তৃতীয় ঘরে ১০০-র অনুরূপ স্থানে ২০X২০-এর বদলে হত ৩৬০ এবং চতুর্থ ঘর বা ১০০০-এর অনুরূপ স্থানে হত ৩৬০X২০, ১০০০০-এর অনুরূপ স্থানে হত ৩৬০X২০X২০... ইত্যাদি।

চিত্রে একের পিঠে শূন্য দিয়ে ২০ দেখানো হয়েছে, একের পিঠে নয় দিয়ে ২৯ বোঝানো হয়েছে (যেহেতু ২০ ভিত্তিক গণনা পদ্ধতি)। মায়ারা সংখ্যা লিখত পাশাপাশি না, বরং উপর থেকে নিচে।
মায়া পদ্ধতিতে ৮, ১৪, ৩, ১, ১২ দ্বারা বোঝাত :
১২X১+১X২০+৩X(৩৬০)+১৪X(৩৬০X২০)+৮X(৩৬০X২০X২০)=১২৫৩৯১২

এত বিস্তৃত কথা লেখার একটাই কারণ। আমার দৃষ্টিতে, গণিতের বিকাশ একটা অবিচ্ছিন্ন ঘটনা। প্রাচীন মিশর ও ব্যাবিলনে হাজার হাজার বছর ধরে পুরোহিত পণ্ডিত ও কারিগররা যে সকল গাণিতিক ও যান্ত্রিক আবিষ্কার সাধন করেছিল, সে সকলকে আত্মস্থ করতে পারার ফলেই আর্কিমিডিসের পক্ষে এমন প্রতিভাশালী হওয়া সম্ভব হয়েছিল। আর্কিমিডিসের গাণিতিক ও যান্ত্রিক আবিষ্কারের পদ্ধতি গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন সকলকেই প্রভাবিত করেছে। বস্তুত

আর্কিমিডিসের মাধ্যমে মিশর-ব্যাবিলনের যুগসঞ্চিত জ্ঞান ও সাধনা আজকের জগতের অভাবিত বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে সম্ভব করে তুলেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এ বিষয়টাকে অস্বীকার করলে ইতিহাসের বিকাশ ব্যাহতই হবে, কারণ অসত্য এবং প্রগতি বিপরীতধর্মী।

প্রাচীনকালে মিশর ও ব্যাবিলনের গণিতচর্চা যে পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিল তার নানা পরোক্ষ প্রমাণ দেওয়া চলে। প্রাচীন ব্যাবিলনে সংখ্যা ও পাটিগণিতের (তথা বীজগণিতের) চর্চা প্রাধান্য পেয়েছিল, মিশরে জ্যামিতির চর্চাই বেশি হয়েছে। মিশরের প্রভাবেই প্রাচীন গ্রীসে জ্যামিতির চর্চা প্রাধান্য লাভ করে। থালেস, পিথাগোরাস প্রমুখ পণ্ডিতগণ মিশর ও ব্যাবিলন উভয়স্থানেই অবস্থান করেছেন এবং জ্যামিতি ও গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। মিশরের পুরোহিতরা জানতেন যে ৩, ৪, ৫ একক দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বাহু দিয়ে ত্রিভুজ গঠন করলে সেটি সমকোণী ত্রিভুজ হয়। এ সংখ্যাত্রয়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, $৩^২+৪^২=৫^২$। এ সত্য ব্যাবিলনীয়দের কাছেও অজানা ছিল না; বরং তারা ৩, ৪, ৫; ৫, ১২, ১৩ প্রভৃতি অসংখ্য ত্রয়ী সংখ্যা নিরূপণ করেছিলেন যেগুলো দিয়ে সমকোণী ত্রিভুজ তৈরি করা যায়। এ ধরনের তিনটি সংখ্যাকে এখন পিথাগোরীয় ত্রয়ী সংখ্যা (Pythagorean Triple) বলা হয় কিন্তু বাস্তবে সম্ভবত ব্যাবিলনীয় পাটিগণিত থেকেই পিথাগোরাস তাঁর নামে পরিচিত উপপাদ্যটি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করেন (পিথাগোরাস যে উপপাদ্যটি জ্যামিতিকভাবে প্রমাণ করেন তা হল : যে কোন সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গ, অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের সমষ্টির সমান।

প্রাচীন মিশরীয় অংকপাতন পদ্ধতি

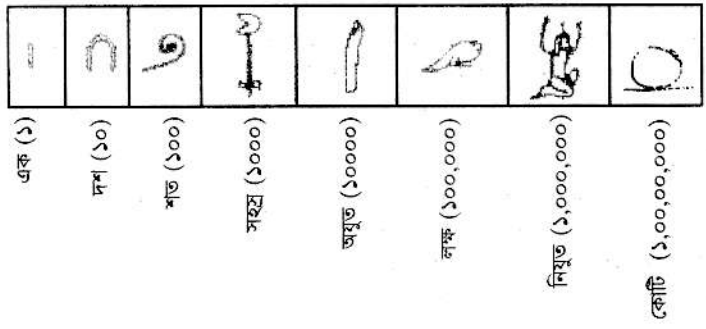

(১) প্রাচীন মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক লিপিতে এক, দশ, ..., ১ কোটি পর্যন্ত সংখ্যার প্রতীক। এর সাহায্যে এক কোটি কোটি পর্যন্ত সংখ্যা অনায়াসে লেখা যেত, তার চেয়ে বড় সংখ্যাও লেখা যেত।

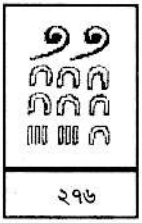

(ক)

(খ)

(২) প্রাচীন মিশরীয় লিপিতে অংকপাতন পদ্ধতি:

(ক) ২X১০০+৭X১০+৬X১=২৭৬;

(খ) ৪X১০০০+৬X১০০+২X১০+২X১=৪৬২২

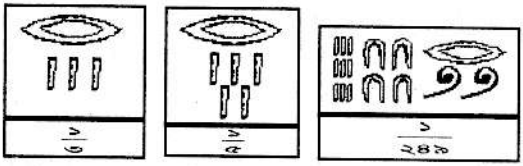

(৩) প্রাচীন মিশরে ভগ্নাংশ লেখার পদ্ধতি

মিশরের পিরামিড এবং কোণক-আকৃতির শস্যের গোলার সাথে পরিচয় ঘটার ফলেই প্রাচীন গ্রীকরা এ সকল জ্যামিতিক আকৃতির চর্চায় মনোনিবেশ করেছিল। মিশরীয়রা জ্যামিতিতে যত পারদর্শী ছিল, পাটিগণিতে ততখানি নয়। তার পরেও মিশরীয়রা ভগ্নাংশ লেখার এমন এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল যা পৃথিবীতে অনন্য এবং এখনও এটা সারা পৃথিবীর গণিতবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। মিশরীয়রা একক ভগ্নাংশ (অর্থাৎ যার লব ১ যেমন $\frac{১}{৫}, \frac{১}{৭}, \frac{১}{২৮}$ ইত্যাদি) ছাড়া অন্য কোনভাবে ভগ্নাংশ লিখতে বা কল্পনা করতে পারত না। আমরা যাকে অনায়াসে $\frac{৫}{৭}$ বলে চিহ্নিত করতে পারি, মিশরীয়দের কল্পনাতেও তা আসত না। তারা বড়জোর লিখতে পারত $\frac{২}{৭}=\frac{১}{৪}+\frac{১}{২৮}$। আহমেস বা আহমোজ প্যাপিরাসে তিন থেকে ১০১ পর্যন্ত হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশকে মিশরীয় ভগ্নাংশে প্রকাশ করা হয়েছে। যথা,

ক) $\frac{২}{২৯}=\frac{১}{২৪}+\frac{১}{৫৮}+\frac{১}{১৭৪}+\frac{১}{২৩২}$

খ) $\frac{২}{৯৭}=\frac{১}{৫৬}+\frac{১}{৬৭৯}+\frac{১}{৭৭৬}$

এ ধরনের ভগ্নাংশ পৃথিবীর অন্য কোথাও উদ্ভাবিত বা অনুকৃত হয়নি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, জার্মান গণিতবিদ নিউজ্‌বয়ার (Neugebauer) তাঁর শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে মিশরীয় ভগ্নাংশ (Egyptian Fractions)-এর উপর গবেষণা করেন। এভাবে প্রাচীন গণিতের প্রতি

আকৃষ্ট হয়ে তিনি প্রাচীনকালের আক্কাদীয় ভাষা শেখেন এবং প্রাচীন ব্যাবিলনীয় গণিতের দলিলসমূহের অনুবাদ করেন। এর ফলেই আমরা ব্যাবিলনীয় গণিত সম্পর্কে জানতে পেরেছি। পাশ্চাত্য গবেষকরা, দেখা যাচ্ছে, সকলেই সংস্কারাচ্ছন্ন নন; যাঁরা ইতিহাস লেখেন তাঁদের অনেকেই ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্তী হয়ে ভুল ইতিহাস লেখেন।

মিশরীয় ভগ্নাংশের উৎপত্তি কেমন করে হল সেটা অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যেই আমরা এত কথা ব্যয় করলাম। ব্যাবিলনীয় গণিতের দলিলে দেখা যায়, ১, ২ থেকে শুরু করে লক্ষ লক্ষ সংখ্যার বিপরীত ভগ্নাংশের তালিকা লিপিবদ্ধ করা আছে (যেমন ২-এর বিপরীত $\frac{১}{২}$, ৬ এর বিপরীত $\frac{১}{৬}$; ব্যাবিলনীয়রা অবশ্য ৬০-ভিত্তিক গণনা পদ্ধতির কারণে লিখত ২-এর বিপরীত ৩০, ৬-এর বিপরীত ১০, ইত্যাদি। এটা ছিল ব্যাবিলনীয়দের ভাগের নামতা, অর্থাৎ ১৫ দিয়ে ভাগ করতে হলে তারা $\frac{১}{১৫}$ দিয়ে গুণ করত। গুণের নামতার তালিকাও তাদের ছিল। এমনকি ব্যাবিলনীয়রা ভগ্নাংশ লেখার জন্য আমাদের মতোই দশমিক ভগ্নাংশ ব্যবহার করত, যদিও তাদের দশমিক ছিল ১০-এর পরিবর্তে ৬০-ভিত্তিক; অর্থাৎ দশমিক ভগ্নাংশে যেমন দশমিক বিন্দুর ডানপাশের সংখ্যাগুলো যথাক্রমে দশমাংশ, শতাংশ, সহস্রাংশ, অযুতাংশ ($\frac{১}{১০}, \frac{১}{১০০}, \frac{১}{১০০০}, \frac{১}{১০০০০}$) ইত্যাদি, ব্যাবিলনীয়দের ৬০-ভিত্তিক ভগ্নাংশে তেমন ছিল, যথাক্রমে $\frac{১}{৬০}, \frac{১}{৬০^২}, \frac{১}{৬০^৩}, \frac{১}{৬০^৪}$ ইত্যাদি।

ব্যাবিলনীয়দের বিপরীত ভগ্নাংশের তালিকা থেকে প্রেরণা পেয়ে মিশরীয়রা যদি তাদের ঐ অপরূপ ভগ্নাংশের প্রবর্তন করে থাকে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমি অনেক অনুসন্ধান করেও বিকল্প কোন সূত্রের সন্ধান পাইনি, আর পৃথিবীতে অন্য কেউ মিশরীয় ভগ্নাংশের উৎস নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন বলেও আমার জানা নেই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা প্রাচ্যের গণিত সম্পর্কে বড়ই উদাসীন।

এক স্থানের গণিত বা বিজ্ঞান অন্য স্থানের অন্য ব্যক্তির মনে কি প্রভাব ফেলতে পারে সেটা বোঝানোর উদ্দেশ্যেই উপরের কথাগুলো বলা হল। যেমন, আর্কিমিডিস যদি চিরকাল তাঁর জন্মভূমি সায়রাকিউজ-এ বাস করতেন এবং জ্ঞানার্জনের জন্য আলেকজান্দ্রিয়া তথা মিশর দেশে না যেতেন তাহলে প্রাচীন মিশর সাম্রাজ্যে উদ্ভাবিত বিভিন্ন কারিগরি বিদ্যা ও গাণিতিক আবিষ্কারের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটত না এবং সেক্ষেত্রে শুধু প্রতিভার গুণে তিনি এত বড় বিজ্ঞানী হতে পারতেন না। মিশরের পিরামিড নির্মাণের জন্য যে সকল কারিগরি বিদ্যা ব্যবহৃত হত তা দেখেই আর্কিমিডিস এ গ্রন্থের ৩৫-৩৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত যন্ত্রসমূহ, যথা, দণ্ড-যন্ত্র (Lever), আর্কিমিডীয় স্ক্রু (Archimedean Screw), যৌগিক কপিকল (Compund pulley), ফিঙ্গা (Catapult) প্রভৃতি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন এবং পানি-স্থিতিবিদ্যা (Hydrostatics), স্থিতিবিদ্যার নানা উপপাদ্য, বৃত্তের ও অন্য প্রকার বক্ররেখা বেষ্টিত জ্যামিতিক চিত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়, গোলকের ঘনফল নির্ণয় প্রভৃতি গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

আর্কিমিডিস সোনার মুকুটের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করার পন্থা বের করার চেষ্টা করতে গিয়ে কিভাবে পানিস্থিতিবিদ্যার আবিষ্কার করেছিলেন, ৩৬ সংখ্যক পৃষ্ঠায় তার বিস্তৃত বিবরণ আছে। সংক্ষেপে ঘটনাটা এরকম– একদিন আর্কিমিডিস গোসল করার টবে গা ডুবিয়ে দেওয়া মাত্র তিনি লক্ষ্য করলেন যে শরীরের ওজন কিছুটা হাল্কা হয়ে গেছে এবং টবের পানি খানিকটা উপচে পড়েছে। তখনই তাঁর মনে হল যে পানির মধ্যে কোন পদার্থকে ডুবিয়ে দিলে তার দ্বারা অপসারিত পানির ওজন ঐ পদার্থের ওজন থেকে কমে যাবে। এটাই কালক্রমে আর্কিমিডিসের সূত্র নামে পরিচিত হয়েছে।

আর্কিমিডিসের মনে বিদ্যুৎ চমকের মতো এ চিন্তাটা উদিত হওয়া মাত্র তিনি টব থেকে উঠে 'ইউরেকা! ইউরেকা!' বলে এক দৌড়ে রাজাকে খবর দিতে চললেন যে সোনার মুকুটের বিশুদ্ধতা নিরূপণের উপায় পাওয়া গেছে। (কারণ, মুকুটের সমান ওজনের একখণ্ড সোনাকে পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় মাপলে আর পৃথকভাবে মুকুটকে একই উপায়ে পানিতে ডুবিয়ে রেখে মাপলে যদি দুই প্রকার ওজনে তারতম্য ঘটে তাহলে বুঝতে হবে যে মুকুটের সোনায় খাদ মেশানো হয়েছে।)

আর্কিমিডিসের মনে এ সমাধানটা কিভাবে এল? পানিতে কোন জিনিসকে ডুবিয়ে দিলে যে তার আপাত ওজন কমে যায় তা কমবেশি সকলেই জানেন। নদীতে বা পুকুরে নেমে কলসীতে পানি ভরলে, যতক্ষণ ভরা কলসীটা পানির নিচে থাকে ততক্ষণ তার কোন ওজন আছে বলে মনেই হয় না। কিন্তু পানির উপরে ওঠালেই কলসীটা অত্যন্ত ভারী হয়ে ওঠে। শহরে আমরা যারা ড্রাম থেকে মগ দিয়ে পানি তুলে গোসল করি তখন প্রত্যেকেই আমরা লক্ষ্য করি যে পানির নিচে থাকাকালে পানি ভর্তি মগটা প্রায় ওজনহীন থাকে, কিন্তু পানির উপর ওঠালেই তার ওজন বেড়ে যায়। কিন্তু আর্কিমিডিসের সূত্র জানা না থাকলে এর ব্যাখ্যা আমরা জানতেই পারতাম না, যদিও পৃথিবীতে জ্ঞানী, প্রতিভাশালী ও বুদ্ধিমান লোকের অভাব নেই।

একথা ঠিক যে আর্কিমিডিস ঐ সময়ে অনেক দিন ধরে সোনার মুকুটের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছিলেন; কিন্তু এটাও ঠিক যে আর্কিমিডিস ঐ দিন জীবনে প্রথমবারের মতো টবের পানিতে পা রাখেননি। তরল পানি এবং কঠিন সোনায় কোন মিলও নেই। শুধু প্রতিভা ও চিন্তাশক্তির বলে আর্কিমিডিস ঐ সূত্র আবিষ্কার করতে পারতেন বলে মনে হয় না। জন্মাবধি গভীর শূন্যতায় নিমজ্জিত থেকে উন্নত চিন্তা করতে শেখা যায় না — প্রতিভা সামাজিক অভিজ্ঞতার কোন বিকল্প নয়, কোন অর্থেই নয়, কোনভাবেই নয়। সহস্র কোটি মানুষের অর্জিত সামাজিক অভিজ্ঞতাই এক একজন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করে; একেই আমরা প্রতিভা বলে থাকি।

যদি প্রতিভাই আবিষ্কারের মূল কারণ না হয়, তাহলে আর্কিমিডিস কিভাবে তাঁর ঐ সূত্রটি আবিষ্কার করলেন? এ বিষয়ে আমি কিছু চিন্তা ভাবনা করেছি (প্রতিভাকে একমাত্র ব্যাখ্যা মনে করলে অন্য প্রকারের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়ার দরকার হত না)।

প্রাচীন মিশরে ধাতব মূর্তি নির্মাণের জন্য 'মোম-হরণ পদ্ধতি' (Lost wax method) নামে একটা প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল। সোনা বা রূপার মূর্তি নিখুঁতভাবে তৈরি করা কঠিন বলে প্রথমে মোম দিয়ে মূর্তিটি নির্মাণ করা হত। তারপর তাকে পুরোপুরি কাদামাটি দিয়ে আবৃত করা হত। মাটি শুকিয়ে যাওয়ার পর পুরো জিনিসটাকে আগুনে পোড়ানো হত — ভেতরের মোম তখন গলে গিয়ে একটা ছিদ্র পথে বের হয়ে যেত। তখন মাটির ভিতর থাকত একটা ফাঁপা জায়গা। ঐ শূন্য স্থানে, অন্য একটা ছিদ্রপথ দিয়ে তপ্ত গলিত সোনা বা রূপা প্রবিষ্ট করানো হত। তরল ধাতু শীতল হওয়ার পর কঠিন আকার ধারণ করত এবং তার চেহারা হত লুপ্ত মোম-মূর্তির হুবহু অনুরূপ। মিশরে অবস্থানকালে আর্কিমিডিস নিঃসন্দেহে ঐ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন।

আর্কিমিডিস যখন পানির টবে নামলেন তখন হয়তো তাঁর মনে 'মোম-হরণ পদ্ধতি'র কথা মনে পড়েছিল। তিনি ভাবলেন পানিতে ডুবে থাকা তাঁর শরীরটা মোমের মূর্তির সাথে এবং তাঁকে ঘিরে থাকা পানিটা মোমকে ঘিরে থাকা কাদামাটির সাথে তুলনীয়। মনে মনে তিনি নিজেকে টবের পানি থেকে সন্তর্পণে বের করে আনলেন এবং পানির ভিতরে তার শরীরের মাপ সদৃশ স্থান ফাঁকা রইল। ঐ শূন্যস্থানটা তিনি মনে মনে সোনার মূর্তি দিয়ে পূরণ করলেন। তাহলে ঐ সোনার মূর্তি যে পরিমাণ স্থান অধিকার করে আছে ঐ আয়তনের পানির ওজন সোনার মূর্তির ওজন থেকে কমে যাবে।

আর্কিমিডিস এমন কেন ভাবলেন? তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন মোম হরণ পদ্ধতিতে, মনে করা যাক, মোমের মূর্তির ওজন ৩ কেজি, তাকে ঘিরে থাকা চৌকো আকৃতির কাদামাটির ওজন ১৬ কেজি, মোট ওজন করলে হবে ১৬+৩=১৯ কেজি। এখন ছিদ্রপথে গলিত মোম বের করে নিয়ে শূন্যস্থানটা ২৫ কেজি গলিত সোনা দিয়ে পূর্ণ করা হল। এবার ওজন করলে, আপাতদৃষ্টিতে, পাওয়া উচিৎ ১৯+২৫=৪৪ কেজি। কিন্তু মাপলে দেখা যাবে ওজনে আসছে ৪১ কেজি, কারণ ৩ কেজি ওজনের মোম ঐ চৌকো আকৃতির মাটির খণ্ড থেকে বেরিয়ে গেছে, মানে মোমের ৩ কেজি ওজন ঐ মাটি ও সোনার বাক্স থেকে কমে গেছে।

আর্কিমিডিস সম্ভবত এ ধরনের কোন কিছুই চিন্তা করছিলেন। তাঁর মতো প্রতিভার পথে এটা কল্পনা করা কোন কঠিন বিষয় না যে, তিনি মনে মনে পানিতে ডুবলেন, তাঁর শরীরের মাপের পানি অপসারিত হল, তিনি টব থেকে বের হয়ে এলেন কিন্তু তাঁর অধিকৃত স্থানটা শূন্যই রইল। এখন তিনি যদি ঐ শূন্যস্থানটা আবার পানি দিয়ে পূরণ করেন তাহলে ঐ পানির ওজন হবে শূন্য, যে কারণে এটা ডুববেও না, ভাসবেও না। যেটুকু পানি অপসারিত হয়েছিল তার ওজন কমেছিল, এখন পানি দিয়ে পূরণ করায়, বিয়োগ এবং যোগ হয়ে ফলাফল শূন্য হবে। আর যদি আর্কিমিডিস ঐ শূন্য স্থানে প্রবেশ করেন তাহলে তাঁর শরীর থেকে অপসারিত পানির ওজন কমে যাবে এবং তিনি নিজেকে হাল্কা বোধ করবেন। যদি ঐ শূন্য স্থানটা আর্কিমিডিসের আকৃতি ও পরিমাপ সম্পন্ন স্বর্ণমূর্তি দিয়ে পূরণ করা যায় তাহলে ঐ স্বর্ণমূর্তির ওজন থেকে অপসারিত পানির ওজন কমে যাবে (শুধু ডুবন্ত থাকা অবস্থাতেই অবশ্য এটা ঘটবে)। এরকম যে কল্পনা করতে পারলেন, এখানেই আর্কিমিডিসের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু যদি মোম হরণ পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা না থাকত তাহলে শুধু প্রতিভা দ্বারা এতটা কল্পনা করা যেত কিনা সন্দেহ।

আর্কিমিডিস মোটামুটি এ রকম চিন্তা করে তাঁর সূত্রের সন্ধান লাভ করে থাকলে এটাকে বলা চলে 'কাল্পনিক পরীক্ষণ' (thought experiment)। গোলকের ঘনফল (volume) এবং পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফল (surface area) প্রভৃতি তিনি এ ধরনের কাল্পনিক পরীক্ষণের সাহায্যেই নির্ণয় করেছিলেন। তাঁর এ ধরনের গবেষণা পদ্ধতি পরবর্তীকালে গ্যালিলিও, আইনস্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেছিলেন। আর্কিমিডিসের এটা একটা বড় অবদান।

আর্কিমিডিস যে প্রাচ্যের গণিত ও কারিগরি বিদ্যার সাথে পরিচিত ছিলেন তা সহজে কেউ স্বীকার করতে চান না, কিন্তু আমি অনুসন্ধান করে এ বিষয়ে কিছু প্রমাণ প্রাপ্ত হয়েছি। যেমন, আর্কিমিডিস 'বৃত্তের পরিমাপ' গ্রন্থের তৃতীয় উপপাদ্যে $\sqrt{৩}$ এর মান উল্লেখ করেছেন : $\sqrt{৩}$, $\frac{২৬৫}{১৫৩}$ থেকে বড়, কিন্তু $\frac{১৩৫১}{৭৮০}$ থেকে ছোট (অঙ্কের ভাষায় $\frac{২৬৫}{১৫৩} < \sqrt{৩} < \frac{১৩৫১}{৭৮০}$; $\sqrt{৩}$-এর ঊর্ধ্বসীমা এবং নিম্নসীমা কিভাবে পাওয়া গেল তা তিনি বলেননি এবং এখন পর্যন্ত কেউ তা জানেনও না (অবশ্য এটা ধরে নেয়াই স্বাভাবিক যে $\sqrt{৩}$-এর অন্তত একটা মান তখন গণিতবিদদের কাছে জানা ছিল, কারণ তা না হলে আর্কিমিডিস তা ব্যাখ্যা করে বলতেন)।

আমি অবশ্য অনুসন্ধান করে দেখেছি যে প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ শূল্যসূত্র-তে $\sqrt{৩}$ এর মান দেওয়া আছে :

$$\sqrt{৩} = ১ + \frac{২}{৩} + \frac{১}{৩\times৫} - \frac{১}{৩\times৫\times৫২}$$

যার মান, আশ্চর্যজনকভাবে, ঠিক $\frac{১৩৫১}{৭৮০}$ যা নাকি আর্কিমিডিসের প্রদত্ত দুটো মানের একটি। সম্ভবত, ব্যবিলন থেকেই সূত্রটি আর্কিমিডিস পেয়েছিলেন, কারণ সেখানেই এ বিষয়ে অর্থাৎ বর্গমূল নির্ণয় করার বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছিল।

আবার আর্কিমিডিস π-এর মান নির্ণয় করেছিলেন : $\pi, ৩\frac{১০}{৭১}$ থেকে বড় কিন্তু $৩\frac{১০}{৭০}$ থেকে ছোট (পৃ. ৩৭)। আমরা লক্ষ্য করি যে, $৩\frac{১০}{৭০} = ৩\frac{১}{৭}$ (এ মানটা আমরা এখনও ব্যবহার করি)। তিনি অনেক জটিল হিসাব করে এমন একটা সরল উত্তর কেমন করে বের করলেন? বস্তুত আর্কিমিডিস যে ফল পেয়েছিলেন তা হল বৃত্তের ব্যাসের তুলনায় তার বহির্লিখিত ৯৬-ভুজ বিশিষ্ট বহুভুজের পরিসীমার (অর্থাৎ ৯৬ বাহুর সমষ্টির) অনুপাত হচ্ছে $\frac{১৪৬৮৮}{৪৬৭৩\frac{১}{২}}$। এটাকেই তিনি উদ্দিষ্ট মান হিসেবে গণ্য করতে পারতেন। কিন্তু তিনি এরপর লিখলেন :

$$\frac{১৪৬৮৮}{৪৬৭৩\frac{১}{২}} = ৩ + \frac{৬৬৭\frac{১}{২}}{৪৬৭৩\frac{১}{২}}$$

$$\left[\langle ৩ + \frac{৬৬৭\frac{১}{২}}{৪৬৭২\frac{১}{২}}\right]$$

$$\langle ৩\frac{১}{৭}$$

এর অর্থ হল, π-এর মান তথা বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত $৩\frac{১}{৭}$ থেকে আরো কম (যেহেতু, বৃত্তের পরিধি বহির্লিখিত বহুভুজের পরিসীমার চেয়ে কম। এ থেকেই স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আর্কিমিডিস $৩\frac{১}{৭}$ এ মানটি পাওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। এর কারণ সম্ভবত এই যে প্রাচীন মিশর ও ব্যাবিলনে π এর মান হিসাবে $৩\frac{১}{৮}$, $\sqrt{১০}$, $৪\times\left(\frac{৮}{৯}\right)$ প্রভৃতি সংখ্যাকে ব্যবহার করা হত (শেষ দুটো সংখ্যার মান $৩\frac{১}{৬}$ থেকে কিছু পরিমাণে কম বটে)।

আর্কিমিডিস সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে π এর মানটি $৩\frac{১}{৬}$ থেকে অনেক কম এবং $৩\frac{১}{৮}$ অনেক বেশি। $৩\frac{১}{৭}$ মানটি π এর মানের নিকটবর্তী হয় কিনা তা যাচাই করতে গিয়েই সম্ভবত তিনি তাকে সঠিক প্রতিপন্ন করলেন। মিশর ব্যাবিলনের প্রাচীন গণিতের সাথে পরিচয় না ঘটলে আর্কিমিডিস এ পথে অগ্রসরই হতেন না।

এ গ্রন্থের লেখক কাজী মোতাহার হোসেন আর্কিমিডিস-কে প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞরূপে, এমনকি অন্য অনেকের সাথে একমত হয়ে, আর্কিমিডিসকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ হিসেবে গণ্য করেছেন। এটা যথার্থ বিচার। কারণ আর্কিমিডিসকে আমরা শুধু তৎকালীন পটভূমিতে গড়ে ওঠা সেকালের একজন প্রতিভাবান গণিতজ্ঞের দৃষ্টান্তরূপে গণ্য করি না। সে অর্থে এপোলোনিয়াসও একজন অসাধারণ প্রতিভা ছিলেন। কিন্তু আর্কিমিডিস কালের গণ্ডীকে অতিক্রম করেছিলেন– আধুনিক কালেও তাই আর্কিমিডিস-এর প্রভাব অনুভব না করে থাকা যায় না। ক্যালকুলাস গণিত তথা ডিফারেনশিয়াল ও ইনটিগ্রাল ক্যালকুলাসের প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে নিউটন ও লাইবনিজ-এর নামই বহুলভাবে প্রচারিত হয়ে থাকে। কিন্তু আর্কিমিডিস থেকেই যে এর উদ্ভব এবং আর্কিমিডিসের প্রভাবেই যে নিউটনের পূর্ববর্তী অনেক

গণিতজ্ঞ এ বিষয়ে গবেষণা করায় আধুনিক আকারে নিউটন-লাইবনিজের ক্যালকুলাসকে আমরা পেয়েছি তা এ গ্রন্থে উত্তমরূপে প্রকাশ করা হয়েছে।

আর্কিমিডিস-এর রচনা পাঠ করলে এবং তাঁর পদ্ধতি অনুধাবন করলে এ কথা স্পষ্ট হয় যে গণিত সর্বদাই বাস্তব জগৎ ও সামাজিক পটভূমির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বাস্তবের সাথে সম্পর্কহীন গণিত কোনদিন বেশিদূর অগ্রসর হতে পারবে না। গণিতের বিকাশকে বা যেকোন জ্ঞানের বিকাশকে বটগাছের বিস্তারের সাথে তুলনা করা যায়। বিশাল বটগাছ যখন একটা বড় কাণ্ডের উপর ভর করে চারপাশে শাখা প্রশাখা বিস্তার করতে থাকে তখন বিভিন্ন শাখা প্রশাখা থেকে বটের ঝুড়ি নেমে বারবার নতুন করে মাটির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। বাস্তব থেকে জন্ম নেয় গণিত; কিন্তু সে গণিতই যদি শুধু বিমূর্ত গণিতরূপে বাড়তে থাকে তাহলে অচিরেই তা অর্থহীন দর্শনের স্থান গ্রহণ করবে। আর্কিমিডিসের আবিষ্কার ও গবেষণা পদ্ধতি অনুধাবন করলে বোঝা যায়, বাস্তবের সাথে গণিতের সম্পর্ক তাঁর গবেষণায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল বলেই আধুনিক গণিতের ক্ষেত্রেও তাঁর পদ্ধতিকে প্রয়োগ করার সুযোগ রয়েছে।

আর্কিমিডিস তাঁর জ্যামিতিক উপপাদ্যগুলো যে পদ্ধতিতে প্রমাণ করেছিলেন তাতে বিশুদ্ধ গ্রীক জ্যামিতিক প্রমাণ পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তিনি ঐ প্রমাণিতব্য সূত্রগুলোর সন্ধানলাভ করেছিলেন যান্ত্রিক পদ্ধতির (mechanical method) সাহায্যে। অর্থাৎ তিনি প্যারাবোলা আকৃতির বা ত্রিভুজ আকৃতির জ্যামিতিক ক্ষেত্রকে মনে মনে দাঁড়িপাল্লায় মেপে এবং কিছু হিসাব করে তাদের ক্ষেত্রফলের সমতা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এভাবেই প্রথমে তিনি প্যারাবোলার (Parabola) যে কোন কর্তিত অংশের কালি নির্ণয় করেছিলেন। পরে বিশুদ্ধ গ্রীক জ্যামিতিক পদ্ধতিতে এর প্রমাণ আবিষ্কার করেন। শেষোক্ত পদ্ধতিতে প্রমাণ করার জন্য ২৪টি উপপাদ্যের প্রয়োজন হয়েছিল এবং প্রমাণের ধরণ ছিল বিকল্প খণ্ডন পদ্ধতি (Reductio ad Absurdum)। অর্থাৎ তিনি প্রথমে বলে নেন যে প্যারাবোলা বক্ররেখাটির যে কোন সরলরেখা দ্বারা খণ্ডিত অংশের ক্ষেত্রফল, ঐ রেখাকে ভূমি এবং প্যারাবোলার শীর্ষবিন্দুকে ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু ধরে যে ত্রিভুজ তৈরি করা যায় তার $\frac{৪}{৩}\times$ অংশ (অর্থাৎ খণ্ডিত প্যারাবোলার ক্ষেত্রফল = $\frac{৪}{৩}$ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল); তারপর প্রমাণ করেন যে এর বিকল্পগুলো ভুল অর্থাৎ খণ্ডিত প্যারাবোলার ক্ষেত্রফল প্রস্তাবিত কালি থেকে বেশিও না, কমও না — অতএব প্রস্তাবিত ক্ষেত্রফল (তথা $\frac{৪}{৩}\times$ ত্রিভুজ) সঠিক। কিন্তু ঐ উত্তরটি তিনি প্রথমে কিভাবে পেয়েছিলেন সে প্রশ্ন কেউ করতেন না, জ্যামিতিক প্রমাণ পেলেই তাঁরা সন্তুষ্ট হতেন। অথচ যান্ত্রিক বা বস্তুগত পরিমাপ পদ্ধতিতে আর্কিমিডিস মাত্র দুই পৃষ্ঠায় তা প্রমাণ করেছিলেন এবং ঐ প্রমাণ বর্তমান যুগে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য।

যান্ত্রিক পদ্ধতির বিষয়টি মাত্র একশ বছর আগে জানা গেছে। একটি প্যালিম্পসেস্ট্ থেকে আর্কিমিডিসের 'যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান নির্ণয়' (Methods Treating of Mechanical Problems) নামক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ ক্ষুদ্র গ্রন্থেই যান্ত্রিক মাপজোকের সাহায্যে গোলকের ক্ষেত্রফল, ঘনফল প্রভৃতি নির্ণয়ের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ প্যালিম্পসেস্ট্-এর আবিষ্কারের ফলেই আমরা প্রথম জানতে পারলাম যে, যদিও 'গোলক ও সিলিন্ডার' (On the Sphere and Cylinder) নামক গ্রন্থে একের পর এক ৩৪টি উপপাদ্য সাজিয়ে আর্কিমিডিস পূর্বোক্ত বিকল্প খণ্ডন পদ্ধতি বা 'রিডাক্শিও এ্যাড এবসার্ডাম' পদ্ধতিতে প্রমাণ করেন যে, গোলকের পৃষ্ঠতলের কালি ঐ গোলকের বৃহত্তম বৃত্তের (great circle) ৪ গুণ ($=4\pi r^2$) এবং গোলকের ঘনফল এমন একটি কোনকের ঘনফলের ৪ গুণের সমান যার ভূমি

ঐ গোলকের বৃহত্তম বৃত্তের সমান এবং উচ্চতা গোলকের ব্যাসার্ধের সমান (অর্থাৎ গোলক = $৪ \times \frac{১}{৩} \times \pi r^2 \times r = \frac{৪}{৩}\pi r^3$), প্রকৃতপক্ষে এ উত্তরগুলো আর্কিমিডিস প্রথমে যান্ত্রিক হিসাবের পদ্ধতিতে দুই কি তিন পৃষ্ঠায় প্রমাণ করেছিলেন। ঐভাবে উত্তরগুলো জানা থাকায় আর্কিমিডিস নানাভাবে চেষ্টা করে তৎকালে প্রচলিত গ্রীক জ্যামিতিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করেছিলেন।

আর্কিমিডিসের যান্ত্রিক হিসাবের পদ্ধতি বর্তমানকালে অনায়াসে যথার্থ প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হবে। অনেকে দুঃখ করে বলেন যে, তাঁর ঐ যান্ত্রিক সমাধান পদ্ধতি (বা সংক্ষেপে method) শীর্ষক বইটি আরো আগে আবিষ্কৃত হলে ভাল হত (এ পাণ্ডুলিপিটি উনিশ শতকের শেষ দিকে আবিষ্কৃত হয়েছিল, কিন্তু ১৯০৭ সালের আগে এর পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি)। তবে আমার ধারণা, বিলম্বে আবিষ্কৃত হওয়ায় এর গুরুত্ব আমরা সহজে অনুধাবন করতে পারি। আর্কিমিডিস যে এখনও কতখানি আধুনিক এবং কত গভীর পরিমাণে কালোত্তীর্ণ তা তাঁর এ গ্রন্থ থেকেই বোঝা যাবে।

গ্রীক জ্যামিতিবিদগণ (ইউক্লিড, এপোলোনিয়াস, আর্কিমিডিস প্রমুখ) যেসব জ্যামিতিক উপপাদ্য প্রমাণ করেছেন তাদের অনেকগুলোই তখন অকেজো অর্থাৎ বাস্তব প্রয়োগ রহিত বলে পরিগণিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের অনেক বাস্তব উপযোগিতা প্রমাণিত হয়েছে।

এপোলোনিয়াস কর্তৃক আলোচিত কোনক-ছেদ (conic section) নামে পরিচিত বক্ররেখা সমূহের পথই গ্রহ, উল্কা, শূন্যে উৎক্ষিপ্ত বস্তুখণ্ড প্রভৃতির চলার পথ। জোহান কেপলার গ্রহসমূহের গতিপথ নির্ণয়ের চেষ্টা করে বুঝতে পারেন যে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে উপবৃত্তাকার (ellipse) পথে পরিভ্রমণ করে। অনেক ধূমকেতুই প্যারাবোলা (parabola) আকারের পথে চলে।

আবার আর্কিমিডিস যে সকল অর্ধ-সমতলবিশিষ্ট ঘনবস্তু (semi-regular solids:তুলনীয় প্লেটোর সম-ঘনবস্তু) আবিষ্কার করেছিলেন তার একটি হচ্ছে: খণ্ডিত ২০ ও ১২-সমতলবিশিষ্ট ঘনবস্তু (Truncated Icosahedron, ২০টি ষড়ভুজ ও ১২টি পঞ্চভুজ দ্বারা আবৃত); অতি সম্প্রতি ঐ আকৃতির কার্বন অণু আবিষ্কার করে তিনজন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন (১৯৯৬ সালে, রসায়ন বিদ্যায়)। ঐ অণুর নাম দেওয়া হয়েছে বাকমিনস্টার ফুলারেন বা বাকি-বল, কারণ এটা দেখতে ইউরোপীয় সকার ফুটবলের মতোও বটে আবার মার্কিন স্থপতি ও বহুবিদ্যাবিদ বাকমিনস্টার ফুলার কর্তৃক নির্মিত বৃহৎ গোলাকৃতির স্থাপত্যকর্মের আকৃতিবিশিষ্টও বটে ('জিওডেসিক ডোম্' নামে পরিচিত এ স্থাপত্যকর্মটি ১৯৬৭ সালের বিশ্ব মেলায় প্রদর্শিত হয়েছিল)। গ্রীক গণিতবিদদের আবিষ্কৃত জ্যামিতির আরো অনেক প্রয়োগ ভবিষ্যতেও ঘটতে পারে। বাস্তবের সাথে এ সকল নব প্রতিষ্ঠিত সংযোগই গণিতকে অ-বিমূর্ত এবং বাস্তব নির্ভর করে রাখবে।

বর্তমান গ্রন্থে আলোচনা করা হয়নি, এমন দু'একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করতে চাই। আলেকজান্দ্রিয়ার বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক হেরন (Heron) একজন উচ্চ মানের গণিতবিদ ছিলেন। হেরন সম্ভবত ৬২ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেছিলেন (তাহলে মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়া তখন আর টলেমীদের অধীনে ছিল না বরং রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল)। হেরন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত নিম্নোক্ত বিখ্যাত উপপাদ্যটি প্রমাণ করেছিলেন: কোন ত্রিভুজের তিন বাহুর দৈর্ঘ্য a,b,c হলে,

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $\Delta = \sqrt{\frac{a+b+c}{2} \times \frac{b+c-a}{2} \times \frac{c+a-b}{2} \times \frac{a+b-c}{2}}$

এ আশ্চর্য উপপাদ্যটি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে এখনও প্রত্যহ ব্যবহৃত হয়; যথা,

$\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ যেখানে, $s = \frac{a+b+c}{2}$

পাশ্চাত্য লেখকের লেখা গণিতের ইতিহাস বিষয়ক যে কোন বইয়ে মহিলা গণিতবিদদের কথা আশ্চর্যজনকভাবে অনুক্ত থাকে। সাধারণভাবে ইতিহাস লেখকদের রচনায়ও মহিলাদের অবদানকে অগ্রাহ্য করা হয়। কেবলমাত্র মহিলা ইতিহাস লেখকদের রচনাতেই মহিলা বিজ্ঞানী ও গণিতবিদদের ভূমিকা ও অবদানের কথা স্বীকার করা হয়। একজন মহিলা ইতিহাস লেখক তো বলতে বাধ্য হয়েছেন যে 'পুরুষরা ইতিহাসকে ছিনতাই করেছে, (Men have hijacked history), যার অর্থ হল পুরুষরা ইতিহাস রচনার কালে সতর্কভাবে মেয়েদের ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন ভূমিকাকে নীরব অস্বীকৃতির মাধ্যমে অগ্রাহ্য করে থাকেন। স্থিরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, পুরুষদের এ অবৈজ্ঞানিক মনোভাব যে নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস রচনা পদ্ধতি তথা হিস্টরিওগ্রাফি (historiography) বিদ্যার একটা বড় ত্রুটি, তা আজ পর্যন্ত কোন পুরুষ ঐতিহাসিক বা পণ্ডিত শনাক্ত করতে পারেননি।

গণিতের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি, ছোট বড় অনেক পুরুষ গণিতবিদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মহিলা গণিতবিদদের কথা অনুক্ত থাকে।

প্রাচীনকালের একজন মহিলা গণিতবিদ হাইপেশিয়া (বা হাইপাথিয়া) থিওনের কন্যা হিসাবেই পরিচিত হয়েছেন, অথচ ঐ সময়ের পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী হাইপেশিয়া অল্প বয়সেই তাঁর পিতার চেয়েও অধিক গুণসম্পন্ন গণিতবিদে পরিণত হয়েছিলেন। থিওন নিজেও একজন বড় গণিতবিদ ছিলেন এবং হাইপেশিয়া (৩৫৫ বা ৩৭০-৪১৫ খ্রীস্টাব্দ) তাঁর পিতার কাছেই গণিতবিদ্যা শিখেছিলেন। এ মহিলা গণিতজ্ঞ জ্যোতির্বিদ্যা এবং গণিতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি এপোলোনিয়াসের কোনক-এর ছেদ (conic section) বিষয়ক উপপাদ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং এ সংক্রান্ত ধারণাবলীর বিস্তারসাধন করেন। তাঁর রচনার ফলেই এপোলোনিয়াসের উপপাদ্যসমূহ দীর্ঘকাল টিকে ছিল। পরবর্তীকালে ডেকার্টে, নিউটন ও লাইবনিজ তাঁর রচনার উপর কাজ করেছিলেন।

ফরাসী দেশের মহিলা গণিতবিদ ম্যারি-সোফি জার্মেন (Marie-Sophie Germain) (১৭৭৬-১৮৩১ খ্রীস্টাব্দ) অনেক প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গণিতচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন এবং উচ্চ পর্যায়ের গণিতের গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। প্রতিকূল পরিবেশ বলতে মহিলাদের উচ্চশিক্ষালাভের বিরুদ্ধে যে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ছিল তা বোঝানো হচ্ছে। সোফি জার্মেন গণিত শেখার জন্য পুরুষের নাম গ্রহণ করে অনেক কৌশলে গণিত শিক্ষকদের লেকচার নোট সংগ্রহ করেন এবং ক্রমে উচ্চতর গণিতে দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর গবেষণাপত্র পাঠ করে তখনকার শ্রেষ্ঠ গণিতবিদদের, যথা লেজেন্ডার, গাউস প্রমুখের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পয়সোঁ (Poisson), লাপ্লাস-এর মতো পণ্ডিতগণও শুধুমাত্র মহিলা বলে সোফি জার্মেনকে অবজ্ঞা করেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত বিশেষ ধরনের মৌলিক সংখ্যাকে 'সোফি জার্মেন মৌলিক সংখ্যা' (Sophie Germain Primes) নামে অভিহিত করা হয়। (ক এবং ২ক+১ উভয়েই যদি মৌলিক হয় তাহলে 'ক' একটি সোফি জার্মেন মৌলিক; যেমন ১১, কারণ ১১ এবং ২৩ [২X১১+১=২৩] উভয়েই মৌলিক; ২৯ও এরকম ধরনের একটি মৌলিক, কারণ ২৯, ৫৯ উভয়েই মৌলিক)। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, বড় বড়

মৌলিক সংখ্যার সন্ধান করতে গিয়ে গণিতবিদরা এখনও প্রতিনিয়ত সোফি জার্মেন মৌলিক সংখ্যা খুঁজে পাচ্ছেন। এরকম একটা ১,১৪,৭২৯ অংকের বৃহৎ মৌলিক সংখ্যা হল:

$ম = ২৫৪০০৪১১৮৫X২^{১১৪৭২৯} - ১$; কারণ,

$২ম+১ = ২৫৪০০৪১১৮৫X২^{১১৪৭৩০} - ১$-ও মৌলিক।

ম্যারি সমারভিল (Mary Somerville, ১৭৮০-১৮৭২ খ্রীস্টাব্দ) উনিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ। তাঁর একটি পুস্তকে তিনি বলেন যে, কোন একটি অজানা গ্রহের আকর্ষণের ফলে ইউরেনাস গ্রহের গতিপথে বিচ্যুতি ঘটছে। এ তত্ত্বের সূত্র ধরেই জ্যোতির্বিদ এডামস্ (Adams) নেপচুন গ্রহের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন।

উচ্চ পর্যায়ের আরো কয়েকজন মহিলা গণিতবিদের নাম উল্লেখ করলেই পাঠক ধারণা করতে পারবেন যে, গণিতের ইতিহাসে মহিলা গণিতবিদের অভাব নেই, অভাব রয়েছে তাঁদের নামোল্লেখের বিষয়ে। এমি নেথার (Emmy Amalie Noether, ১৮৮২-১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দ) জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই পড়াশোনা করেন। আধুনিক বীজগণিতের উচ্চতর শাখায় তাঁর অবদান পৃথিবীর গণিতবিদদের বিস্মিত করেছে এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে বহু ছাত্র গবেষণা করে গণিতশাস্ত্রের পরিধি বৃদ্ধি করেছেন।

হান্না নিউম্যান (Hanna Neumann) ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭১ সালে কানাডায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি উচ্চতর গণিতের গ্রুপ থিওরী বিষয়ে গবেষণা করেন এবং গণিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁর লেখা 'ভ্যারাইটিজ অফ গ্রুপ' (১৯৬৭) বইটি গণিতের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

কম্পিউটার এবং তথ্যপ্রযুক্তি আজকের পৃথিবীকে আমূল পাল্টে দিয়েছে; কিন্তু কম্পিউটার প্রযুক্তির বিকাশ সাধনে মহিলা গণিতবিদরা যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন সে বিষয়ে ইতিহাস খুব কমই লেখা হয়। এ্যাডা লাভ্লেস (Ada Lovelace, ১৮১৫-৫২) চার্লস ব্যাবেজের নির্মিত আদি কম্পিউটারের সাথে উত্তমরূপে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি ব্যাবেজকে নানা প্রকার গাণিতিক ও কারিগরি পরিকল্পনা দিয়ে সাহায্য করেন। বস্তুত তাঁর লেখা একটি গাণিতিক পরিকল্পনাকে 'প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রাম'রূপে গণ্য করা হয়। তাঁর নামে ১৯৭৯ সালে একটি নতুন 'কম্পিউটার ভাষা'র নাম রাখা হয়েছে 'Ada'।

এলিস বার্ক্স্, কে ম্যাক নালটি মাউক্লি এন্টোনেলি, এডিল গোল্ডস্টিন (Alice Burks, Kay McNulty Mauchly Antonelli, Edile Goldstine) প্রমুখ মহিলা গণিতবিদরা প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার এনিয়াক (ENIAC)-এর উদ্ভাবন এবং বিকাশ সাধনে অবদান রেখেছেন। গ্রেস ম্যুরে হপার (Grace Murray Hopper, ১৯০৬-'৯২) উচ্চ পর্যায়ের 'কম্পিউটার ভাষা' উদ্ভাবনে সচেষ্ট ছিলেন। কম্পিউটার প্রযুক্তিতে বিপ্লব সৃষ্টিকারী COBOL ভাষা উদ্ভাবনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

এ গ্রন্থে লেখক অয়লার, লাগ্রাঞ্জ, লাপ্লাস, গাউস, বার্নৌলী পরিবারের বিভিন্ন গণিতবিদ প্রভৃতি সম্পর্কে এবং আলজাব্রা, ত্রিকোণমিতি, লগারিদম, থিওরী অফ নাম্বার, এনালিসিস, সম্ভাবনা তত্ত্ব, ক্যালকুলাস অফ ভ্যারিয়েশন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করে পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণাকে জাগ্রত করেছেন।

'ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন ফাউন্ডেশন' এ মূল্যবান বইটির পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ নিয়ে একটি জনকল্যাণকর কাজ সম্পন্ন করেছেন।

১লা জুলাই, ২০০৪
ঢাকা

আবদুল হালিম

প্রথম সংস্করণের প্রসঙ্গ কথা

বহু বিচ্ছিন্ন ঘটনা একত্র সন্নিবদ্ধ করলেই ইতিহাস হয় না। ঘটনাগুলোকে যখন কাল-সূত্রে গ্রথিত করে এদের ভিতরকার পারস্পরিক সম্বন্ধ স্পষ্ট করে তোলা হয়, তখনই তা ইতিহাস হয়ে ওঠে। গণিতশাস্ত্রের ইতিহাসের বেলায়ও তাই। তবে, গণিতের ঘটনাগুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত হলেও, মুখ্যতঃ তা চিন্তা-রাজ্যেরই ব্যাপার। আর এই চিন্তার সঙ্গে ঘটেছে অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও কল্পনার অপূর্ব সমন্বয়। তাই, কালে কালে মানুষের জ্ঞান সাধনা ও বুদ্ধির প্রয়োগে ধীরে ধীরে যে গাণিতিক সৌধ গড়ে উঠেছে, তার ভিত্তি মর্ত্যলোকে স্থাপিত হলেও তার শীর্ষ উঠে গেছে এমন এক অতীন্দ্রিয় লোকে, কল্পনা যেখানে স্থান-কালের সীমা অগ্রাহ্য করে অসীমের রাজ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে।

তাই সাধারণ বাঙালি পাঠকের উপযোগী গণিতশাস্ত্রের একখানা সুবোধ্য বাংলা ইতিহাস পুস্তক প্রণয়ন, সংকলন বা অনুবাদ করবার ভার দেওয়া হয় ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের উপর। এখন তাঁর রচিত গ্রন্থখানা বাঙলা একাডেমীর তরফ থেকে প্রকাশ করা হচ্ছে। আশা করি, তাঁর এই 'গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস' বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের বাংলা পঠনক্ষম পাঠকদেরকে বিশাল গণিত-সৌধের কয়েকটা সুসজ্জিত কক্ষে নিয়ে গিয়ে কতিপয় মনোরম দৃশ্য দেখিয়ে তাদের মনোরঞ্জন করতে পারবে, কিংবা কারো বিস্ময় ও কৌতূহল উদ্রিক্ত করতে পারবে, হয়ত কারো বা গণিতভীতি দূর করে বিজ্ঞানের এই আদি-জননীর আনুরক্তি জন্মাতে পারে, এমন কি কারো কারো বিশুদ্ধ গাণিতিক যুক্তির উৎকর্ষ সাধন করে হয়ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে তাদের সহায়তা করতে পারে। এ-সব আশা একেবারে বৃথা যাবে না — এই আমার বিশ্বাস।

[১৯৭০]

কবীর চৌধুরী
পরিচালক ঃ বাঙলা একাডেমী।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বিজ্ঞান আজ বহু শাখায় বিভক্ত। এসবের মূলে রয়েছে গণিতশাস্ত্র। গণিত বলতে প্রাচীন মিসরে প্রধানতঃ জ্যামিতি আর প্রাচীন বাবিলনে ও ভারতবর্ষে প্রধানতঃ পাটীগণিতই বোঝাত। এক-দুই-তিন প্রভৃতি পূর্ণ সংখ্যার গণনা থেকে কেমন করে আস্তে আস্তে বীজগণিতে বিশুদ্ধ সংখ্যার কল্পনা উদ্ভূত হল, তারপর কেমন করে এসবের সংমিশ্রণে ত্রিকোণমিতি, গোলক ত্রিকোণমিতি এবং ঋণ-সংখ্যা, ভগ্নাংশ, শূন্য, অনন্ত দশমিক, লগারিদম, অপ্রমেয় (Incommensurate) সংখ্যা, অননুপাতিক বা অমূলজ (Irrational) সংখ্যা, কাল্পনিক (Imaginary) বা সদিক (Vector) সংখ্যার বিচিত্র বিকাশ হল, সে ইতিহাস অতি চমৎকার এবং মানুষের চিন্তনশক্তির গৌরবময় ফল। গণিতের ক্ষেত্র বিগত এক শো বছরের মধ্যে নানাদিকে এতই প্রসারিত হয়েছে যে বর্তমানে এমন একজন গণিতবিশারদও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি এর সমুদয় শাখার সঙ্গে সম্যক পরিচয়ের দাবী করতে পারেন। কাজেই বর্তমান পুস্তকে কেবল সহজবোধ্য অংশটুকুর প্রতিই আলোকপাত করবার চেষ্টা করা হবে।

এতে বর্ণিত হবে, অঙ্কশাস্ত্র কেমন করে কৃষিকার্য, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্পোন্নতি, যুদ্ধবিদ্যা, স্থাপত্য, দর্শনশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত বা উদ্বুদ্ধ হয়েছে। যে সকল মহারথী গণিতশাস্ত্রে বিশিষ্ট দান রেখে গেছেন, তাঁরা কি পরিবেশে কাজ করেছেন, সমসাময়িক সমাজের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কেমন ছিল, এসব বৃত্তান্ত বেশ চিত্তাকর্ষক, কখনও কৌতুককর, আবার কখনও বা পীড়াদায়ক।

এই বিচিত্র মনোহর ঘটনাবর্ণনে আমি প্রধানতঃ আলফ্রেড হুপার কৃত 'Makers of Mathematics' এবং ডির্ক, জেস্ট্রয়িক কৃত 'A Concise History of Mathematics'-এর সাহায্য নিয়েছি; কিন্তু এঁরা যে পাঠক সমাজকে সামনে রেখে পুস্তক রচনা করেছেন, তার সঙ্গে বর্তমান পুস্তকের পাঠক সমাজের হয়ত বেশ খানিকটা পার্থক্য রয়েছে। তাই কিছু গ্রহণ, কিছু বর্জন, আর কিছু স্পষ্টায়ন বা রূপান্তরণ করতে হয়েছে। অতএব এ পুস্তক অনুবাদও নয়, অনুকরণও নয় — তবে অনুসরণ বটে। অবশ্য দু'জনের অনুসরণ করা সহজ নয়। বাস্তবিকপক্ষে উপরের দু'খানা বইয়ের একটা মানানসই মিশ্রণ কল্পনা করে তারই অনুসরণ করা হয়েছে। পরিবেশন প্রণালী সরস করবার চেষ্টা করেছি, এ চেষ্টা সফল হয়েছে কি না সে বিচার পাঠকেরাই করবেন।

জানুয়ারি, ১৯৬২
ঢাকা।

কাজী মোতাহার হোসেন

প্রথম পরিচ্ছেদ

সংখ্যার জন্ম

গণনার থেকেই বর্তমান গণিতের জন্ম। অতি প্রাচীন প্রস্তর-যুগে আদিম মানুষ যখন গুহাবাসী ছিল, তখনও সম্ভবতঃ এক-দুই পর্যন্ত গণনা প্রচলিত ছিল। হয়ত সে যুগে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনই ভাল করে আরম্ভ হয়নি; তবু পদার্থের রূপ সম্বন্ধে ধারণা যে নিশ্চয়ই ছিল, তার নিদর্শন পাওয়া গেছে অনুমান পনর হাজার বছর আগেকার স্পেন ও ফ্রান্সের গুহাগাত্রে অঙ্কিত চিত্র এবং স্থানে স্থানে রক্ষিত দ্রব্য-সামগ্রী আর মূর্তি থেকে।

নতুন প্রস্তর যুগে মানুষ খাদ্য 'আহরণ' থেকে 'উৎপাদন' আরম্ভ করল। সে প্রায় দশ হাজার বছর আগেকার কথা। এই যুগের মৃৎ শিল্প, কাষ্ঠ শিল্প ও বয়ন শিল্পের অনেক নমুনা ভূগর্ভে প্রোথিত রয়েছে। তার কতকগুলো মাটি খুঁড়ে বের করা হয়েছে। এসব থেকে দেখা যায়, তখনই গ্রাম্য সমাজ স্থাপিত হয়ে গেছে, ধানের বা গমের গোলা, রুটি সেঁকবার উনুন, কুমোরের চাকা, গাড়ীর চাকা, নৌকা এবং আবাসগৃহ নির্মাণ শুরু হয়েছে; কিন্তু এসব ছিল স্থানিক বৈশিষ্ট্য। এক স্থানে কোনও কিছু উদ্ভাবিত হলেও সে সংবাদ সহজে অন্যত্র পৌঁছতে পারত না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা ইউরোপের সাদা আদমি দেখবার আগে কোনও দিন গাড়ীর চাকা দেখেনি। তবু প্রাচীন প্রস্তর যুগের চেয়ে নতুন প্রস্তর যুগের লোক অনেক দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে। একালে গ্রামগুলোর মধ্যে পণ্যের আদান-প্রদান আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল; সুতরাং গণনার আবশ্যকতা নিশ্চয়ই অনুভূত হয়েছিল। তখনকার লোকে তামা ও কাঁসার পাত্র নির্মাণের কৌশলও শিখে ফেলেছে। এ অবস্থায় অবশ্যই ভাষা গঠনও প্রয়োজন হয়েছিল; কিন্তু তখনও সংখ্যার ধারণা বেশ অস্পষ্ট ছিল; সংখ্যাগুলো সর্বদাই বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকত— যেমন পাখীটা, একজোড়া জানোয়ার, এক হাঁড়ি মাছ, দুটো হাত, মানুষগুলো, অনেক গাছ, সাতটা তারা ইত্যাদি। অন্ততঃ অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকার অনেক গোত্রই যে দুশো বছর আগেও এই অবস্থায় ছিল, সে ত প্রত্যক্ষ সত্য।

মোটকথা, বস্তু-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ সংখ্যার ধারণা আরও পরে এসেছে। সংখ্যা নির্দেশক শব্দ অল্প কয়েকটি মাত্র ছিল। আরও বৃহৎ সংখ্যা-নির্দেশ প্রথমে শুধু যোগের

সাহায্যে, তারপর ক্রমে ক্রমে গুণ ও যোগের সাহায্যে করা হত। দুটো অস্ট্রেলীয় গোত্রের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

মারে রিভার গোত্র : এনিয়া (এক), পেচেভাল (দুই), পেচেভাল-এনিয়া (তিন), পেচেভাল-পেচেভাল (চার)।

কামিলা রোই গোত্র : মাল (এক), বুলান (দুই), গুলিবা (তিন), বুলান-বুলান (চার), বুলান-গুলিবা (পাঁচ), গুলিবা-গুলিবা (ছয়)।

পোত-নির্মাণ ও বাণিজ্য-প্রসারের ফলে সংখ্যার ধারণা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমাদের বর্তমান দশমিক প্রণালীর গণনাতেও দেখা যায়, এক থেকে দশ পর্যন্তই আমাদের মূল সংখ্যা। এর সঙ্গে বাড়তি সংখ্যা যোগ করে বৃহত্তর সংখ্যার নাম রাখা হয়েছে। আবার দশকে একক ধরে দুই দশ (বিশ), তিন দশ (ত্রিশ), চার দশ (চল্লিশ) ইত্যাদি গুণিতক ব্যবহৃত হয়েছে— যেমন, একাদশ (দশ আর এক), বাইশ (দুই আর বিশ), পঁয়ত্রিশ (ত্রিশ আর পাঁচ) ইত্যাদি। আবার পূর্ণ সংখ্যক দশের থেকে একক ঘাটতি বুঝাতে 'ঊন' ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ঊনচল্লিশ (এক কম চল্লিশ), ঊননব্বই (এক কম নব্বই) ইত্যাদি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বয়স গণনায় বা টাকার গণনায় কুড়িকে একক ধরে বৃহৎ সংখ্যার গণনার রীতিও দেখা যায়— যেমন, তিন কুড়ি চার (চৌষট্টি) টাকা, চার কুড়ি আট (অষ্টাশি) বছর ইত্যাদি।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে গণনা-প্রণালী অনুসন্ধান করতে করতে দুই, পাঁচ, দশ, কুড়ি প্রভৃতির ভিত্তিতে গণনার নিদর্শন পাওয়া গেছে। বিশেষ করে, মেক্সিকোর 'মায়া'দের এবং ইউরোপের 'কেল্ট'দের বিশ-ভিত্তিক গণনা উল্লেখযোগ্য। সুমারীয় ও বাবিলনীয় ষাট-ভিত্তিক গণনাও (২১০০ খ্রীস্ট-পূর্ব) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা যে 'ষাট সেকেন্ডে এক মিনিট আর ষাট মিনিটে এক ঘণ্টা' ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, এটাও প্রাচীন মেসোপটেমীয় (সুমারীয়+বাবিলনীয়) সভ্যতারই অবদান।

তাছাড়া, কড়া, গণ্ডা, ডজন, কুড়ি প্রভৃতিতে আমরা ৪, ১৬, ১২, ৮০ প্রভৃতির গুচ্ছ ব্যবহার করে থাকি। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জিনিসের মাপ বা গণনা সংরক্ষণের জন্য রশিতে গিরে দেওয়া, বাঁশের কঞ্চি বা কাঠে দাগ দেওয়া, আঁটি বাঁধা ইত্যাদির প্রচলন ছিল। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেও আমাদের দেশে গোয়ালের দুধের হিসাব রাখার জন্য ফাড়া কঞ্চির ব্যবহার ছিল। দুই ভাগে ফাড়া কঞ্চি একত্র করে সংযোগ স্থলের উপর ধারাল কাচি দিয়ে দাগ কাটা হত, তারপর ক্রেতা আর বিক্রেতা দুই জনের কাছেই ওর এক এক অংশ থাকত, যাতে একজন অতিরিক্ত দাগ কেটে অপরকে ঠকাতে না পারে। ওতে সের-পোয়ার হিসাব থাকত, পাঁচ সের, দশ সেরেরও আলাদা চিহ্ন থাকত। এই প্রকার রীতি যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই এমনকি, নতুন প্রস্তর যুগেও প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে ১৯৩৭ সালে মোরাভিয়ার অন্তর্গত ভেস্টোনিস অঞ্চলে। ঐ স্থান খনন করে নেকড়ের সামনের পায়ের সাত ইঞ্চি লম্বা একখণ্ড হাড় (Radius) পাওয়া গেছে, যাতে

পঞ্চান্নটা গভীর আড়াআড়ি দাগ কাটা রয়েছে— প্রথম পঁচিশটি দাগ পাঁচ থাকে পর পর সাজান; তারপর দুটো বড় বড় সমাপ্তি রেখা অবশিষ্ট ত্রিশটি দাগকে পৃথক করে দিয়েছে; এরপর বাকি ত্রিশটা দাগও পাঁচ পাঁচটি করে ছয় থাকে সাজান রয়েছে। এর থেকে মনে হয়, হাতের আঙ্গুল গুনতে গুনতেই যে প্রথম গণনার সূত্রপাত হয়েছে, তা ঠিক না-ও হতে পারে। কারও কারও মতে, হাতের আঙ্গুল গুনে সংখ্যার হিসাব, কোনও বিশেষ সামাজিক অবস্থায় আরম্ভ হয়েছিল। দশ এবং পাঁচের গুণ ও যোগ-বিয়োগের সাহায্যে সংখ্যা গণনার এই দ্বৈধ দৃষ্টান্ত কয়েক হাজার বছর ধরে প্রাচীন মিসর এবং সিন্ধু নদের অববাহিকা মহেঞ্জোদারোতে চালু ছিল।

দৈর্ঘ্যের মাপে হাত, ফিট (পা), রশি, অঙ্গুলি, নল (পোল), সুত (সূত্র, সুতা) প্রভৃতির সঙ্গে কৃষিকার্য, গৃহ-নির্মাণ, বস্ত্র-বয়নের সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। ওজনের মাপে গ্রাম (ছোলা), তিল, রতি (কুঁচের ওজন), গ্রেন (দানা); আয়তনের মাপে সের (পাত্র বিশেষ), কাঠা (পাত্র বিশেষ), মৌটি (তৈলাদি মাপক হাতলওয়ালা ক্ষুদ্র বাটি) প্রভৃতির সঙ্গে ব্যবহারিক সম্পর্ক রয়েছে। এই পরিমাণগুলো নিয়েই পরিমিতির প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল। ইতিপূর্বেই মৃৎ-শিল্প এবং মূর্তি সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, এর থেকে দেখা যায়, প্রতিসাম্য, সাদৃশ্য ও সর্বসমতার সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্পর্কের কথা সুদূর অতীতেই লোকের মনে উদয় হয়েছে। অতীত যুগের ধর্মীয় উৎসব ও চিকিৎসাদি ব্যাপারে টোটকা, তাবিজ; যুদ্ধ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে স্বস্তিক, ক্রুশ, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চফলক এবং ১, ৩, ৫, ৭, ৯ প্রভৃতি ম্যাজিক সংখ্যার প্রতিও মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই চন্দ্র, সূর্য, তারকাদির গতি লক্ষ্য করে সময় নির্ধারণের চেষ্টা চলছিল। খেত-খোলা এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এগুলো বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের বিষয় হয়ে পড়ল। মানবেতিহাসের অনেক গোড়ার দিকেই চান্দ্র-বার্ষিক পঞ্জিকার প্রচলন দেখা যায়। আদিম যুগের মানুষও উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন ও সপ্তর্ষিমণ্ডলের আবির্ভাব স্থান লক্ষ্য করে বৎসরের ঋতু নির্ণয় করতে পারত। কোনও কোনও দেশের লোক নক্ষত্রমণ্ডলী লক্ষ্য করে সমুদ্র পথে দিক নির্ণয়ে দক্ষতা অর্জন করেছিল। এইসব নাক্ষত্রিক পর্যবেক্ষণ থেকে গোলকের উপরকার কৌণিক দূরত্ব এবং ক্ষুদ্র বৃত্ত ও বৃহৎ বৃত্তের ধারণার প্রথম উদ্ভব হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংখ্যা লিখন

ইহুদি ও গ্রিক, উভয় জাতিই বর্ণমালা দিয়ে সংখ্যা নির্দেশ করত। সর্বদাই আলফা (α)-কে এক, বিটা (β)-কে দুই, আইয়োটা (ι)-কে দশ এবং কাপ্পা (κ)-কে কুড়ি বলে গণ্য করা হত। এর সঙ্গে আরবি 'আবজদ্' প্রণালীর তুলনা করা যেতে পারে :

ত্বোয়	হ্বে	যে	ওয়াও	হে	দাল	জিম	বে (বিটা)		আলিফ (আলফা)	
৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২		১	
স্বাদ	ফে	আয়ন	সিন	নূ	মিম	লাম	কাফ (কাপ্পা)		ইয়া (আইয়োটা)	
৯০	৮০	৭০	৬০	৫০	৪০	৩০	২০		১০	
গায়ন	জ্বোয়	জ্বাদ (দ্বাদ)		জাল	খে	সে	তে	শীন	রে	ক্বাফ
১০০০	৯০০	৮০০		৭০০	৬০০	৫০০	৪০০	৩০০	২০০	১০০

এখনও আমাদের দেশের অনেক আলেম চিঠি-পত্রের শিরোদেশে ৭৮৬ লিখে চিঠি আরম্ভ করেন। অবশ্য ঐ সংখ্যার অর্থ 'বিসমিল্লাহির্ রাহ্মানির্ রহিম'; কারণ, এর অক্ষরগুলোর সংখ্যামান একত্র যোগ দিলেই ৭৮৬ হয়। অনেকে আবার তারিখী নাম রাখেন,— নামের অক্ষরগুলোর সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগুলো যোগ দিলেই জন্মের সন পাওয়া যায়। যাহোক, উপরোক্ত গ্রিক পদ্ধতিতে ιβ লিখে দশ আর দুইয়ে বার (১২) বুঝান হত; কিন্তু বর্তমান দশমিক পদ্ধতির মতো αβ দ্বারা ১২ কিংবা βα দ্বারা ২১ বুঝাবার নিয়ম ছিল না। উক্ত প্রণালীতে ২১ বুঝাতে হলে κα লিখতে হত। দশমিক প্রণালীতে স্থান ভেদে, ১ লিখেই ১, ১০, ১০০, ১০০০ ইত্যাদি বুঝান হয়; কিন্তু উপরোক্ত গ্রিক বা হিব্রু পদ্ধতিতে, ১-২-৩ করে দশ পর্যন্ত; তারপর ১০-২০-৩০ করে ১০০ পর্যন্ত; তারপর ১০০-২০০-৩০০ করে ১০০০ পর্যন্ত; ... এইভাবে হাজার পর্যন্ত লিখতে মোট ২৮টা, দশ হাজার পর্যন্ত ৩৭টা; এক লক্ষ পর্যন্ত মোট ৪৬টা; দশ লক্ষ পর্যন্ত মোট ৫৫টা এবং এক কোটি লিখতে মোট ৬৪টা অক্ষর বা সঙ্কেতের প্রয়োজন হয়। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এটা সাধারণ বর্ণমালায় কুলায় না; তাছাড়া এতগুলো বিভিন্ন সঙ্কেত মনে রেখে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করাও সহজ নয়।

রোমান লিখন পদ্ধতিতে দেখা যায়, এক, পাঁচ, দশ, পঞ্চাশ, শ', পাঁচশো আর হাজারের স্বতন্ত্র চিহ্ন আছে,— যথাক্রমে I, V, X, L, C, D আর M; প্রথম প্রথম চার লেখা হত (IIII), পর পর চারটি একের চিহ্ন দিয়ে, পরে স্থান সংক্ষেপের জন্য পাঁচের চিহ্নের আগে একটি ঘাটতি বোধক একের চিহ্ন দিয়ে 'চার' নির্দেশ করা হত। এইভাবে পঞ্চাশের আগে ঘাটতি দশ বসিয়ে (XL) চল্লিশ; একশোর আগে ঘাটতি দশ বসিয়ে (XC) নব্বই; পাঁচশো-এর আগে ঘাটতি একশো বসিয়ে (CD) চারশো আর হাজারের আগে ঘাটতি একশো বসিয়ে (CM) নয়শো লেখার রীতি প্রচলিত হল। এক হাজার চারশো ঊনপঞ্চাশ (১,৪৪৯) ও তিন হাজার নয়শো সাতাশ (৩,৯২৭)-কে যথাক্রমে MCDXLIX ও MMMCMXXVII-ভাবে লেখা যায়। লক্ষ্য করতে হবে, ঊনপঞ্চাশ লিখতে IL, কিংবা নিরানব্বই লিখতে IC লেখার রীতি নেই; লিখতে হয় XL এবং XC আর IX-এর হিসাবে। হাজারের চেয়ে বড় সংখ্যা লেখা আরও কঠিন; আর এ নিয়ে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করাও যেমন-তেমন কাজ নয়। যাহোক, উপরের সঙ্কেতগুলোর উৎপত্তি কেমন করে হল জানলে মনে রাখার সুবিধে হতে পারে। অবশ্য এক, দুই, তিন, চার— হাতের উক্ত সংখ্যক আঙ্গুলের; পাঁচ হাতের পাঁচ আঙ্গুলের (পাঞ্জার); আর দশ, দুটো পাঞ্জার সঙ্কেত। পঞ্চাশ লিখতে যে L লাগে, তা পঞ্চাশের ল্যাটিন নামের আদ্যক্ষর নয়, বরং এক শোয়ের অর্ধেক। একশোয়ের লাটিন Centum-এর আদ্যক্ষর C—কাঠের উপর বা মার্বেলের উপর অলঙ্কৃত করে লেখা হত [-রূপে, এরই নীচের অর্ধেকটা L-এর মত বলে পঞ্চাশ আর সম্পূর্ণটা পরে গোলাকৃতি হয়ে C-তে পরিণত হয়েছে। এইভাবে এক হাজারের ল্যাটিন Mille-এর আদ্যক্ষর অলঙ্কৃত করে লিখলে দেখা যায় ∞ এর মতো, এরই শেষার্ধ D-এর মতো দেখায় বলে পাঁচশোয়ের প্রতীক, আর পুরাটা M-এর মতো দেখায় বলে হাজারের প্রতীক হয়েছে। আবার অন্য মতে গ্রীক অক্ষর ϕ ফাই এক হাজার বুঝাত, শেষে এর চেহারা দাঁড়ায় এর ϕ মতো, এর অর্ধেকটা D-এর মতো বলে পাঁচশোয়ের ∞ চিহ্ন, আর সম্পূর্ণটা M-এর মতো বলে হাজারের চিহ্ন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা যায় না এর কোনটা ঠিক, তবু যে কোনওটা মনে রাখলেই কাজে লাগতে পারে। দেখা যাচ্ছে দশের অর্ধেক পাঁচ, শ'য়ের অর্ধেক পঞ্চাশ আর হাজারের অর্ধেক পাঁচশো; এগুলো লিখবার বেলায়ও চিহ্নের ক্ষেত্রে ঠিক অর্ধেক দাবি রক্ষিত হয়েছে।

বলাবাহুল্য, লিখন-প্রণালী কঠিন থাকাতে আগেকার দিনে পাটীগণিতের অঙ্কে আশানুরূপ অগ্রগতি হতে পারেনি। সে অগ্রগতির সূত্রপাত হয়েছিল শুধু দশমিক প্রণালীর জন্য নয়, শূন্যের জন্য আলাদা চিহ্ন (0) ব্যবহার করবার দৌলতে। হিব্রু, গ্রীক, রোমান, আরব্য রীতিতেও কতকটা দশমিক প্রণালীর আভাস থাকলেও কেবল এক থেকে নয় পর্যন্ত নয়টা চিহ্ন আর শূন্যের চিহ্ন, এই দশটা আয়ত্ত করেই যে কোটি কোটি বা তারও অধিক সংখ্যা লেখা যেতে পারে এ-কল্পনা প্রায় হাজার দেড়-হাজার বছরের মধ্যে কারো মাথায় আসেনি। অবশ্য, এটা যে সম্ভব, এ ধারণাই কারো মনে উদয় হয়নি।

চীন, জাপান আর রুশিয়ার কোনও কোনও অঞ্চলে এবেকাস বা হিসাব-তক্তা ব্যবহৃত হয়। আগে এরকম তক্তা মিসর, ভারত, গ্রিস, রোম সাম্রাজ্য এবং আরও অন্যান্য

দেশেও লেন-দেনের হিসাবে ব্যবহৃত হত। সময় সময় ঐ তক্তার উপর কতকগুলো সমান্তর গভীর লম্বা দাগ কাটা থাকত। প্রথম লাইনে ১-এর পরিমাণ এক, দ্বিতীয় লাইনে ১-এর পরিমাণ দশ, তৃতীয় লাইনে একশো এবং চতুর্থ লাইনে হাজার। চিত্রে তক্তার উপরে লাইন না টেনে এর উপর ছিদ্র করে চারটে শিক বা শলাকা পোঁতা হয়েছে। এগুলোই লাইনের কাজ করবে।

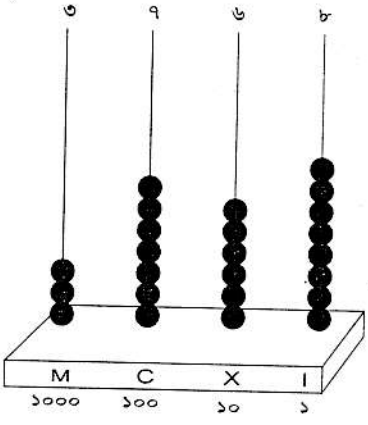

মনে করুন একটি স্কুলের ছেলে ০, ১, ২, ... ৯ পর্যন্ত লিখতে পারে, শ' পর্যন্ত গুণতে পারে, আর একশো, দুশো, করে দশ শ'য়ে হাজার হয় তাও শিখেছে। সে আরও জানে, বাঁ দিকের শিকটা হাজারের, তার পরেরটা শ'য়ের, তার পরেরটা দশের, আর ডাইনেরটা এক-এর শিক। তাকে হিসাব-তক্তিকে তিন হাজার সাতশো আটষট্টির টোক রাখতে বলা হল। সে হাজারের শিকে তিনটি দানা পরিয়ে দিল, তাতে তিন হাজার বুঝা গেল। এইভাবে শ'য়ের শিকে সাতটা দানা পরিয়ে সাতশো, দশের শিকে ছয়টা দানা পরিয়ে ষাট আর একের শিকে আটটা দানা পরিয়ে আট বুঝান হল। এই তক্তির দানাগুলো লক্ষ্য করেই দেখা যাচ্ছে, একযোগে সংখ্যা তিন হাজার সাতশো ছয় দশ আর আট বা তিন হাজার সাতশো আটষট্টি। একটু অভ্যাসের পর ছেলেটা শিকের গায়ে দানা না পরিয়ে শুধু পর পর ৩৭৬৮ দেখেই বুঝতে পারবে সংখ্যাটা কত। এইভাবে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে ছাত্রদের মনে সংখ্যার ধারণা জলজ্যান্ত করে তোলা যায়। উপরের উদাহরণে যদি শ'য়ের ঘরে একটি দানাও না থাকত, তাহলে ফাঁক বুঝাবার জন্য ঐ স্থানে একটি শূন্য (0) লেখা হত। আসলে, এই শূন্যের ব্যবহারই পাক-ভারতীয় পদ্ধতির প্রধান গুণ, এর দ্বারা শিকগুলোর পারস্পরিক অবস্থান বা লিখিত অঙ্কগুলোর আপেক্ষিক মান নিঃসংশয়রূপে জানা যায়। অবশ্য এই প্রণালীতে হাজার ছাড়িয়েও অযুত, লক্ষ, নিযুত কোটি ইত্যাদি যত বড় সংখ্যাই হোক খুব সহজে লিখে ফেলা যায়; আর এতে এক থেকে নয় পর্যন্ত পূর্ণ সংখ্যা আর শূন্য এই দশটা সঙ্কেত জানলেই চলে, এর বেশী চিহ্ন জানবার বা মনে রাখবার দরকার পড়ে না। তাছাড়া কোনও সংখ্যা একের থেকে কম হলেও তা দশমিক প্রণালীতে প্রকাশ করা যায়। হিসাব-তক্তিতে বা এই লিখন পদ্ধতিতে কোনও স্থানের মান ঠিক ডাইনের স্থানের মানের দশগুণ; আর ঠিক বাঁয়ের স্থানের মানের দশভাগের এক ভাগ। সম্প্রতি আমাদের দেশে দশমিক মুদ্রার প্রচলন হয়েছে। এতে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের কাজ পূর্ণ সংখ্যার নিয়ম মতো খুব সহজেই করা যায়। এখন

১০০ পয়সায় ১ টাকা; আদান-প্রদানের জন্য এক পয়সা, দুই পয়সা, পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা, পঁচিশ পয়সা ও পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা চালু হয়েছে। হিসাব লিখবার সময় সকলের ডান দিকে পয়সার ঘর, এইভাবে দশ গুণ করতে করতে ক্রমান্বয়ে শ' টাকা, হাজার টাকা ইত্যাদি স্থাপন করতে হবে। নীচের ছয় হাজার পাঁচশো তিন টাকা পঁচিশ পয়সা লিখবার কায়দা দেখান যাচ্ছে :

হাজার টাকা	শ' টাকা	দশ টাকা	টাকা	দশ পয়সা	পয়সা
৬	৫	০	৩	২	৫

আমার মনে হয় দশ পয়সার একটা আলাদা নাম রাখলে ভালো হয়– দয়সা, দশী বা আর কিছু।

প্রঃ- কত টাকা?	উত্তর- ৬৫০৩·২৫ টাকা এখানে	একক	১	টাকা
প্রঃ- কয়শো টাকা?	উত্তর- ৬৫·০৩২৫ শ' টাকা	"	১০০	"
প্রঃ- কয় হাজার টাকা?	উত্তর- ৬·৫০৩২৫ হাজার টাকা	"	১,০০০	"
প্রঃ- কত পয়সা?	উত্তর- ৬৫০৩২৫ পয়সা	"	১	পয়সা
প্রঃ- কত দশ পয়সা?	উত্তর- ৬৫০৩২·৫ দশ পয়সা	"	১০	"

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে প্রত্যেক স্থলে এককের পরে দশমিক বিন্দু দিয়ে একক নির্দেশিত হয়েছে। এ হিসাব যে প্রাচীন গ্রীক, হিব্রু, রোমানদের ব্যবহৃত হিসাব-লেখন পদ্ধতির চেয়ে সহজ তা দৃষ্টি মাত্রেই বোঝা যাচ্ছে। এখানে দশ টাকার ঘরে শূন্য বসিয়ে উক্ত মুদ্রা বা নোটের অভাব দেখান হয়েছে; সব ঘরেই শূন্য বা অন্যকোনও অঙ্ক বসিয়ে সকল সন্দেহ নিরসন করা গেছে—

এখন দেখা যাক, এই শূন্যের প্রচলন কখন কোথায় আরম্ভ হল। খ্রীস্টের জন্মের প্রায় দুশো বছর আগে প্রাচীন ভারতের সম্রাট অশোক অনেক স্তম্ভে খোদাই করে উপদেশ বা অনুশাসন রেখে গেছেন, তার প্রায় ত্রিশটা লিপি থেকে এক, দুই, চার ও ছয়ের চিহ্ন দেখা যায় এইরূপ–

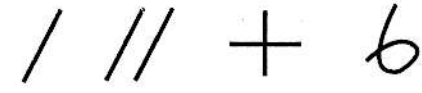

One	Two	Four	Six
এক	দুই	চার	ছয়

অশোকের রাজত্ব অবসানের প্রায় এক শতাব্দী পরে পুনা শহরের নিকট নন্দঘাট পর্বতের একটি গুহার গায়ে লেখা পাওয়া যায়—

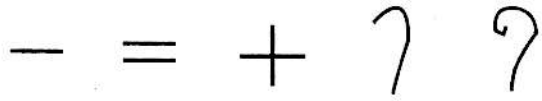

One	Two	Four	Seven	Nine
এক	দুই	চার	সাত	নয়

আবার অশোকের প্রায় চারশো বছর পরে, নাসিক শহরের গুহাগাত্রে খোদিত লেখায় দেখা যায়—

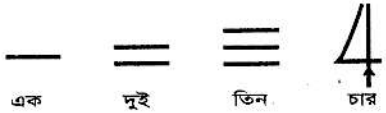

এক	দুই	তিন	চার

পাঁচ	ছয়	সাত	নয়

এগুলো দেখে মনে হয়, অধুনা ব্যবহৃত সংখ্যাগুলোর রূপ প্রাচীন ভারতীয় সংখ্যা-রূপেরই বিবর্তন। এছাড়াও ঐসব খোদিত লিপিতে কুড়ি, চল্লিশ প্রভৃতি সংখ্যারও বিশেষ বিশেষ রূপ লেখা রয়েছে। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, তখন পর্যন্ত স্থানীয় মান ব্যবহার করে সংখ্যা লিখন-পদ্ধতি চালু হয়নি, তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীর আগেই ভারতবর্ষে বর্তমান প্রণালীর প্রচলন হয়েছিল। আজ পর্যন্ত এ মতের প্রধান সমর্থন আসছে খলিফা আল-মামুনের গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ সুবিখ্যাত গণিতবিদ আল-খারিজমির ৮২৫ খ্রীস্টাব্দে লিখিত একখানা গণিত পুস্তকের থেকে। এই গ্রন্থে শূন্যের ব্যবহার উল্লেখ করে এ-কে ভারতীয় উদ্ভাবন বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আবার ৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে খোদিত কয়েকটি ভারতীয় শিলালিপি পাওয়া গেছে, যাতে শূন্যের ব্যবহার করা হয়েছে। 'শূন্য' ব্যবহারের গুরুত্ব সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। 'শূন্য' বা 'ফাঁক'-এর আরবি 'সিফর'। সিফর থেকে ইংরেজি শব্দ 'সাইফার' (Cipher) এসেছে। 'যিরো' (Zero) শব্দও পরোক্ষভাবে সিফর থেকেই এসেছে; কারণ আরবি সিফর শব্দ ইটালীর ভাষায় হয়েছে 'যেপিরো', তার থেকে এসেছে ইংরেজি শব্দ 'যিরো'।

আরবের সর্বপ্রধান মানব হজরত মুহম্মদ (দঃ)-এর ইন্তেকাল হয় ৬৩২ খ্রীস্টাব্দে। এর একশো বছরের মধ্যেই তাঁর খলিফাগণ ভারতের পশ্চিম প্রান্ত থেকে আটলান্টিক

মহাসাগর পর্যন্ত এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে পিরেনিস পর্বত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূমির উপর শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ৭১১ খ্রীস্টাব্দে আরবগণ (নামান্তরে, মূরগণ) উত্তর আফ্রিকা থেকে স্পেন আক্রমণ করে সেখানে এক সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তীর্থযাত্রী পাদ্রীগণের (pilgrim father-দের) আমেরিকায় অবতরণের পর আজ পর্যন্ত যত বৎসর অতীত হয়েছে, তারচেয়েও অধিককাল স্পেনে মুসলিম অধিকার স্থায়ী হয়েছিল। আলফ্রেড হূপার বলেন :

> আমরা অনেক বিষয়েই মূরদের কাছে ঋণী। তাঁরা চিকিৎসা-বিদ্যায় নতুন চিন্তাধারা ও জ্ঞানের প্রবর্তন করেছেন; ধাতু ও চর্মের উপর কারুকার্যের উন্নত উপায় উদ্ভাবন করেছেন; স্পেন দেশে পানির কল (Water works), কৃত্রিম খাল (Canals) এবং নদীর স্রোত নিয়ন্ত্রণকারী রোধক ও নিকাশ-ব্যবস্থার (Sluices) প্রচলন করেছেন। এক কথায় ইউরোপ যখন বর্বরতা ও অজ্ঞানান্ধকারে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, সেই সময় তাঁরাই মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে আমদানি করে সভ্যতার আলো জ্বেলে রেখেছিলেন। আরবেরা গ্রীক গণিতজ্ঞদের স্বর্ণযুগের সমুদয় গণিত সম্পদের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। ... বিশেষ করে তাঁরা ভারতীয়দের কাছ থেকে সংখ্যা-লিখনের যে বৈপ্লবিক পন্থা শিক্ষা করেছিলেন, তা-ও স্পেনে প্রবর্তিত করেছিলেন। বর্তমান জগতে বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বায়বীয় পোতের যেসব উন্নতি হয়েছে, তার ভিত্তি রচিত হয়েছিল এই বৈপ্লবিক চিন্তা-ধারার প্রভাবে গণিতোৎকর্ষের ফলেই।

ইউরোপে শূন্য-ব্যবহার সংবলিত হস্তলিখিত পুস্তকের যেসব নিদর্শন আছে, তার মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে ৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে লিখিত স্পেনের একখানা পাণ্ডুলিপি। আরব দেশে অবশ্য এই ধরনের অনেক প্রাচীনতর পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে। এস্থলে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইউরোপে আরবদের দ্বারা এই উন্নত লিখন-প্রণালী প্রবর্তিত হবার পরেও বহু শতাব্দী যাবৎ অধিকাংশ লোকই পূর্বতন রোমান পদ্ধতিই আঁকড়ে ধরে রাখল; কারণ তারা এই পদ্ধতিকে বেনিয়া ও পৌত্তলিক পদ্ধতি মনে করে এর সংস্রব থেকে দূরে থাকাই শ্রেয় মনে করেছিল। অবশেষে ত্রয়োদশ শতাব্দী নাগাদ ইউরোপের কয়েকটি দেশে এই পদ্ধতি চালু করা হয়। বলাবাহুল্য, এর আগে পর্যন্ত বর্তমানে আমাদের পাঠশালায় যে সহজ নিয়মে গুণ-ভাগ করানো হয়, তা-ও সম্ভব ছিল না। এ যাবৎকাল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রোমান বা আরব্য-পারস্য পদ্ধতিতে সহজে গুণ-ভাগ করবার বৃথা চেষ্টা চলেছিল। নতুন পদ্ধতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ অন্ততঃ আট-নয় শতাব্দী সময় লাগলো। এখন আমাদের কাছে ত এসব বেশ সহজ মনে হয়। তাই, আশ্চর্য লাগে— এতকাল ধরে গ্রীকদের বিরাট প্রতিভাশালী গণিতজ্ঞরাও কেন এই সহজ নিয়মটা উদ্ভাবন করতে পারেননি। আমরা গণিতের ইতিহাস অনুসরণ করতে করতে বারংবার দেখতে পাব, একযুগে যেসব

চিন্তাধারা ও ব্যবহারিক প্রক্রিয়া অতিশয় অস্পষ্ট ও কঠিন বলে মনে হয়, পরবর্তী যুগে তাই 'ডাল-ভাতের' মতো সহজ ও নিত্যব্যবহার্য হয়ে পড়ে। হয়ত কোনও প্রতিভাবান ব্যক্তি হঠাৎ একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐ ব্যাপারটা দেখতে পান, তাতেই আগে যা দুর্বোধ্য বা অস্পষ্ট ছিল তা-ই সহজ আর পরিষ্কার হয়ে যায়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে অনুপযোগী লিখন-পদ্ধতি ছাড়াও প্রাচীনকালে অঙ্কশাস্ত্রের উন্নতি বিলম্বিত হওয়ার আর একটি কারণ ছিল, সে হচ্ছে তখন পর্যন্ত উৎকৃষ্ট কাগজ ও ছাপাখানার উদ্ভাবন হয়নি। এমনকি, একশো বছর আগেও কাগজ দুর্মূল্য ছিল; কারণ তখনও কাঠের শাঁস ও মণ্ড থেকে যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাগজ উৎপাদন শুরু হয়নি। ভারতে কাগুজিয়ারা ছেঁড়া নেকড়া থেকে হাতে নেকড়ার কাগজ তৈরি করত। চীনারা তো খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী বা তারও কিছু আগে থেকেই কাগজ বানাতে শুরু করেছিল; কিন্তু ইউরোপে মাত্র চতুর্দশ শতাব্দীতে নেকড়ার কাগজ তৈরির প্রক্রিয়া, আর তারও একশো বছর পরে ছাপাখানার কাজ আরম্ভ হয়। এর আগে স্বভাবতঃই পুস্তকাদির সংখ্যা ছিল অল্প, আর মূল্য ছিল অধিক। সুতরাং মুষ্টিমেয় ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্যের পক্ষে পুস্তকাদি সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ছিল। তখনকার পুস্তকাদি প্যাপিরাস বা পার্চমেন্টের উপর হাতে লেখা হত।

মিসর দেশেই প্রথমে 'পাপু' বা প্যাপিরাসের ব্যবহার আরম্ভ হয়। পাপু একরকম নল বা খাগড়া, নীল নদের পাড়ে বা অগভীর জলাভূমিতে জন্মে। বাইবেলে আছে, বাচ্চা অবস্থায় মুসা পয়গম্বরকে 'বুল-রাশ'-এর ভেলায় করে নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 'বুল' শব্দের অর্থ বুলন্দ বা লম্বা জাতের। সম্ভবতঃ বুল-রাশ ডাঁটাওয়ালা পাপু খাগড়ারই আর এক নাম। এর ডাঁটাগুলোকে লম্বালম্বি কেটে পাতলা চটা তৈরি করা হত; পরে চটাগুলো গায়ে গায়ে সাঁটিয়ে পাটা বা তক্তার উপর রাখা হত। এর উপর এইরকম আর এক থাক চটা রেখে পানিতে ভিজিয়ে রাখা হত। অনুমান করা যায় যে, খাগড়াগুলোতে কিছু আঠালো পদার্থ বর্তমান ছিল; কারণ থাকগুলোকে চাপা দিয়ে রোদে শুকিয়ে নিলেই দেখা গেল, ওগুলো বেশ জোড়া লেগে চওড়া কাগজের মতো হয়ে গেছে। পরে শামুকের মসৃণ খোলা বা গজদন্ত দিয়ে ঘষে প্যাপিরাসকে পালিশ করা হত। এইরকম কয়েক তা প্রস্তুত হলে, পরে ওগুলো জোড়া দিয়ে এক লম্বা ফালি বানানো হত। পরে ঐ ফালির এক প্রান্তে একটি ডাণ্ডা বেঁধে দিয়ে সেখান থেকে গ্রন্থকার লিখতে শুরু করত। লেখা শেষ হলে অনেক লিপিকার নিযুক্ত করে তার নকল করাতে হত। বইগুলো পরে জড়িয়ে, ছোট বাক্সে রেখে সযত্নে কোনও গ্রন্থাগারে রেখে দেওয়া হত। এর থেকেই বোঝা যায়, একখানা বই লিখতে কত খরচ পড়ত, আর তা কেমন দুষ্প্রাপ্য ছিল।

প্যাপিরাসের উপর লেখা যে প্রাচীনতম গণিত পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গেছে তা নকল করেছিলেন একজন মিসরীয় লিপিকার 'আহমিজ' বা 'আহ্‌মোজ'। সে আজ পঁয়ত্রিশশো বছর বা তারও আগের কথা। বইখানা এখন বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন প্রফেসর টি.ই. পীট। বইয়ের নাম— 'প্রকৃতির উপর

অনুসন্ধান চালিয়ে, জগতে যা আছে, সেসব জানবার কায়দা-কানুন'। যে আসল বই থেকে 'আহ্‌মিজ' নকল তৈরি করেছিলেন তা অনুমান খ্রীস্টপূর্ব ২২০০ সালে রাজা তৃতীয় 'আমেনেমহাট'-এর রাজত্বকালে; অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে বইটি রচিত হয়েছিল। 'আহ্‌মিজ'-এর একটি টীকায় লেখা আছে :

> লোকে জানুক যে এই পুলণ্ডা (পুলিন্দা, roll) উচ্চ মিসর ও নিম্ন মিসরের অধিপতি 'আউসের্‌রে'-র আদেশক্রমে লিখিত হয়েছে এবং লিপিকার আহ্‌মিজ এই নকল লিখেছেন।

এই আহ্‌মিজ প্যাপিরাস থেকে জানা যায় যে চার হাজার বছর পূর্বেই মিসরীয়েরা ভগ্নাংশ ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিলেন, আর এমন কতকগুলো সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে তাঁরা অবগত ছিলেন, যা আজকাল বীজগণিতের সাহায্য নিয়ে করা হয়ে থাকে। তাঁরা আরও জানতেন যে, কোনও একটি বৃত্তের পরিধি ঐ বৃত্তের ব্যাসার্ধের যতগুণ, অন্য আর একটি বৃত্তের পরিধিও তার ব্যাসার্ধের ততগুণ; কিন্তু ঠিক কতগুণ তা অপ্রমেয়; অর্থাৎ কোনও পূর্ণ সংখ্যার ভগ্নাংশ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না।

পার্চমেন্ট ত প্যাপিরাসের চেয়েও দুষ্প্রাপ্য আর মহার্ঘ। জীবজন্তুর চর্ম থেকে (সচরাচর মেষ ও মেষ-শাবকের চামড়া থেকেই) পার্চমেন্ট তৈরি হত, (এবং এখনও হয়)। বাছুরের চামড়া থেকে যে পার্চমেন্ট তৈরি হয়, তাকে বলে ভেলাম। ভেলাম ত সাধারণ পার্চমেন্ট থেকেও অধিক মূল্যবান। এজন্য মধ্যযুগে স্বভাবতঃই পার্চমেন্টে লেখা পুরানো বইয়ের কালি ধুয়ে-মুছে তার উপর অন্য এক নতুন বই বা তার নকল লেখাতে হত। এসব পাণ্ডুলিপির নাম 'প্যালিম্‌প্‌সেস্ট' (Palimpsest) (পুনর্মার্জিত) লেখা। (Palin=পুনঃ, Psaein=ঘর্ষণ বা মার্জনা দ্বারা মসৃণ করা)। সৌভাগ্যের বিষয়, কালক্রমে অনেক পুনর্মার্জিত লেখা পুস্তকের পূর্বতন লেখা আবার কতকটা দৃষ্টিগোচর হয়। এইসব পুনর্মার্জিত লেখা পুস্তকের সাহায্যে আমরা প্রাচীন জগতের অনেক তথ্য জানতে পেরেছি। বৃটিশ মিউজিয়ামে নবম কিংবা দশম শতাব্দীতে লিখিত একখানা ধর্মতত্ত্বের পার্চমেন্ট পুস্তক আছে। এখানা ষষ্ঠ শতাব্দীতে নকল করা একখানা ল্যাটিন ব্যাকরণের উপর পুনর্মার্জিত লেখা; ঐ ব্যাকরণও আবার পঞ্চম শতাব্দীতে নকল করা একখানা ইতিহাস পুস্তকের উপর পুনর্মার্জিত লেখা। ঐ সংগ্রহের নবম শতাব্দীতে লেখা আর একখানা বইয়ে দেখা যায়— এর কতকটা লেখা হয়েছে ষষ্ঠ শতাব্দীতে নকল করা হোমারের ইলিয়ডের উপর আর কতকটা ঐ শতাব্দীতে নকল করা সেন্ট লুইয়ের সুসমাচারের উপর, আর বাকিটা লেখা হয়েছে সপ্তম শতাব্দীতে নকল করা ইউক্লিডের এলিমেন্টের উপর।

রোম সম্রাটদের সময় এবং তার আগেও, ভোট গণনা বা ঐরকম সহজ হিসাব করা হত বালু-ভরা থালার উপর আঙ্গুল দিয়ে কিংবা কাঠির সূঁচালো আগা দিয়ে। হিসাব শেষ হয়ে গেলে আবার হাত দিয়ে বালুর দাগ মুছে সমান করে দেওয়া হত। ইউক্লিড এবং অন্যান্য গণিতজ্ঞও ঐরকম বালুর থালার উপর জ্যামিতির অঙ্কন করতেন। বর্তমানে যে জ্যামিতি পড়ানো হয়, তার প্রায় সবটাই ২২০০ বছর আগে বালির থালার উপরেই প্রথম কষা হয়েছিল। সমতল তক্তা, পিঁড়ি বা থালার গ্রীক নাম (আবাক্স) abax; আর হিসাব করবার থালার নাম ছিল (আবাকাস) abacus। এই আবাকাসকেই উপরে হিসাব-তক্তি বলা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জ্যামিতি ও গ্রিক গণিতের স্বর্ণযুগ

অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষেরও মৌলিক প্রয়োজন হচ্ছে ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগাদি থেকে আত্মরক্ষা। অবশ্য কাঠ, পাথর, ধাতব পদার্থ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা এবং প্রাকৃতিক নিয়মাদি আয়ত্ত করে নিজের কাজে লাগানো— এ কেবল মানুষই পারে। বলতে গেলে, খাদ্যসংগ্রহ, আশ্রয় ও নিরাপত্তা-ব্যবস্থার বিকাশই মানব সভ্যতার ইতিহাস। এসব দিকে আজ মানুষের সাফল্য এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে, এখন তার কল্যাণকরী আর প্রলয়ঙ্করী ক্ষমতা উভয়ই প্রায় অপরিসীম। এতে তার জীবন-ধারণ অনেক সহজ আর নিরাপদ হয়েছে সত্য; কিন্তু সুখ-শান্তি বেশী হয়েছে মনে করবার হেতু নেই।

ক্রমে ক্রমে প্রয়োজনের তাগিদে শিকার, আত্মরক্ষা আর কাঠ-পাথরের উপর কাজ করবার জন্য মানুষ ধারালো অস্ত্র বানাতে শিখেছে; ফলে এখন সে পর্বতগুহায় আবদ্ধ না থেকে যেখানেই খাদ্য ও পানীয়ের প্রাচুর্য আছে সেখানেই ঘর বেঁধে বাস করতে পারে। এখন সে সুন্দর গড়নের হাঁড়ি-পাতিল আর অন্যান্য তৈজসপত্রও বানাতে শিখে গেছে। এতে শুধু যে রাঁধা-বাড়ার ব্যবস্থা সহজ হয়েছে, তা-ই নয়, ভবিষ্যৎ দুর্দিনের কথা ভেবে শস্যাদি মজুদ করে রাখারও সুবিধা হয়েছে।

স্ত্রীলোকেরা হয়ত হাড়ের সরু চিলতের মোটা দিকটায় ছিদ্র করে তার ভিতর তন্তু বা সুতো পরিয়ে বস্ত্র-বয়নের সূত্রপাত করেছে। আস্তে আস্তে ঘর-বাড়ী তৈরির কাজেও উন্নতি হয়েছে; তারজন্য সমতল ভূমি প্রস্তুত করতে হয়েছে, আর চৌকাঠ, আড়নি প্রভৃতি চোখের আন্দাজে লম্বভাবে স্থাপন করবার কায়দা শিখতে হয়েছে, এইভাবে প্রাথমিক ওলন রজ্জু এবং ছুতারের চতুষ্ক বা আড়কাঠ তৈরি হয়েছে।

অবশ্য, এইভাবে যে ভূমির সমতলতা নির্ণয় করা যায় তার প্রমাণ সে যুগের লোকদের জানা না থাকলেও, তাঁরা ব্যবহারিক প্রয়োগ থেকে এর সত্যতা উপলব্ধি করেছিলেন। এই ধরনের ওলন-যন্ত্র পাওয়া গেছে প্রাচীন মিসরীয় কবরখানায়, আবার এর চিহ্ন পাওয়া গেছে কোনও কোনও প্রাচীন রোমক জরিপকারের সমাধি মন্দিরে। এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে মিসরীয় পিরামিড ও মন্দির নির্মাতারা এবং বহু পরবর্তী যুগের রোমান রাজমিস্ত্রীরাও ভিত্তি স্থাপন করবার জন্য এই সাধারণ ওলন যন্ত্রই ব্যবহার করে গেছেন।

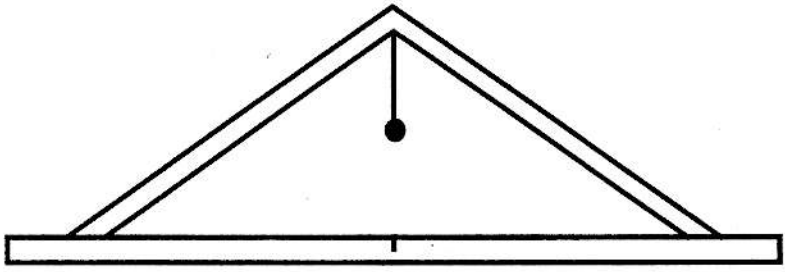

প্রাথমিক ওলন-যন্ত্র

সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের মতো তিনখানা কাঠ একত্র জোড়া দেওয়া, বৃহত্তম বাহুর মধ্যস্থল একটি দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা; সমান বাহু দুটোর জোড় থেকে একটা সরু রশি ঝুলানো, আর তার মাথায় একটি ওজন বাঁধা। বৃহত্তম বাহু ভূমির উপরে এবং সমান দুই বাহু ঊর্ধ্বদিকে রেখে দেখলে যদি ওলনটা ঠিক মাঝখানের দাগের উপর বরাবর দেখা যায়, তাহলে বোঝা যায় যে ভূমিটি সমতল হয়েছে।

সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে আরও নতুন নতুন উদ্ভাবনা দেখা দিল। এইভাবে প্রাচীন যুগের মানুষ অজ্ঞাতসারেই বর্তমান গণিতশাস্ত্র আর প্রকৃতি বিজ্ঞানের ভিত্তিপত্তন করে গেছেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হয়েছে, একটি ত্রিভুজের তিন বাহুর পরিমাণ যথাক্রমে ৩, ৪ ও ৫ একক হলে, ক্ষুদ্রতর বাহু দুটোর সংযোগস্থলে যে কোণ উৎপন্ন হয়, তা এক সমকোণ। বৃহৎ বর্গক্ষেত্রের উপর পিরামিড তৈরি করবার সময় মিসরীয় আমিনরা সুদীর্ঘ রজ্জুর সাহায্যে সমকোণের রেখাপাত করতেন।

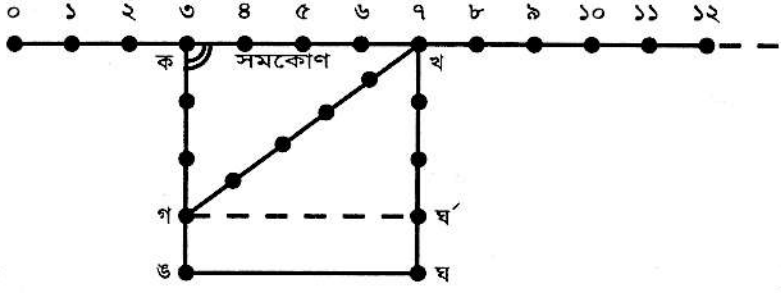

সমকোণ অঙ্কনের রজ্জু

একটি লম্বা রশিতে সুবিধা মতো এককের ১২ একক চিহ্নিত করে প্রারম্ভে, শেষে এবং তৃতীয় ও সপ্তম চিহ্নের স্থলে একটি করে গিরে দেওয়া হত। এভাবে গিরেগুলোর মধ্যে তিন, চার ও পাঁচ একক পরিমাণ রশি পৃথক করা হত। তারপর মধ্যম খণ্ড টান করে ধরে, তার প্রত্যেক প্রান্তে একটি করে খুঁটি গাড়া হত। পরে দু'জনে খুঁটি দুটোর বাইরের দু'মাথা টেনে মিলিয়ে সেখানে আর একটা খুঁটি পুঁতত। এইভাবে, যে ত্রিভুজটা তৈরি হত, তার ছোট দু'বাহুর মধ্যেকার কোণকে এক সমকোণ ধরা হত। অবশ্য এখন আমরা তা প্রমাণও করতে পারি; কিন্তু সে যুগে খুব সম্ভব এ ছিল একটা রহস্যজনক পরীক্ষিত ঘটনা। এখন পিরামিডের ভিত্তির জন্য এই সমকোণের সন্নিহিত দুটো বাহু যত বড় দরকার ততদূর পর্যন্ত বাড়িয়ে, সমান করে, সেখানে নতুন দুটো খুঁটি গেড়ে, তিনটি সমকোণীয় বিন্দু পাওয়া গেল; আর এই ত্রিভুজটার বৃহত্তম বাহু একটি আয়তক্ষেত্রের একটি কর্ণ। এখন এই কর্ণের বিপরীত দিকে ছোট বাহু দু'টির সমান দুটো রশির মাথা একত্র মিলিয়ে প্রথম সমকৌণিক বিন্দুর বিপরীত দিকের সমকৌণিক বিন্দু র্ঘ সহজেই পাওয়া গেল। এইভাবে পূর্ব পৃষ্ঠায় চিত্রিত ক-খ-ঘ-ঙ বর্গক্ষেত্রটি সহজেই পাওয়া যায়। এস্থলে মিসরীয়দের নিখুঁত মাপ-জোখের বিষয়ে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে তাদের তৈরি পিরামিডের চারটি ত্রিভুজাকার সমতলই ঠিক একটি শীর্ষ বিন্দুতে মিলে যেত, আর ঐ শীর্ষ বিন্দু ভূ-পৃষ্ঠ থেকে অত্যুচ্চে অবস্থিত হলেও ভূমিস্থ বর্গক্ষেত্রের কেন্দ্রের ঠিক উপরেই থাকত।

মিসরীয় পুরোহিতগণ বহু শতাব্দী ধরে এইসব ব্যবহারিক গণিতের বিশিষ্ট ধারক ও শিক্ষকরূপে পরিচিত ছিলেন; কিন্তু এঁরা এসবেরও যে প্রমাণ থাকতে পারে, তা ভাবেননি। পরে এসবের প্রমাণ বা এগুলোর পিছনকার যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করেন গ্রীক মনীষীগণ। নীল নদের পাশেই মিসরীয় সভ্যতার বিকাশ হয়। এজন্য মিসরকে 'নীল নদের সন্তান', আর নীল নদকে 'জ্যামিতির প্রসূতি' বলা হয়। প্রাচীন মিসরীর 'কপ্ট'দের ভাষায় 'ইজিপ্ট'-এর অর্থ 'কালোমাটি'। নীল নদ বর্ষাকালে দু'কূল প্লাবিত করে আবিসিনীয় পর্বত-ধোয়া অতি উর্বর কালোমাটির আস্তরণ বিছিয়ে দিতে দিতে ভূমধ্যসাগরে গিয়ে পড়ে। তাতে বছর বছর ক্ষেতের আল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় আবার সীমানা ঠিক করবার কাজ লাগে। এই কারণেই মিসরীয়গণের পক্ষে জ্যামিতি ও পরিমিতির আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল জরুরীভাবে।

এঁদের ভূমি-জরিপ আরম্ভ হবার হাজার হাজার বছর পরে 'মিলেটাস' নগরের এক গ্রীক সওদাগর মিসরীয়দের ব্যবহারিক জ্যামিতির জ্ঞানভাণ্ডার থেকে কিছু আহরণ করবার জন্য পুরোহিতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। সে সময় গ্রিক সভ্যতার প্রথম কেন্দ্রভূমি আয়োনিয়া-র অন্তর্গত 'মিলেটাস'-ই ছিল তৎকালীন গ্রিক অধ্যুষিত অঞ্চলের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী নগর। এখন তুরস্কের পশ্চিমাংশের যে উপদ্বীপ অঞ্চলকে আমরা 'ক্ষুদ্র এশিয়া' বা 'এশিয়া মাইনর' বলি তার ভিতর দিয়ে মিয়ান্ডার নামক আঁকা-বাঁকা নদীটি একটি জনবিরল জলাভূমির উপর দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে; কিন্তু আড়াই হাজার বছর আগে এইখানেই ছিল মিলেটাস শহর।

খ্রীস্টপূর্ব ৬৪০ সালে থেলিস (Thales) নামক একটি বালক এই নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা এই শহরেরই আদি বাসিন্দা ছিলেন। এই অসাধারণ কর্মক্ষমতার অধিকারী বালক অল্প বয়সেই বাণিজ্য দ্বারা প্রচুর বিত্ত অর্জন করেন এবং আর কিছু না করেই রাজনীতি এবং সামাজিক ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে পড়েন। প্রবাদ আছে, একসময় তিনি নাকি মিলেটাস এবং তার আশেপাশে যত জলপাই-পেষা কল ছিল, সবগুলো কিনে নিয়ে ঐ তেলের একমাত্র অধিকারী বনে যান; কিন্তু তিনি মুনাফাখোরীর দিকে মন না দিয়ে উচিত দরেই জলপাইয়ের তেল বিক্রয় করেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সমুদয় জলপাইকে এক কোণস্থ (অর্থাৎ পারিভাষিক ভাষায়, কর্নার) করা যায় কি না তা-ই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা। এইটুকু প্রমাণ করতে পেরেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন, বে-পরোয়া লাভের দিকে ঝুঁকে পড়েননি। অল্প বয়সেই তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার খ্যাতি প্রচারিত হয়ে পড়ে, এমনকি গ্রিসের সাতজন বিজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে তিনিও একজন বলে গণ্য হন; কিন্তু আড়াই হাজার বছর পরে, আমরা থেলিসের মননশক্তির গুণেই আজও তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি— তাঁর রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। যৌবনে তিনি মিসরীয়দের ব্যবহারিক ভূ-পরিমিতি দেখে এসে ভূমির ক্ষেত্রফল নির্ণয় বিষয়ে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। তাই ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি অবসর সময়ে জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রের অধ্যয়নে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এই ভূ-পরিমাণ নির্ধারণের গ্রীক নাম হচ্ছে 'জিওমেট্রি', যাকে আমরা জ্যামিতি বলে থাকি।

তিনি মিসরে পর্যটন করবার কালে বাবিলনীয় জ্যোতির্বিদ্যারও অনুরাগী হয়ে পড়েছিলেন। গ্রিস দেশে তিনিই প্রথম জ্যোতির্বিদ্যার সূত্রপাত করেন। খ্রীস্টপূর্ব ৫৮৫ সালে সূর্যগ্রহণ হবে, এ বিষয়ে তিনিই প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এতে সারা গ্রিস দেশ চমৎকৃত হয়ে যায়; আর যখন সত্যি সত্যিই ঐ বছর ২৮শে মে তারিখের সূর্যগ্রহণ দেখা গেল তখন আর লোকের বিস্ময়ের অবধি রইল না। গ্রীক ঐতিহাসিক 'হিরোডোটাস' লিখেছেন, ঐ সময় একটি যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছিল, তখন সূর্যগ্রহণ হতে দেখে যুদ্ধ থেমে যায়, তারপর বহুদিন যাবৎ শান্তি অব্যাহত ছিল। খুব সম্ভব, বাবিলনীয় সূত্র থেকেই থেলিস সূর্যগ্রহণের বিষয় জানতে পেরেছিলেন; কারণ ঐ দেশের লোকেরা এর বহু শতাব্দী আগে থেকেই এসব বিষয়ে ভালভাবেই অবহিত ছিলেন। সে যা হোক, থেলিসের নেতৃত্বে জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে গ্রীকদের ভিতরে যে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল, তার ফলে গ্রীক গণিতজ্ঞরা আমাদের সৌরজগৎ সম্বন্ধে এমন সব তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন, যার সত্যতা বর্তমান যুগের অল্প কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত লোকে সাধারণভাবে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়নি।

থেলিসের বিশেষ দান তাঁর জ্যোতির্বিদ্যা নয়, গণিতকে যুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাতেই তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। মিসরীয়দের ব্যবহারিক জ্যামিতিক তথ্যগুলো কিভাবে প্রমাণ করা যায়, তাঁর মনে এই কৌতূহল প্রবল হয়। এইভাবে তিনি যে যুক্তি-পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, তাই আজ বিকশিত হয়ে বর্তমান যুক্তি-সিদ্ধ জ্যামিতির গোড়া পত্তন করেছে। এ পদ্ধতিতে প্রথমে কয়েকটি সহজ বা সর্বস্বীকৃত বিষয় মেনে নিয়ে, তারপর

বিচারের সূত্র ধরে অগ্রসর হতে হতে ক্রমান্বয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়। মাঝখানে কেবল স্বীকৃত বিষয়গুলো, আর তার থেকে বিশুদ্ধ বিচারক্রমে উৎপন্ন অনুসিদ্ধান্তগুলোই যুক্তিতে ব্যবহৃত হয়। কার্যত জ্যামিতিক প্রমাণের প্রথমেই মনে মনে খানিকটা বিশ্লেষণের পালা থাকে। এই বিশ্লেষণ বা Analysis এসেছে গ্রীক শব্দ Analusis থেকে— এর অর্থ 'ঢিলে করে দেওয়া'। রাসায়নিক যখন কোনও যৌগিক পদার্থ বিশ্লেষণ করেন, তখন তিনি ঐ পদার্থের জটিলতা শিথিল করে বা জট ছাড়িয়ে, তার মৌলিক উপাদানগুলো পৃথক করে ফেলেন। সেইভাবে, গণিতজ্ঞ যখন কোনও সমস্যা বিশ্লেষণ করেন, তখন তিনি সিদ্ধান্তটিকে কয়েক টুকরো করে স্বতঃসিদ্ধ বা সত্য বলে স্বীকৃত বিষয়গুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত করবার চেষ্টা করে থাকেন। তারপর তিনি বিপরীতক্রমে স্বতঃসিদ্ধ ও অনুসিদ্ধান্ত থেকে বিচার-পদ্ধতির সাহায্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এই টুকরোগুলোকে 'জোড়া লাগাবার' প্রক্রিয়াকে বলা হয় Synthesis বা সংশ্লেষণ।

কেউ হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন— এ আর এমনকি? কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ না হলে আমরা আজ যাকে গণিতশাস্ত্র বলে থাকি, তার জন্মই হত না; আর এর অভাবে বর্তমান বিজ্ঞান—ইঞ্জিনিয়ারিং বলে কিছুই থাকত না। গণিতের সাহায্যেই আমরা পৃথিবীর গতি হিসাব করে দিন-ক্ষণ ঠিক করে পঞ্জিকা প্রস্তুত করে থাকি, তা না হলে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হত। অঙ্কের সাহায্যেই নকশা ও স্থানের ম্যাপ তৈরি হয়, নইলে ভ্রমণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হতে পারত না। এর সাহায্যেই আবহাওয়াবিদরা ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাত ও জোয়ার-ভাঁটার আগাম খবর দিতে পারেন। এর সাহায্যেই নাবিকেরা পথহীন সমুদ্র, আর পর্যটকেরা জনহীন মরুভূমি উত্তরণ করতে পারেন। গণিতের সাহায্য ছাড়া আমাদের বর্তমান সভ্যতার অস্তিত্বই থাকত না— স্থপতি, রাজমিস্ত্রী, বিদ্যুৎ-বিশারদ, রেডিও-প্রস্তুতকারক এবং আরও অনেকে বেকার হয়ে পড়তেন; আমাদের যন্ত্রপাতি, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রেডিও, এক্স-রে, সবাক চিত্র, বৈদ্যুতিক আলো, বৈদ্যুতিক উনুন প্রভৃতি হয়ত আস্তাকুঁড়ে স্থান লাভ করত। স্বীকার করতেই হবে, সভ্যজগতের এইসব উপকরণ সৃষ্টির গোড়ায় রয়েছে গাণিতিক যুক্তিবিদ্যা। কাজে কাজেই, থেলিস ব্যবসায় ক্ষান্ত দিয়ে যেভাবে অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করেছিলেন, তার জন্য অবশ্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

পরবর্তীকালের বহু গ্রিক গণিতজ্ঞ জ্যামিতিক জ্ঞানকে ব্যবহারিক কার্যে নিয়োগ করতে কুণ্ঠিত হতেন; কিন্তু থেলিসের আচরণ ছিল অন্য প্রকার। তিনি নাকি একবার একটি পিরামিডের ছায়া মেপে ওর উচ্চতা নির্ণয় করে মিসরীয়গণকে চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন। প্লিনী (Pliny) বলেন, যে সময় মানুষের ছায়া ঠিক তার সমান হয়, সেই সময় থেলিস উক্ত পিরামিডের ছায়া মেপেছিলেন; কিন্তু এতে মিসরীয়রা চমৎকৃত হবে, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়; কারণ তারা ত খ্রীস্টের জন্মের পনরশো বছর আগেও ছায়া-ঘড়ির সঙ্গে পরিচিত ছিল, তবে হতে পারে, তারা সদৃশ ত্রিভুজের সঙ্গে পরিচিত নাও থাকতে পারে। কাজে কাজেই প্লুটার্ক (Plutarch)-এর বর্ণনাই অধিক সঙ্গত বলে মনে

হয়। তিনি বলেন, থেলিসের পিরামিড মাপার সঙ্গে দিবসের সময়ের কোনও সংস্রব ছিল না, তবে তাঁর হিসাবে সদৃশ ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর সমানুপাত ব্যবহার করা হয়েছিল।

পিথাগোরাস : থেলিসের মৃত্যুর অনুমান ছত্রিশ বছর পূর্বে, অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব ৫৮০ সালের কাছাকাছি সময়ে, মিলেটাস থেকে কয়েক মাইল দূরে 'সাময়' নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে আর একজন বিখ্যাত গণিতবিদের জন্ম হয়। এই দ্বীপের তৎকালীন বাসিন্দাদের পূর্বপুরুষগণ, আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ১০০০ সালের দিকে সেখানে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। বর্তমানে যে-কোনও জ্যামিতির বইয়েই পিথাগোরাসের নাম দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর শৈশব ও যৌবন কাল সম্বন্ধে তেমন কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। শুধু এইটুকু জানা যায় যে, তিনি থেলিসের কাছে অধ্যয়ন করেছিলেন, আর হয়ত তাঁরই উপদেশ অনুসারে মিসরে গিয়ে ভূ-পরিমাপের নিয়ম-কানুন দেখে এসেছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি সাময় ত্যাগ করে দক্ষিণ ইটালির ক্রোটোনা শহরে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর গৃহত্যাগের কারণ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না, তবে তিনি যে ক্রোটোনায় অল্পদিনের মধ্যেই এক-রকম ভ্রাতৃসঙ্ঘ গঠন করতে, আর গাণিতিক চিন্তাধারার তত্ত্ব-ঘটিত অভিমত গঠন করতে পেরেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পিথাগোরিয়ানদের অনেক মতামত বা বিশ্বাসই আমাদের কাছে অদ্ভুত ঠেকে; তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, তাঁরা পিথাগোরাসের মৃত্যুর বহু পরেও গণিতশাস্ত্রের অনেক উন্নতি সাধন করে গেছেন। এঁদের চিন্তাধারা দ্বারা গ্রিক সভ্যতা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিল। মনে হয়, আক্ষরিকভাবে না হলেও, তাঁরা এক প্রকার সমবায়-নীতি (Communism) মেনে চলতেন। এটা অবশ্য তাঁদের চক্রের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তাঁরা যে শুধু পরস্পরের ধন-সম্পদের অধিকার ভোগ করতেন, তাই নয়, তাঁরা নিজেদের গাণিতিক ও সমষ্টিগত দার্শনিক আবিষ্কারগুলোও দলীয় আবিষ্কার বলে মনে করতেন। প্রথম প্রথম নিজেদের ভ্রাতৃসঙ্ঘের সঙ্কেত বা শিক্ষাগুলো অন্যত্র প্রচার করবেন না, বা অপর কাউকে শেখাবেন না, এই মর্মে একটি শপথ গ্রহণ করার রীতি ছিল। প্রথমে তো এই সঙ্ঘের নির্দেশাদি মুখে মুখেই প্রচারিত হত; কালক্রমে এগুলো লিখিত আকারে রক্ষিত হয়। এরই একখণ্ড পরে প্লেটোর (আফলাতুনের) হাতে পড়ে এবং তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

হয় পিথাগোরাস নিজেই, কিংবা তাঁর কোনও শিষ্য, যন্ত্রসঙ্গীতে স্বরগ্রামের নিয়ম আবিষ্কার করেন। নিয়মটি এই যে, স্পন্দমান তারের দৈর্ঘ্য যে অনুপাতে হ্রাস করা যায় তার সুরের তীব্রতা সেই অনুপাতে বর্ধিত হয়। কোনও নির্দিষ্ট জোরে টান দেওয়া একটি তার থেকে যে সুর উৎপন্ন হয়, ঐ তারের অর্ধাংশ স্পন্দিত করলে তার থেকে দ্বিগুণ তীব্র সুর নির্গত হবে। অন্য কথায়, সম্পূর্ণ তারটি সেকেন্ডে যতবার স্পন্দিত হবে, অনুরূপ অবস্থায় ঐ সময়ে অর্ধেক লম্বা তার দ্বিগুণ, এক-তৃতীয়াংশ লম্বা তার ত্রিগুণ, এক-চতুর্থাংশ লম্বা তার চারগুণ স্পন্দিত হবে। সর্বাধিক প্রচলিত রীতি অনুসারে বিশুদ্ধ সুরগুলোর স্পন্দন সংখ্যার অনুপাত নিম্নরূপ :

সুর –	সা	রে	গা	মা	পা	ধা	নি	সা	রে	গা	মা	পা
স্পন্দন সংখ্যার অনুপাত –	২৪	২৭	৩০	৩২	৩৬	৪০	৪৫	৪৮	৫৪	৬০	৬৪	৭২

দেখা যাচ্ছে মূল সুর, সা থেকে পা (পঞ্চম) দেড়গুণ তীব্র, উচ্চগ্রামের সা দ্বিগুণ তীব্র, আর উচ্চগ্রামের পা তিনগুণ তীব্র; অর্থাৎ যতবড় তারে 'সা' সুর সম্পন্ন হয়, তার দুই-তৃতীয়াংশে 'পা', অর্ধেকে উচ্চতর গ্রামের 'সা', ও এক-তৃতীয়াংশে উচ্চতর গ্রামের 'পা' উৎপন্ন হয়। লক্ষ্য করবার বিষয় সেতার যন্ত্রে আঙ্গুল দিয়ে টিপে ধরে বাদিত তারের দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয়।

পিথাগোরিয়ানরা জোড়-বিজোড় সংখ্যার নামকরণ করেছিলেন। তাঁরা জোড়-সংখ্যাকে স্ত্রী আর বিজোড় সংখ্যাকে পুরুষ বলে মনে করতেন। তাঁদের ভ্রাতৃসঙ্ঘের মেম্বর সকলেই পুরুষ ছিলেন। এজন্য স্বভাবতঃই বিজোড়-সংখ্যাকে স্বর্গীয় আর জোড় সংখ্যাকে পার্থিব বলে গণ্য করা হত। নিঃসন্দেহে তাঁদের 'জোড়-সংখ্যা' বা নারী জাতি এতে কোনও প্রতিবাদ তোলেননি। অন্ততঃ বিজোড়-সংখ্যা যে পয়মন্ত, তা স্বীকার করতে ঐ যুগের নারী সমাজের দ্বিধা ছিল না। সেক্সপিয়রের লেখাতেও এই সংস্কারের উল্লেখ দেখা যায়। [The Merry Wives of Windsor-এ Falstaff-এর উক্তি দ্রষ্টব্য।]

কিন্তু পিথাগোরিয়ানরা জ্যামিতির ব্যবহারিক প্রয়োজনের চেয়ে বিশুদ্ধ তর্ক বা গণিত নিয়েই অধিক ব্যাপৃত থাকতেন। এ দিক দিয়ে তাঁরা থেলিসের জ্যামিতিক যুক্তির ভিত্তি আরও দৃঢ় করবার চেষ্টা করেছিলেন। পিথাগোরাসের বিখ্যাত 'উপপাদ্য' এই যে, সমকোণী ত্রিভুজের বৃহত্তর বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের সমষ্টির সমান। তিনি অবশ্যই জানতেন, যে ত্রিভুজের বাহুগুলো ৩, ৪ ও ৫ একক, সেটি সমকোণী ত্রিভুজ এবং মেপে দেখা যায় যে, এক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপপাদ্য খাটে; আর সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের বেলায়ও এ উপপাদ্য

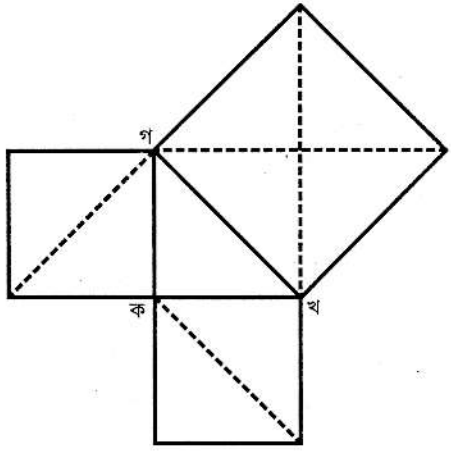

ক খ গ সমকোণী ত্রিভুজের ক সমকোণ, কখ=কগ। চিত্র থেকে সহজেই দেখা যাচ্ছে কখ ও কগ-এর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র দুটোর সমষ্টি খগ-এর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রটির সমান।

সহজেই প্রমাণ করা যায় (পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্র); কিন্তু যে-কোনও সমকোণী ত্রিভুজের বেলায় এ উপপাদ্যের যুক্তিগত প্রমাণ পিথাগোরাসের আবিষ্কার বলেই সকলে মনে করেন।

অঙ্কশাস্ত্রে ব্যবহৃত বহু শব্দই আমরা পিথাগোরিয়ানদের কাছ থেকে পেয়েছি। Mathematics শব্দটাও সম্ভবতঃ তাঁরাই সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন। গ্রিক শব্দ 'ম্যাথেমা' বলতে বিজ্ঞান বুঝাত। 'প্যারাবোল', 'ইলিপ্‌সিস', 'হাইপারবোল'-এর অর্থ যথাক্রমে সম-মান, ঘাটতি-মান (বা ঊন-মান) ও বাড়তি-মান (বা অতি-মান)— এসব স্থলে প্যারা অর্থে সমান, ইলিপ্‌সিস অর্থে অপূর্ণ, হাইপার অর্থে অধিক বা অতিরিক্ত এবং বোল অর্থে বুলন্দ, লম্বা, বৃহৎ ইত্যাদি বুঝায়। এ থেকেই কয়েকশো বছর পরে বিখ্যাত গ্রিক জ্যামিতিবিদ্ একটি কোণকের বিভিন্ন প্রকার সমতল ছেদ বুঝাবার জন্য প্যারাবোলা, ইলিপ্স ও হাইপারবোলা শব্দ ব্যবহার করেন যা ইংরেজিতে এখনও চালু রয়েছে।

পিথাগোরিয়ানরাই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন— পৃথিবী চেপ্টা নয়, গোলাকার। চাঁদের উপর পৃথিবীর গোলাকার ছায়া দেখেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত করেন। পরবর্তী গ্রিক গণিতজ্ঞেরা একথা অবশ্য অনেক আগেই মেনে নিয়েছিলেন; কিন্তু সাধারণ লোকে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে দূর-দূরান্তের সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ হওয়ার আগে পর্যন্ত একথা স্বীকার করে নেয়নি।

পিথাগোরিয়ানদের বড় বড় গবেষণার মধ্যে এই কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য : (১) সংখ্যার তত্ত্ব ও প্রকৃতি নির্ণয়, (২) 'যে-কোনও দুটি দৈর্ঘ্যের একটি সুনির্দিষ্ট সাধারণ বিভাজক আছে কি না', (৩) 'যে-কোনও সমতলের উপর কোনও নির্দিষ্ট আকৃতির ক্ষেত্র বারংবার স্থাপন করে ঐ তলটি একদম ভরে ফেলা যায় কি না', (৪) 'কোনও নির্দিষ্ট আকৃতির একটি ঘন পদার্থ পুনঃ পুনঃ স্থাপন করে একটা বাক্স, গহ্বর কিংবা গোলক সম্পূর্ণ ভরে ফেলা যায় কি না'— এসব বিষয়ে মীমাংসার চেষ্টা। যাঁরা এগুলো করতে চেষ্টা করেছেন, কেবল তাঁরাই ধারণা করতে পারেন, এসব প্রশ্ন দেখতে যেমন সোজা মনে হয়, আসলে তেমন সহজ নয়। উদাহরণস্বরূপ, বর্গক্ষেত্রের বাহু ও কর্ণের সাধারণ গুণনীয়ক বের করতে চেষ্টা করুন, দেখবেন তা পারা যায় না। যা হোক, এইসব অনুসন্ধান করতে করতে পিথাগোরিয়ানরা সম-দ্বাদশ-তল ও সম-বিংশ-তল আবিষ্কার করেছেন— প্রথমটা 'ডোডেকা হেড্রন' বা সমান বারটি পঞ্চভুজ দ্বারা বেষ্টিত ঘনক্ষেত্র, আর দ্বিতীয়টি 'আইকোসা হেড্রন' বা সমান বিশটি সমবাহু ত্রিভুজ দ্বারা বেষ্টিত ঘনক্ষেত্র। প্লেটোর ঘনবস্তু (Platonic Solids) নামে পরিচিত এরকম সম ঘনক্ষেত্র (যার পৃষ্ঠতলগুলো পাশাপাশি স্থাপন করে সমতল স্থান ভরে ফেলা যায়), মাত্র পাঁচটি আছে। অন্য তিনটে আগেই মিসরীয়গণ আবিষ্কার করেছিলেন। সেগুলো হচ্ছে সম-ষষ-তল (Cube), সম-চতুর্তল (Tetrahedron) ও সম-অষ্টতল (Octahedron) ঘনক্ষেত্র।

প্লেটো (খ্রীঃ পূঃ ৪০০) : জ্যামিতির ঐতিহাসিক সূত্র ধরে থেলিস (খ্রীঃ পূঃ ৬৪০) ও পিথাগোরাসের (খ্রীঃ পূঃ ৫৮০) যুগ পার হয়ে এখন আমরা খ্রীস্টপূর্ব ৪০০ সালের কাছাকাছি এসে পড়েছি। ঐ সময়ে এথেন্স নগর থেকে মাইল খানেক দূরে একটি প্রাচীর

ঘেরা মনোরম উদ্যানে বসে সুবিখ্যাত দার্শনিক ও সমাজ-গুরু প্লেটো বা আফলাতুন শিক্ষাদান করতেন। ইতিপূর্বে ঐ বাগানের মালিক ছিলেন 'একাডেমস' নামক এক সৌখিন ভদ্রলোক। তাঁর নাম অনুসারে বাগানের নাম ছিল 'একাডেমিয়া'। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ এখানে প্লেটো দর্শন ও সমাজতত্ত্ব শিক্ষা দেন। এই কারণে তাঁর শিক্ষাকেন্দ্রটি 'একাডেমী' নামে পরিচিত হয়ে পড়ে। তাই এখন কোনও কোনও শিক্ষাকেন্দ্রকে একাডেমী বলা হয়।

ঐ যুগে এথেন্সের লোকদের— অন্ততঃ যাঁরা চিন্তা-ভাবনা করতেন তাঁদের অবস্থা অনেকটা বর্তমান যুগের চিন্তাশীলদের অবস্থার মতোই ছিল। গণতন্ত্রী এথেন্স সে-সময় স্পার্টার সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। স্পার্টা ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন স্বৈরাচারী নেতার অধীনে একটি দাস-রাষ্ট্র। এখনকার মতো তখনও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ক্ষমতাশালী নাগরিকদের ক্ষুদ্র স্বার্থ-চিন্তা এবং সাধারণ দেশবাসীদের সামগ্রিক কল্যাণ-চিন্তায় নিস্পৃহতা দেখে মর্মপীড়া অনুভব করতেন। এই অবস্থায় প্লেটো চিন্তা করতে লাগলেন, দেশ-শাসন করবার শ্রেষ্ঠ উপায় কি? যা হোক এসব বিষয়ে তাঁর বিস্তারিত খসড়ার বর্ণনা না দিয়ে বরং সুস্থ চিন্তা ও যুক্তির জন্য গণিত, তথা জ্যামিতিক জ্ঞানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করা যাক। তিনি বলেছেন, 'যে কেউ জননেতা হতে চায়, তারই উচিত অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করা।' এখানে তিনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জ্যামিতির প্রয়োগের কথা বলছেন না, তিনি বলতে চাচ্ছেন, 'মানুষের নেতা হলে যে বুদ্ধি ও বিচার-শক্তির প্রয়োজন, তার উত্তম অনুশীলনী হতে পারে জ্যামিতিক প্রমাণ-পদ্ধতি আলোচনা করার দ্বারাই।' এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে পরবর্তী যুগে (অষ্টাদশ শতাব্দীতে) জেনেই হোক বা না জেনেই হোক পৃথিবীর একজন অতি বিশিষ্ট নেতা (এব্রাহাম লিঙ্কন) প্লেটোর এই উপদেশ পালন করেছিলেন; কারণ তিনি জীবনসংগ্রামে রত আইন-ব্যবসায়ী থাকাকালেই চল্লিশ বছর বয়সে, শুধু চিন্তাশক্তি বা বিচারশক্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য ছয় খণ্ড ইউক্লিডের বই পড়ে আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন।

ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে অঙ্ক বা জ্যামিতি তুলে ধরতে হলে এ সম্বন্ধে প্লেটোর মতামত এখন পর্যন্ত আধুনিক বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন :

> গণিত শিক্ষার প্রতি অনুরাগ জন্মাবার জন্য, এর সঙ্গে আমোদ এবং প্রমোদেরও ব্যবস্থা করতে হবে। নানারকম খেলার মাধ্যমে— যেমন বিভিন্ন মুদ্রা একত্র ব্যবহার করে বণ্টন ও বিনিময়াদির অভ্যাস করাতে হবে, কুস্তি ও মুষ্টিযুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যাদির সমাধান করাতে হবে ইত্যাদি; কারণ, এসবের ভিতর দিয়ে ছাত্ররা নিজেদের কাজের জিনিস শিখতে পারবে, আর তাদের বুদ্ধিও জাগ্রত থাকবে।

প্লেটোর শিষ্য হতে হলে বয়স্কদের যথেষ্ট জ্যামিতিক জ্ঞান থাকার শর্ত ছিল। তাঁর একাডেমীর দরজায় লেখা ছিল 'জ্যামিতির জ্ঞান যার নেই, সে যেন আমার দরজার ভিতরে ঢোকে না।' পিথাগোরিয়ানদের চেয়েও দৃঢ়ভাবে তিনি এই মত পোষণ করতেন

যে, তর্কশাস্ত্রের সন্দেহমুক্ত যুক্তি অবলম্বন করেই জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করতে হবে। জ্যামিতিক অঙ্কনে তিনি কেবল রুলার ও কম্পাস (অর্থাৎ সরল রেখা ও বৃত্ত) ব্যবহার করবার (সম্ভবতঃ) পূর্ব প্রতিষ্ঠিত নিয়মের উপর সমধিক জোর দিয়েছিলেন; ফলে, শত শত বছর ধরে মানুষ শুধু স্কেল-কম্পাস দিয়ে যে-কোনও নির্দিষ্ট কোণকে সমত্রিখণ্ড করবার নিষ্ফল চেষ্টা করেছে। এইভাবে একটি বৃত্তের সমান ক্ষেত্রফলওয়ালা বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করতে এবং একটি ঘনক্ষেত্র বা কিউবের দ্বিগুণ ঘন-আয়তন বিশিষ্ট আর একটি কিউবের বাহুর দৈর্ঘ্য অঙ্কন করতেও চেষ্টা করেছে; কিন্তু শুধু স্কেল-কম্পাস দিয়ে যে এই তিনটের কোনটাই অঙ্কন করা যায় না, আগে তা জানা ছিল না; কিন্তু এইসব ব্যর্থ চেষ্টাও অসার্থক হয়নি; কারণ এর ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক প্রক্রিয়া ও সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

ইউক্লিড (খ্রীস্ট-পূর্ব ৩০০) : খ্রীস্ট-পূর্ব ৩০০ সালের কাছাকাছি সময়ে এমন একজন গণিতজ্ঞের আবির্ভাব হয়, যাঁকে নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় গণিত পুস্তকের প্রণেতা বলা যায়। তিনি স্বনামখ্যাত ইউক্লিড এবং তাঁর পুস্তকের নাম Elements বা মৌলিকতত্ত্ব। দুই হাজার বছরেরও অধিককাল এই জ্যামিতির বই ইউরোপের সর্বত্র পঠিত হয়ে এসেছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে পর্যন্ত এ পুস্তক কেবল 'ইউক্লিড' নামেই পরিচিত ছিল।

ইউক্লিড কখন কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে তথ্য আমাদের জানা নেই। আমরা কেবল এইটুকু জানি যে মিসরের রাজা টলেমির রাজত্বকালে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার রাজকীয় স্কুলে অঙ্কের মাস্টার ছিলেন। অবশ্য এই টলেমি বিজ্ঞান-জগতের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ক্লডিয়াস্ টলেমি নন— ইনি ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়া নগরের প্রতিষ্ঠাতা মহান আলেকজান্ডারের একজন প্রধান সেনাপতি এবং মিশরে টলেমি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট টলেমির সোতের্। যা হোক, ইউক্লিডকে পৃথিবীর অগ্রগণ্য গণিতজ্ঞদের একজন বলা না গেলেও, তিনি যে অশেষ ধৈর্য সহকারে তৎকালীন সমুদয় জ্যামিতিক জ্ঞানসম্পদ সংগ্রহ করে সেগুলো যথাযথ ক্রমানুসারে সাজিয়েছিলেন, প্রমাণগুলো আবশ্যক মতো সংশোধিত করেছিলেন এবং তার সঙ্গে নিজের আবিষ্কৃত কিছু প্রতিজ্ঞাও যোগ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এর ফলে কতকগুলো বিচ্ছিন্ন পরস্পর- সম্বন্ধহীন তথ্যের স্থলে গড়ে উঠল একটা সুসংহত ক্রম-বিকশিত জ্যামিতির সুস্পষ্ট চিত্র। এই কারণেই তাঁর বইয়ের এমন অসাধারণ প্রচলন হয়েছিল।

তাঁর এই উচ্চাঙ্গের জ্যামিতি পুস্তক তের খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। এর প্রথম ছয়খানা অন্ততঃপক্ষে দুই হাজার বছর পর্যন্ত ছাত্রদের প্রাথমিক জ্যামিতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। ইউক্লিডের সমুদয় প্রমাণই কতকগুলো স্বীকৃত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর কোনও কোনও স্বীকৃতি যদি অগ্রাহ্য করা হয়, তাহলে অন্য কতকগুলো সামঞ্জস্যময় স্বীকৃতি মেনে নিয়ে পৃথক জ্যামিতি গঠন করা যেতে পারে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে দুইজন বিশিষ্ট গণিতবিদ লোবাচেভস্কি ও রীমান্ অন-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির প্রবর্তন করেছেন। এগুলো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বেশ উপযোগী; কিন্তু পার্থিব ব্যাপারের গণন ও মাপনে ইউক্লিডের জ্যামিতি অতুলনীয়।

ইউক্লিডের 'এলিমেন্টস' বা মূল-সূত্রগুলো কেমন করে মধ্যযুগের ইউরোপের করায়ত্ত হল সে বৃত্তান্ত এই : খ্রীস্টীয় ৭৫০ থেকে ৮০০ সালের মধ্যে আব্বাসীয় খলিফাদের হাতে মূল গ্রিক ভাষায় লেখা একখণ্ড এলিমেন্টস এসে পড়ে। বইখানা পাওয়া গিয়েছিল আলেকজান্দ্রিয়া থেকে— রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর এই শহরটি বর্বরদের ধ্বংস-লীলার কবলে পড়ে নাই। এর কয়েকখানা আরবি অনুবাদ করা হয়েছিল। তার মধ্যে একখানা লেখা হয়েছিল স্বনামধন্য খলিফা হারুন-অর-রশিদের রাজত্বকালে। ১১২০ খ্রীস্টাব্দে য়্যাথেলহার্ড (Athelhard) বা য়্যাডেলার্ড (Adelard) নামক একজন ইংরেজ আরবি থেকে লাটিন ভাষায় এর অনুবাদ করেন। তারপর আরও কয়েকখানা লাটিন অনুবাদ করা হয়। এর একখানা মুদ্রিত হয় ১৪৮২ খ্রীস্টাব্দে ভেনিস থেকে। গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রিত গণিত পুস্তকের মধ্যে এইখানাই প্রথম। এর মুদ্রণ ছিল পরিপাটি আর চওড়া 'হাশিয়া'য় সুন্দর সুন্দর চিত্র আঁকা ছিল। ইউক্লিডের প্রথম ইংরেজি অনুবাদ হয় ১৫৭০ খ্রীস্টাব্দে; অর্থাৎ শেক্সপিয়র যখন ছয় বছরের বালক সেই সময়ে। এতে মূলের সঙ্গে ব্যাখ্যাও ছিল; এর আয়তন ছিল ৯২৮ পৃষ্ঠা। এই প্রথম ইংরেজি অনুবাদের পর থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ইউক্লিডের জ্যামিতির বইয়ের যেমন কাটতি হয়েছে, তার সঙ্গে বোধহয় একমাত্র বাইবেল ছাড়া অন্য কোনও বইয়ের জনপ্রিয়তার তুলনা হয় না। ইউক্লিডকে অনেক সময় 'মেগারার দার্শনিক' বলে অভিহিত করা হয়; কিন্তু এটা ভুল ধারণা। মধ্যযুগে, এমনকি রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালেও অনেক সময় এটা ভুল করা হত। মেগারার দার্শনিকের নামও ছিল ইউক্লিড, তাঁর জন্মস্থান গ্রিসের আটিকা ও করিন্থের মধ্যবর্তী যোজকের একটি ক্ষুদ্র শহরে। জ্যামিতিক ইউক্লিডের জন্মস্থান জানা না গেলেও, তিনি যে মেগারার ইউক্লিড নন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এলিমেন্টস-এর ইতিহাস বলতে বলতে আমরা বর্তমান যুগ পর্যন্ত এসে পড়েছি। এখন আবার প্রাচীন গ্রীসে ফিরে যাওয়া যাক। যিশুখ্রীস্টের জন্মের পূর্বেই গ্রিক গণিতবিদ্‌রা গোলকের উপর অঙ্কিত বৃত্ত ও ত্রিভুজের বিষয় অবগত ছিলেন। অবশ্য প্রাচীন পিথাগোরিয়ান যুগেই যখন পণ্ডিতেরা পৃথিবীকে বর্তুলাকার বলে জানতে পেরেছিলেন, তখন গোলক সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেই প্রাচীন যুগেই পৃথিবী কত বড় সে সম্বন্ধে গবেষণা শুরু হয়েছিল। নিঃসন্দেহে জানা গিয়েছে যে খ্রীস্ট-পূর্ব আনুমানিক ৩৪০ সালে, যখন দার্শনিক আরস্তু (Aristotle) জীবিত ছিলেন, সেই সময় অনেকেই পৃথিবীর বেড় বা পরিধি মাপবার চেষ্টা করেন। এঁদের মধ্যে ইউডক্সাস (Eudoxus)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইরাটোস্থিনিস : ইরাটোস্থিনিস খ্রীস্টপূর্ব ২৭৬ অব্দে উত্তর আফ্রিকার গ্রিক উপনিবেশ তথা সাইরিন (Cyrene) নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ আর্কিমিডিস খ্রীস্টপূর্ব ২৫০ সালের কিছু আগে বা পরে তাঁর 'Sand-reconer' নামক পুস্তকে লিখে গেছেন, কোনও কোনও লেখকের মতে পৃথিবীর পরিধি ত্রিশ-মিরিয়াড্ স্টেডিয়ন (Stadion)। গ্রিক মিরিয়াড বলতে দশ হাজার বুঝায়; কিন্তু দূরত্ব মাপবার জন্য একাধিক

স্টেডিয়নের প্রচলন ছিল, তবে জানা যায়, এক প্রকার স্টেডিয়ন বর্তমান মাইলের প্রায় দশমাংশের সমান। এর থেকে হিসাব করলে পৃথিবীর পরিধি দাঁড়ায় ত্রিশ হাজার মাইল। ১৯১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের হেফোর্ড (Hayford) পৃথিবীর ব্যাসার্ধ নির্ণয় করেছিলেন ৬৩৭৮ কিলোমিটার। এর থেকে হিসাব করলে পৃথিবীর পরিধি পাওয়া যায় ২৪৯০৭ মাইল। আমরা দেখতে পাই, খ্রীস্টপূর্ব আড়াইশো বছর আগেই আর একজন গ্রিক গণিতবিদ হিসাব করে দেখিয়েছিলেন, পৃথিবীর পরিধি ২৫০ হাজার স্টেডিয়ন বা ২৫ হাজার মাইল। কেমন করে সেই সুপ্রাচীন যুগেও এতটা নির্ভুল হিসাব করা গেল, তার বিবরণ এই : খ্রীস্ট-পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ লাইব্রেরী ছিল আলেকজান্দ্রিয়ায়। এটিও সেই মিসরীয় রাজা টলেমির কীর্তি, যাঁর প্রতিষ্ঠিত গণিত-স্কুলে (School of Mathematics) ইউক্লিড জ্যামিতি শিক্ষা দিতেন। উক্ত শতাব্দীর শেষার্ধে আর্কিমিডিসের এক বন্ধু ইরাটোস্থিনিস (Eratosthenes) ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ। লোকে তাঁকে (β) বলত; কারণ, তিনি জ্ঞানের সব শাখাতেই পারদর্শিতা অর্জন করলেও, কোনও একটিতেও সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে পারেননি। এ নামকরণ দ্বারা অবশ্য তাঁকে অন্যায়ভাবে খাটো করা হয়েছে। এই ইরাটোস্থিনিসই পৃথিবীর পরিধি হিসাব করে ২৫,০০০ মাইল পেয়েছিলেন। এই হিসাবে ভুল শতকরা অর্ধেকেরও কম। অবশ্য সে যুগে এর থেকে বেশী ভুল হলেও মনে হয়, এমন একজন উদ্ভাবনকারীর দরজা 'বিটা'র ঊর্ধ্বে হওয়াই উচিত ছিল। যাহোক, তাঁর নিয়মটি বেশ মজার। বছরে দুই বার সূর্য (Sol) পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের (Equator) থেকে সর্বাধিক দূরত্বে অবস্থান করে, সেই সময় মনে হয়, সূর্য যেন থেমে গিয়ে (Sti) আবার নিরক্ষবৃত্তের নিকটবর্তী হতে থাকে। এই পরিবর্তন মুহূর্তকে বাংলায় 'ক্রান্তি' এবং ইংরেজিতে Solstice (সূর্য-থমক) বলা হয়। শীতের থমক হয় খ্রীস্টমাসের তিনদিন আগে (২২শে ডিসেম্বর), আর গ্রীষ্মের থমক হয় অনুমান ২১শে জুন তারিখে। বাংলায় এগুলোকে বলে যথাক্রমে মকরক্রান্তি ও কর্কটক্রান্তি। ভূ-গোলকের উপর পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত মধ্যরেখা বা বিষুবরেখা একটি বৃহৎ বৃত্ত, একেই বলা হয় নিরক্ষবৃত্ত। এর উত্তরে ও দক্ষিণে প্রায় সাড়ে তেইশ ডিগ্রী দূরে সমান্তর বৃত্ত অঙ্কিত করলে, সেগুলো হবে ক্ষুদ্র বৃত্ত; তার দক্ষিণেরটি মকরক্রান্তি (Winter Solstice or Tropic of Capricorn) আর উত্তরেরটি কর্কটক্রান্তি (Summer Solstice or Tropic of Cancer)।

ইরাটোস্থিনিস কোনক্রমে (হয়ত তাঁর গ্রন্থাগারের কোনও প্রাচীন গ্রন্থ থেকে) জানতে পেরেছিলেন, কর্কট ক্রান্তিতে মিসরের সীয়েন (Syene) নগরে দুপুর বেলায় সূর্য ঠিক মাথার উপর আসে বলে খাড়াভাবে গাড়া কাঠির কোনও ছায়া পড়ে না। তিনি নিজে দ্বিপ্রহরে ঐ স্থানের একটা গভীর কূপের ভিতর লক্ষ্য করে দেখলেন যে তার তলার স্থির

Solstice–ক্রান্তি=অয়নান্ত বিন্দু=অয়ন সন্ধি।
Summer Solstice=কর্কট সংক্রান্তি।
Winter Solstice=মকর সংক্রান্তি।
Equator–বিষুব রেখা=নিরক্ষবৃত্ত।
Meridian=মধ্যরেখা।

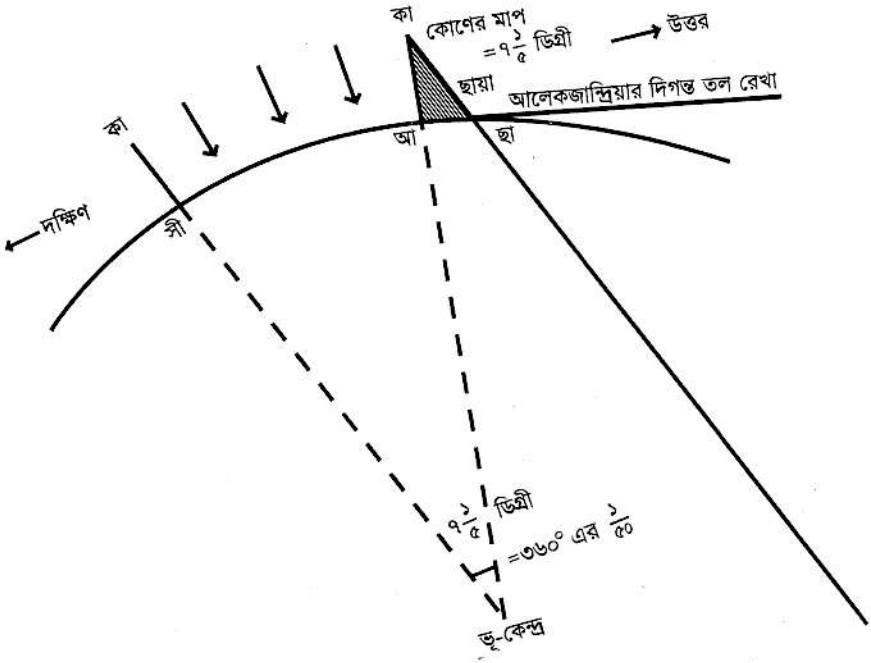

পানি থেকে সূর্যের কিরণ সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে, আর পানির উপর কূপের দেওয়ালের কোনও ছায়াপাত হয় না। ঠিক সেই মুহূর্তে কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ায় লম্বভাবে প্রোথিত কোনও যষ্টির একটি ক্ষুদ্র ছায়া দেখা যায়। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন সীয়েন আলেকজান্দ্রিয়ার ঠিক দক্ষিণে এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় যষ্টির ছায়াও ঠিক উত্তর-দক্ষিণে পড়ে। এর থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, সীয়েনের ছায়া-কাঠি, আলেকজান্দ্রিয়ার ছায়া-কাঠি, পৃথিবীর কেন্দ্র আর সূর্যের কেন্দ্র কর্কটক্রান্তির দুপুরবেলা একই সমতলে অবস্থিত থাকে। তিনি আরও জানতেন আলেকজান্দ্রিয়া থেকে সীয়েনের দূরত্ব ৫,০০০ স্টেডিয়ন বা পাঁচশো মাইল। এর থেকে তিনি উপরোক্ত চিত্রের মতো কোনও চিত্র অঙ্কন করে পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণের পরিধি নির্ণয় করলেন— এই দূরত্বের পঞ্চাশগুণ অর্থাৎ পঁচিশ হাজার মাইল। এই চিত্রে সীয়েন (সী), আলেকজান্দ্রিয়া (আ), সীয়েনের কাঠি (সী-কা) আলেকজান্দ্রিয়ার কাঠি (আ-কা), আলেকজান্দ্রিয়ার কাঠির ছায়া (আ-ছা) ও ভূ-কেন্দ্র দেখা যাচ্ছে। কাঠিগুলো ভূ-লম্ব অর্থাৎ ভূ-কেন্দ্রের থেকে কল্পিত ব্যাসার্ধের বর্ধিত অংশ, আর সূর্য বহুদূরে অবস্থিত থাকায় তার রশ্মিগুলো সমান্তর; অর্থাৎ সীয়েনের কাঠির সঙ্গে সমান্তর। আলেকজান্দ্রিয়ার কাঠি আর ছায়া-প্রান্তের ভিতর দিয়ে আ-ছা-কা ত্রিভুজের কা-কোণটি ভূ-কেন্দ্রস্থ কোণ (সী-ভূ-আ) পরস্পর সমান। কা-কোণটি মেপে দেখা গেল $৭\frac{১}{৫}^{\circ}$ ডিগ্রী, অর্থাৎ ৩৬০° ডিগ্রীর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। এর থেকে ইরাটোস্থিনিস সিদ্ধান্ত করলেন সীয়েন থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার দূরত্বও পৃথিবীর পরিধির পঞ্চাশ ভাগের

এক ভাগ। অতএব, পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণের পরিধি পাঁচশো মাইলের পঞ্চাশগুণ বা ২৫,০০০ মাইল। [চিত্রে কাঠি ও সী-আ (চাপ), স্পষ্টতার জন্য অতিশয় লম্বিত করে দেখান হয়েছে।]

যাঁরা গণিতের বুনিয়াদ রচনা করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে থেকে এখানে আমরা আর মাত্র দুই জনের নাম উল্লেখ করব। এঁদের একজন হচ্ছেন এপোলোনিয়াস (Apollonius) আর একজন যুগস্রষ্টা আর্কিমিডিস (Archemedes)।

এপোলোনিয়াস : এপোলোনিয়াস ইউক্লিডের Elements রচনার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে পের্গা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কথা বিশেষ কিছু জানা যায়নি। আমরা শুধু এইটুকু জানি যে আলেকজান্দ্রিয়ার যে স্কুলে ইউক্লিড শিক্ষা দিতেন, সেই স্কুলেই তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। মনে হয় ইউক্লিডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তিনি 'কনিক সেকশন' সম্বন্ধে সেকালে যত কিছু জানা ছিল, সে সমুদয় সংগ্রহ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করবার কাজে লেগে যান। কারণ এই বিষয়েই তাঁর সবিশেষ অনুরাগ ছিল; আর প্রাথমিক জ্যামিতিতে ইউক্লিডের যে পরিমাণ নিজস্ব দান আছে, 'কনিক-সেকশন' বিদ্যায় এপোলোনিয়াসের নিজস্ব দান তার চেয়ে ঢের বেশী। প্রায় একশো বছর আগে (খ্রীস্ট-পূর্ব ৩৫০ সালের দিকে) মেনায়েকমাস নামক একজন গাণিতিক যে নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন, তার চেয়ে এপোলোনিয়াসের উদ্ভাবিত কনিক-সেকশন বিষয়ক নতুন প্রণালী এত উন্নত ছিল যে তাঁর এই পদ্ধতি পরবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দী যাবৎ চালু ছিল। নিয়মটি এখনও সম্পূর্ণ বর্জিত হয়নি, তবে ১৬৩৭ খ্রীস্টাব্দে ফরাসি গণিতশাস্ত্রবিদ ডেকার্টের প্রবর্তিত Co-ordinate Geometry বা 'অক্ষ জ্যামিতি'র বীজগণিতের সাহায্যে কনিক-সেকশন-বিদ্যা আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে পড়েছে, তবু এপোলোনিয়াস প্যারাবোলা, ইলিপ্স ও হাইপারবোলার যে মৌলিক সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেগুলো এখনও বদলান যায়নি, বরং সেইসবের উপরেই ডেকার্টের নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে। পরের পৃষ্ঠার চিত্র দ্বারা কৌণিক ঘন-স্থল (Solid figure) এবং তার ছেদক দেখানো যাচ্ছে।

আর্কিমিডিস : এবার আমরা প্রাচীনকালের, এমনকি কারো কারো মতে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞের কথা বলব। ভূমধ্যসাগরের সিসিলী দ্বীপে সাইরাকিউস নামে একটি শহর এখনও আছে। খ্রীস্ট-পূর্ব সাতশো অব্দে করিন্থ থেকে গ্রিকেরা এসে এখানে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। এখানে খ্রীস্টপূর্ব ২৮৭ সালে আর্কিমিডিসের জন্ম হয়। তাঁর পিতাও একজন গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি সাইরাকিউসের শাসনকর্তা হিয়েরো (Hiero)-র আত্মীয় ছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় আর্কিমিডিস মিসরে গিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার রাজকীয় স্কুলে শিক্ষালাভ করেন, যেখানে ইতিপূর্বে ইউক্লিড অঙ্কশাস্ত্রে অধ্যাপনা করতেন। শিক্ষা শেষ করে আর্কিমিডিস সাইরাকিউসে ফিরে এসে অতিশয় দক্ষতার সাথে গণিত, পদার্থবিদ্যা এবং ফলিত গণিতের জ্ঞানভাণ্ডার অজস্র দানসম্ভারে পূর্ণ করলেন। বাস্তবিক পক্ষে তাঁর পরে আঠারশো বছরের মধ্যে গণিত-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আর কোনও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। সপ্তদশ শতাব্দীতে আলজাব্রার সঙ্কেত আর অক্ষ-জ্যামিতি

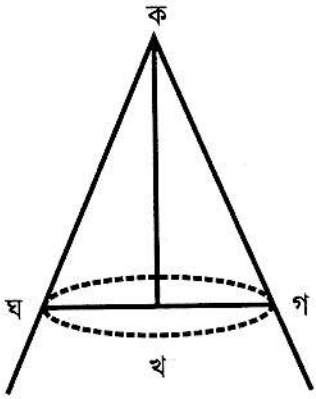

[বৃত্ত ছেদ]

একটি সমকোণী ত্রিভুজ (কখগ) সমকোণের সন্নিহিত যেকোনও বাহু (কখ) স্থির রেখে ত্রিভুজটা ঘুরালে যে ঘন স্থল (Volume) বেষ্টিত হয় তার নাম (সমকৌণিক) কোণক। খগ বাহুর ঘূর্ণনে যে সমতলক্ষেত্র উৎপন্ন হয় তার নাম 'বৃত্ত' অর্থাৎ কোণককে তার ঘূর্ণনাক্ষ (কখ)-এর সঙ্গে সমকোণ করে একটি সমতল ছেদ করলে সেই তল কোণককে একটি বৃত্তে ছেদ করবে।

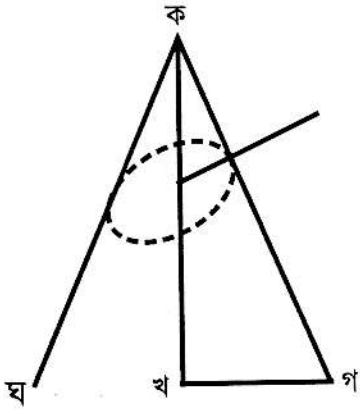

[অনুবৃত্ত ছেদ]

কোণকটিকে একটু তেরছাভাবে সমতল ছেদ করলে, যদি ঐ ছেদ কঘ ও কগ-কে ছেদ করে তবে সে ছেদ হবে অণ্ডাকৃতি অনুবৃত্ত ছেদ বা বৃত্তাভাস (Ellipse)।

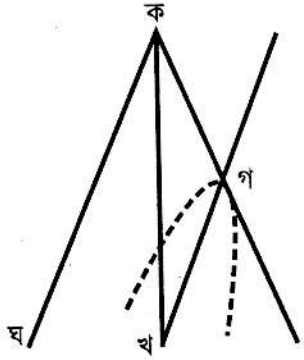

[পরাবৃত্ত ছেদ]

কোণকটিকে আরও একটু তেরছাভাবে সমতল ছেদ করলে, যদি এই ছেদ (কঘ)-কে ছেদ না করে, তবে সে ছেদ হবে পরাবৃত্ত ছেদ (Parabola)।

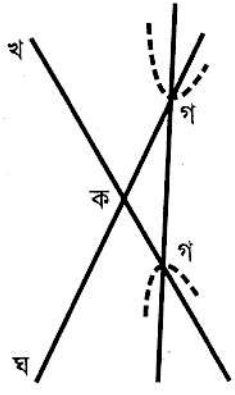

[অতিপরাবৃত্ত ছেদ]

কোণকটিকে আরও একটু তেরছাভাবে সমতল ছেদ করলে, যদি ঐ ছেদ বর্ধিত কোণকটিতে আবার 'গ' বিন্দুতে ছেদ করে, তবে দুটো বিচ্ছিন্ন ছেদ উৎপন্ন হবে। এই ছেদের নাম অতিপরাবৃত্ত ছেদ (Hyperbola); বিচ্ছিন্ন অংশ দুটো অতিপরাবৃত্তের দুটো শাখা।

উদ্ভাবনের ফলে আধুনিক গণিত-বিজ্ঞানে আবার নতুন উন্নতির সূত্রপাত হয়। সুতরাং আর্কিমিডিস গণিতশাস্ত্রকে কি অবস্থায় পেয়েছিলেন, আর কি অবস্থায় রেখে গিয়েছিলেন, তার তুলনা করলে তাঁকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিশারদ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বৈজ্ঞানিক হিসাবে আর্কিমিডিস তরল পদার্থের চাপ-বিজ্ঞান (Hydrostatics) গড়ে তুলেছেন; তিনি দণ্ড-যন্ত্র (Lever)-এর নিয়ম আবিষ্কার করেন, পানি পাম্প করে উপরে তোলার যন্ত্র এবং আরও অনেক প্রকার ব্যবহারিক কল-কৌশল আবিষ্কার করেন। কথিত আছে, একসময় সাইরাকিউসের রাজা দ্বিতীয় হিয়েরো (Hiero)-র একখানা বৃহৎ জাহাজের খোল জলপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি আর্কিমিডিসকে এর একটা বিহিত করতে অনুরোধ করেন। আর্কিমিডিস অবিলম্বে একটি যন্ত্র নির্মাণ করেন। দুই মুখ খোলা একটা লম্বা নলের মধ্যে কাক-খোলা স্ক্রুপের মতো পেঁচানো লোহা স্থাপন করে, নলটার নীচের মুখ কাত করে পানির মধ্যে ডুবিয়ে রেখে একটা হাতল দিয়ে স্ক্রুপ ঘুরিয়ে নলের উপর মুখ দিয়ে পানি বের করে দেবার ব্যবস্থা বাতলিয়ে দিলেন। আর্কিমিডিস ভারি বস্তু স্থানান্তরণের জন্য দণ্ড-যন্ত্র (Lever), দণ্ড-চক্র (Cog-wheel) এবং কপিকল (Pulley)-র ব্যবহার প্রবর্তন করেন। তিনি এইসব উপায়ে ডকের শুকনো ডাঙা থেকে একটা জাহাজ পানিতে নামিয়েছিলেন। প্রবাদ আছে, তিনি হিয়েরোকে বলেছিলেন, 'আমাকে পৃথিবীর বাইরে দাঁড়াবার একটু স্থান দাও, আর লম্বা একটা ডাণ্ডা (দণ্ড) দাও, তাহলে আমি পৃথিবীকে কক্ষচ্যুত করতে পারব।' ঐতিহাসিক প্লুটার্ক বলেছেন : একথা শুনে হিয়েরো বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে আর্কিমিডিসকে বললেন, 'আচ্ছা, তা'হলে ক্ষুদ্র বল দিয়ে কোনও বৃহৎ ভারী বস্তু সরিয়ে দেখাও দেখি।' তখন আর্কিমিডিস হিয়েরোর অস্ত্র-শালায় রক্ষিত একখানা তিন মাস্তুলওয়ালা মালবাহী জাহাজ দেখিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, এই জাহাজখানা তো বহু লোকে বহু পরিশ্রমে এখানে এনে রেখেছে, এখন এতে মাল বোঝাই করা হোক, আর বহু লোক চড়ুক, আমি এ জাহাজ মাটির উপর দিয়েই চালাব।' হিয়েরোর হুকুমে তাই করা হল। আর্কিমিডিস জাহাজের গায়ে অনেকগুলো কপিকল (Compound pulley) সংযুক্ত করে দূরে বসে কপিকলের দড়ি ধরে টানতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে জাহাজখানিও ধীরে ধীরে নিরাপদে চলতে শুরু করল, মনে হল, যেন স্থির নদী বা সমুদ্রের উপর দিয়েই চলছে।

আর্কিমিডিস দূর-পাল্লা ও নিকট-পাল্লায় ব্যবহার উপযোগ্য Catapult (প্রস্তর ক্ষেপণযন্ত্র বা ফিঙ্গা) উদ্ভাবন করেন। তিনি সাইরাকিউসের দেওয়ালের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে রকেট বর্ষণের যন্ত্রও উদ্ভাবন করেন, আর দেওয়ালের গায়ে লোহার ঠোঁটওয়ালা একরকম লম্বা লম্বা কাঠের খাম্বা স্থাপন করবার ব্যবস্থা করেন, এগুলো ইচ্ছামত লাগানো যেত, আবার সরিয়ে নেওয়াও যেত। সাইরাকিউস বন্দরের দেওয়ালের কাছে কোনও শত্রু-জাহাজ আসলেই এই লম্বা লম্বা ভারী খাম্বা বা ডাণ্ডা কলের সাহায্যে ভীষণ বেগে ঊর্ধ্বে উঠে জাহাজের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে পারত। আর্কিমিডিসের জীবনের শেষভাগে রোমানরা এ-সব দেখলেই আর্কিমিডিস এখনই ইঞ্জিন দিয়ে ঐসব ডাণ্ডা চালিয়ে দেবে, এই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করত।

আর্কিমিডিস নিজে কিন্তু এসব যন্ত্রপাতির বিশেষ বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব দিতেন না। তিনি বলতেন, ওগুলো ত শুধু জ্যামিতির খেলা। প্লুটার্ক বলেছেন : এ-সব কলা-কৌশলের জন্য তাঁর অলৌকিক খ্যাতির প্রশংসা ছড়িয়ে পড়েছিল দিগ্বিদিকে, তবু তিনি এ-সব বিষয়ে কোনও পুস্তক লিখে রেখে যাওয়ার কথা কখনও ভাবেননি।

আর্কিমিডিস আজ জীবিত থাকলে নিশ্চয়ই তিনি সেইসব বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞের অগ্রভাগে থাকতেন, যাঁরা মানব-সভ্যতা ধ্বংসের কাজে বিজ্ঞানের ব্যবহার (বা অপব্যবহার) যাতে না করা হয় তার জন্য চেষ্টা করেছেন।

আজকাল উচ্চ বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রই জানে, একসময় রাজা হিয়েরোর অনুরোধে একটি সমস্যার সমাধান চিন্তা করতে করতে আর্কিমিডিস তরল পদার্থের ঊর্ধ্বচাপ সম্বন্ধে একটি মূল বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করেন। রাজা একটি মুকুট তৈয়ার করবার জন্য স্বর্ণকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা দিয়েছিলেন। মুকুট তৈরি হবার পর রাজার সন্দেহ হল এর সঙ্গে কিছু রূপো তো মিশিয়ে দেয়নি?

একজন রোমান ভাস্কর ভিট্রুভিয়াস (Vitruvius) লিখেছেন : 'গোসল করবার বৃহৎ টবের মধ্যে সামান্য গরম পানিতে অর্ধ-ভাসন্ত অবস্থায় রাজার মুকুট-সমস্যার কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আর্কিমিডিসের খেয়াল হল শরীরটা ত বেশ হাল্কা বোধ হচ্ছে, অর্থাৎ ওজন যেন ঢের কমে গিয়েছে। এর থেকে তাঁর মাথায় আসলো তরল পদার্থের ঊর্ধ্বচাপের কথা : কোনও কঠিন পদার্থ কোনও সম্পূর্ণ ভরা পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে ঐ পদার্থের সম-আয়তন পানি উপচে পড়ে, আর সেই পানির যা ওজন, ডুবন্ত বা ভাসন্ত পদার্থটি সেই পরিমাণ ঊর্ধ্বচাপ বা ঠেলা খায়। মুহূর্তের মধ্যে আর্কিমিডিসের মনে স্বর্ণ-মুকুটের বিশুদ্ধতা যাচাই করবার সমুদয় প্রক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনি তৎক্ষণাৎ টব থেকে উঠে সাইরাকিউসের রাজপথ দিয়ে 'সমাধান পেয়েছি, সমাধান পেয়েছি' (ইউরেকা! ইউরেকা!) রব করতে করতে হিয়েরোর রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়ে তাঁকে খবর দিতে গেলেন। পরনে যে কাপড় নেই, এ খেয়াল পর্যন্ত তাঁর হয়নি। স্বর্ণকার দোষী কি নির্দোষ, ইতিহাস সে সম্বন্ধে নীরব; কিন্তু এই ব্যাপারে সেই অনামা সোনারু আর্কিমিডিসের নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলো।'

এই ঘটনা থেকে মনে হয় আর্কিমিডিস আদত প্রফেসারের মতোই বটে। চিন্তাশীল অধ্যাপক বা দার্শনিকদের সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা এই যে, তাঁরা অনেক সময়ই চিন্তায় মগ্ন হয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় থাকেন। আমরা ত দেখলাম, আর্কিমিডিস তেমন অবস্থায় পোশাক-পরিচ্ছদের থোড়াই কেয়ার করতেন; তাছাড়া, জনশ্রুতি এই যে বিজ্ঞান-সমস্যায় মগ্ন হয়ে অনেক সময় আহারের কথাও ভুলে যেতেন। তাঁকে দেখা যেত উনুনের ছাই বিছান মেঝের উপর আঙ্গুল দিয়ে জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কন করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে ভাবতে থাকতেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে পরিমাণ সার্থকতা লাভ করতে পেরেছেন, তেমনটি আর কে পেরেছে?

সচরাচর আর্কিমিডিসকে তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি, বল-বিজ্ঞান এবং তরল পদার্থের ঊর্ধ্বচাপ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট করা হলেও, তাঁর শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে বিশুদ্ধ গণিতের ক্ষেত্রে। এদিকে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার জুড়ি নেই।

আর্কিমিডিস গ্রিক বর্ণমালার ব্যবহার করে সংখ্যা লিখনের এক উন্নততর প্রণালী আবিষ্কার করেন, যদিও 'শূন্য' ব্যবহার করে বৃহৎ সংখ্যা প্রকাশ করবার কল্পনা তিনি করেননি, বৃত্তের ব্যাসকে একক ধরলে তার পরিধি কত একক, তা হিসাব করে তিনি দেখেছিলেন সেই সংখ্যা, π, $৩\frac{১০}{৭১}$ থেকে বড়; কিন্তু $৩\frac{১০}{৭০}$ থেকে ছোট। তাঁর কাছে এই সংখ্যা নির্ণয়ের যে গাণিতিক উপকরণ ছিল, তা বিবেচনা করলে এই পরিমাপ-সীমা নিশ্চয়ই বিস্ময়কর। দুই দশমিক পর্যন্ত এই হিসাব নির্ভুল হয়েছে এবং ভুলের পরিমাণ হাজারের মধ্যে অর্ধেকেরও কম। এই π-এর মান নির্ণয় করবার জন্য তাঁকে শুধু জ্যামিতি ও পাটীগণিতের সাহায্যে বর্গমূল আকর্ষণের [নির্ণয়ের] এক নিয়ম আবিষ্কার করতে হয়েছিল। সে যাহোক, তিনি যে নিয়মে π-এর মান নির্ণয় করেছিলেন তাকে বলা হয় Process of exhaustion; অর্থাৎ 'ভুলের ক্ষয়ণ' প্রণালী। তার দুই শতাব্দী আগে এন্টিফন (Antiphon) নামক একজন সফিস্ট তার্কিক ও গণিতজ্ঞ বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করবার জন্য প্রথমে বৃত্তের মধ্যে একটি অনুলিখিত বর্গক্ষেত্র, তারপর বারংবার বাহু সংখ্যা বৃদ্ধি করে করে সম-অষ্টভুজ, সম-ষোড়শভুজ ইত্যাদি ক্রমে বহুভুজ অঙ্কন করে ক্রমশঃ বৃত্তের ক্ষেত্রফলের চেয়ে এই সকল সমবাহুভুজের ক্ষেত্রফলের ঘাটতি ক্ষয় করতে করতে বৃত্তের কালি নির্ণয় করবার প্রক্রিয়া প্রস্তাব করেন।

আর্কিমিডিস 'বৃত্তের পরিমাপ' নামক একটি পুস্তিকায় বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের নিম্নোক্ত সূত্র প্রমাণ করেন:

> বৃত্তের কালি=একটি সমকোণী ত্রিভুজের কালি, যার সমকোণের সন্নিহিত এক বাহু বৃত্তের পরিধির সমান এবং অপর বাহু বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান।

আর্কিমিডিস ঐ পুস্তিকার জন্য একটি উপপাদ্যের সাহায্যে π-এর মান সাধন করলেন এইভাবে :

বৃত্তের কালি অন্তর্লিখিত সমবহুভুজের চেয়ে বড়, আর বহির্লিখিত সমবহুভুজের চেয়ে ছোট। আর্কিমিডিস ছিয়ানব্বই বাহুওয়ালা দুইটি সমবহুভুজের কালি হিসাব করে কিংবা মেপে দেখে উপরোক্ত π-এর বা ব্যাসের তুলনায় পরিধির দৈর্ঘ্যের ঊর্ধ্বসীমা ও নিম্নসীমা (যথাক্রমে $৩\frac{১}{৭}$ ও $৩\frac{১০}{৭১}$, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে) নির্ণয় করেছিলেন। বাহু সংখ্যা যতই বাড়ানো যায়, এই দুইটি সীমা ততই ক্রমশঃ নিকটবর্তী হতে থাকে। এর থেকে নির্ণেয় অনুপাতের বিচ্যুতির পরিমাণ পাওয়া যায়।

এছাড়া আর্কিমিডিস বৃত্তাভাসের কালি ও পরিবৃত্তের যে-কোনও ছেদক দ্বারা বিচ্ছিন্ন অংশের কালি নির্ণয় করেছিলেন; আর ঘূর্ণক রেখা বা Spiral-এর যে-কোনও বিন্দুতে কেমন করে স্পর্শক অঙ্কন করতে হয়, তাও তিনি প্রদর্শন করেছিলেন। আলজাব্রার প্রতীক ব্যবহার সে-সময় জানা থাকলে তিনি নিঃসন্দেহে Differential calculus বা অপেক্ষকের ক্রম-বিয়োজন শাস্ত্র আবিষ্কার করতে পারতেন; কারণ যে প্রণালীতে তিনি পরাবৃত্তের

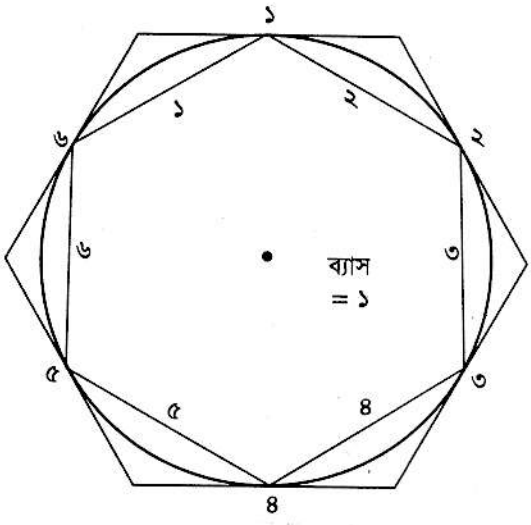

ষড়ভুজ

(বৃত্তের অন্তর্লিখিত ও বহির্লিখিত)

বিচ্ছিন্নাংশ নির্ণয় করেছিলেন, ঠিক সেই প্রণালীতেই সপ্তদশ শতাব্দীতে Integral calculus বা ক্রম-যোজন শাস্ত্রের বিকাশ হয়েছিল।

তিনি অনেক পুস্তক রচনা করেছিলেন, তার একখানায় বৃত্ত, সমগোল স্তম্ভক (Cylinder) এবং কোণক (Cone) সম্বন্ধে আলোচনা ছিল। মনে হয়, একেই তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে মনে করতেন; কারণ মৃত্যুর পূর্বেই অভিলাষ প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর কবরের উপরিভাগে যেন গোলক আর সমগোল স্তম্ভক দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

খ্রীস্ট-পূর্ব ২১২ সালে সাইরাকিউস নগরে রোমান আর গ্রীকদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলাকালে একদিন পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ আর্কিমিডিস নিজের ঘরে বসে ধূলির উপর দাগ কেটে কোনও গাণিতিক বিষয়ে চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তখন হঠাৎ এক রোমান যোদ্ধা ঘরে ঢুকতেই আর্কিমিডিস চেঁচিয়ে বলে উঠলেন : খবরদার! আমার চিত্র মাড়িয়ো না; কিন্তু 'জোর যার মুল্লুক তার' — মন্ত্রের সাধকদের কাছে যা আশা করা যায়, ফল তাই হল, আর্কিমিডিসকে নির্মমভাবে হত্যা করা হল। আলফ্রেড হোয়াইট্‌হেড (Whitehead) লিখেছেন :

> রোমান সৈন্যের হাতে আর্কিমিডিসের নিধন পৃথিবীর ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন।... কোনও রোমকই গণিতশাস্ত্রের চিন্তনকালে এভাবে নিহত হয়নি।

অতীত যুগের এবং খুব সম্ভব সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদের জীবনাবসান এইভাবেই হল। আর্কিমিডিসের মৃত্যুতে গ্রিক গণিতের স্বর্ণযুগের আকস্মিক অবসান ঘটলো। তারপর সুদীর্ঘ ১৮০০ বছর পরে অর্থাৎ খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আবার আর্কিমিডিসের প্রজ্বলিত জ্ঞানবর্তিকা জ্বলে উঠেছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আলজাব্রার গোড়ার কথা

বর্তমানে আলজাব্রার প্রতীক-পদ্ধতি স্কুলের ছাত্রদের কাছে পর্যন্ত এত বেশী পরিচিত হয়ে পড়েছে যে এর অন্তর্নিহিত চিন্তাধারা অতীতে কেন যে এত শ্লথ-গতিতে বিকাশ লাভ করেছে, তা ভাবতেও এখন আশ্চর্য লাগে। আহমিজ প্যাপিরাস থেকে একটি উদাহরণ দেয়া যাচ্ছে : একটি সংখ্যা আছে, তার সমস্তটার সঙ্গে এক-সপ্তমাংশ যোগ দিলে ঊনিশ হয়। সংখ্যাটা কত? খ্রীস্টপূর্ব ২২০০ সালের পুরানো প্যাপিরাস থেকে আহমিজ এই সমস্যা নকল করেছিলেন। অতএব দেখা যাচ্ছে সমস্যাটা চার হাজার বছরেরও আগে মানুষের চিন্তাকে আলোড়িত করেছিল। বর্তমানে আমরা অজ্ঞাত সংখ্যাকে x সংকেত দিয়ে নির্দেশিত করে থাকি। সুতরাং আমরা সমস্যাটা চট করে সমীকরণের আকারে লিখে ফেলি :

$$x+\frac{1}{7}x=19; \quad \text{বা} \quad 7x+x=19\times 7; \quad \text{বা} \quad 8x=133;$$
$$\therefore x=133\div 8=16\frac{5}{8}$$

কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত প্রণালীর উদ্ভব হয়েছিল তিনটে বিভিন্ন পর্যায়ে :

(১) প্রথম পর্যায়ে প্রাচীন মিসরীয়দের মনে এই জাতীয় প্রশ্ন এমন সব বস্তু-নিরপেক্ষ সংখ্যাবিজ্ঞানের অংশ হিসাবে উত্থিত হয়েছিল যা কেবল বিশিষ্ট চিন্তাশীলদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তাঁদের মধ্যে এই ধরনের প্রশ্ন ও উত্তরের পাল্লা চলত। এগুলো ছিল একরকম বুদ্ধির লড়াই। কয়েক হাজার বছর ধরে এই ধরনের প্রশ্নের জবাব গদ্য রচনা বা দার্শনিক তর্ক-যুক্তির মাধ্যমে দেওয়া হত। আমরাও ছেলেবেলায় শুভঙ্করীর 'অস্থিত পঞ্চক' অধ্যায়ে এই ধরনের প্রশ্ন দেখেছি।

যেমন :

আছিল দেউল এক বিচিত্র গঠন,
ক্রোধে জলে তুলে ফেলে পবননন্দন।
অর্ধেক পঙ্কেতে আর তেহাই সলিলে,
দশম ভাগের ভাগ শেওলার জলে।
উপরে এগার হাত দেখি বিদ্যমান,
করহ সুবোধ শিশু দেউল প্রমাণ।

'অস্থিত' বলতে বুঝায় যে অংশটা অঙ্কের বর্ণনায় স্থিত বা উক্ত হয়নি এবং যা নির্ণয় করতে হবে, বর্তমান আলজাব্রার x-এর মতো, মিসরীয়রা যাকে বলতেন 'হউ'। উপরের সমস্যাটিতে চারটা তথ্য দেওয়া আছে, পঞ্চমটা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, বোধ হয় এই কারণে এ ধরনের অঙ্কের নাম দেওয়া হয়েছে 'অস্থিত পঞ্চক'।

(২) খ্রীস্টীয় ২৭৫ সাল থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়কে দ্বিতীয় পর্যায় বলা যায়। এ সময় প্রশ্ন বা সমস্যাদি গদ্য রচনার আকারে প্রদত্ত হলেও, কতকগুলো শব্দের সংক্ষিপ্ত আকার ব্যবহৃত হত, যেমন word-এর স্থলে wds, etcetera স্থলে etc.; তাছাড়া বিয়োগ চিহ্নের এবং দু'-একটা অন্য চিহ্নের ব্যবহারও ধীরে ধীরে প্রচলিত হয়।

(৩) বর্তমানে আমরা তৃতীয় পর্যায়ে উপনীত হয়েছি। এখন আর পুরো বা সংক্ষিপ্ত শব্দাদি ব্যবহার করে প্রশ্নের সমাধান লেখা হয় না; শাব্দিক বর্ণনারই একরকম গাণিতিক সাঁটলিপি-সঙ্কেত ও চিহ্নাদির সাহায্যে যুক্তিপ্রমাণ লিখিত হয়। এগুলো আয়ত্ত হলে অল্প পরিসরে এমন সব ভাব ও যুক্তি প্রকাশ করা যায়, যা' কথায় প্রকাশ করতে হলে হয়ত কয়েক পৃষ্ঠা লেগে যেত। আলজাব্রার এই উৎকর্ষ মাত্র তিন-চারশো বছর যাবৎ আরম্ভ হয়েছে। গণিতের ভাবধারা ও যুক্তির সূচনা হয়েছে বহু সহস্র বছর পূর্বেই, তার তুলনায় আলজাব্রার প্রতীক বা চিহ্নের প্রচলনকে অত্যন্ত আধুনিক বলতে হয়।

দেখা যাচ্ছে, গ্রিক গণিতের স্বর্ণযুগ উপর্যুক্ত প্রথম স্তরটির মধ্যেই পড়ে। বর্তমানে আমরা যাকে প্রাথমিক আলজাব্রা বলি, আর নিতান্ত প্রাথমিক নয় এমন কোনও কোনও বিষয়ও— গ্রিক গণিতবিদেরা জ্যামিতির সাহায্যেই করে গেছেন। যেমন, ইউক্লিডের 'প্রাথমিক জ্যামিতি' সঙ্কলনের সময়েই অনুপাত-সমানুপাত এবং কতকগুলো বীজগাণিতিক সমীকরণের পরিপূর্ণ ধারণা জ্যামিতিক পদ্ধতিতেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় :

$a(b+c)=ab+ac$; $(a+b)^2=a^2+b^2+2ab$ প্রভৃতি সমীকরণ জ্যামিতির দ্বারা চাক্ষুষভাবে ও স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারা যায়। তাছাড়া, $x^2+ax=a^2$ এবং $x^2=ab$ এই জাতীয় দ্বিঘাত সমীকরণও জ্যামিতিক অঙ্কন দ্বারাই প্রথমে সাধিত হয়েছে, তবে সেকালে

সংখ্যার বদলে অঙ্কিত রেখা দ্বারাই এগুলোর সমাধান দেখান হত। Elements-এর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ খণ্ডে আজ যাকে আমরা সংখ্যা-প্রকরণ (Theory of numbers) বলি, তার আলোচনা রয়েছে; আর নবম খণ্ডে ক্রমিক ধারা ও চলিষ্ণু রাশিমালা (Series and progressions)-র জ্যামিতিক আলোচনা সম্বলিত হয়েছে। দশম খণ্ডে জ্যামিতিক নিয়মেই অমূলীয় (Irrational) সংখ্যার পরিমাণ রেখা দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এর থেকে দেখা যাচ্ছে, যেসব ধারণা আজকাল আলজাব্রার বিশেষ ক্ষেত্র বলে পরিগণিত, তার অনেকগুলোরই ভিত্তি রচিত হয়েছে সুদূর অতীতে জ্যামিতির মাধ্যমে।

ইউক্লিডের আবির্ভাবের বহুপূর্বে পিথাগোরিয়ানদের দ্বারাই সংখ্যা-প্রকরণের ভিত্তি নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে এই প্রকরণ নিতান্ত সহজবোধ্য নয়, তবু পিথাগোরিয়ানদের কয়েকটা সহজ এবং চিত্তাকর্ষী আবিষ্কার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা মন্দ নয়। তাঁরা ১, ৪, ৯, ১৬, ২৫ ... প্রভৃতি সংখ্যার নাম দিয়েছিলেন বর্গসংখ্যা। তাঁরা চিত্রের সাহায্যে স্পষ্টভাবে দেখিয়েছিলেন, এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য যথাক্রমে ৩, ৫, ৭, ৯... এইভাবে দুই করে বাড়তে বাড়তে যায়। এই পার্থক্যগুলো সবই বিজোড় সংখ্যা।

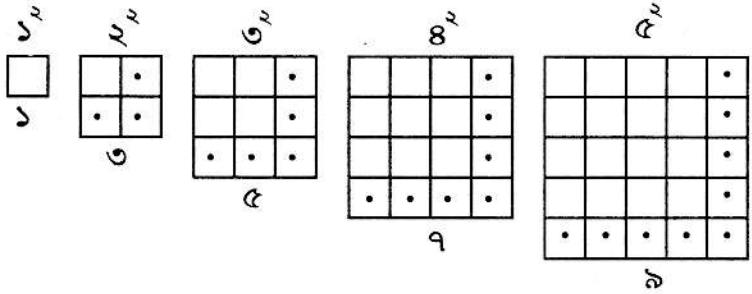

চিত্রে একটি বর্গের সঙ্গে পরবর্তী বর্গটির পার্থক্য (অর্থাৎ অতিরিক্ত বর্গক্ষেত্রগুলো) বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। এর থেকে দেখা যাচ্ছে :

১+৩=২²; (১+৩)+৫=৩²; (১+৩+৫)+৭=৪²;

(১+৩+৫+৭)+৯=৫² ইত্যাদি। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, (১+৩+৫+৭+৯+১১+ ... ... দুই শততম সংখ্যা পর্যন্ত) = ২০০² বা ৪০,০০০= চল্লিশ হাজার অর্থাৎ যেকোনও সংখ্যাকে n বলে অভিহিত করলে, বলা যায় যে ১ থেকে আরম্ভ করে n সংখ্যক বিজোড় সংখ্যা একত্রে যোগ করলে যোগফল হয় $n \times n$ বা n^2। আবার n সংখ্যক বিজোড় সংখ্যাটি হয় n-এর দ্বিগুণ থেকে এক কম, অর্থাৎ $2n-1$।

এইভাবে গবেষণা করতে করতে তাঁরা দেখিয়েছিলেন,

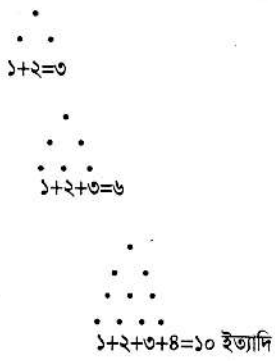

এইভাবে তাঁরা সূত্র নির্ণয় করেছিলেন, ১, ২, ৩ ... থেকে n পর্যন্ত সংখ্যার যোগফলকে S বলে নির্দেশ করলে, $S=\frac{n(n+1)}{2}$

= (প্রথম ও শেষ সংখ্যার যোগফল)×n÷2

প্রথম সংখ্যাটা ১-এর থেকে আরম্ভ না হয়ে a থেকে আরম্ভ হয়ে সমপরিমাণ বাড়তে বাড়তে যদি n সংখ্যক সংখ্যাটা l-এসে থামে, তাহলেও উপরোক্ত নিয়মে যোগফল হবে, $(a+l)\times n\div 2$। এ-সব নিয়ম তাঁরা পর্যবেক্ষণ দ্বারা আবিষ্কার করেছিলেন। আমরা বর্তমান আলজাব্রা বা বীজগণিত দিয়ে এসব সূত্র সহজেই প্রমাণ করতে পারি; কিন্তু সেই যুগে, আলজাব্রার প্রতীক সংখ্যার প্রচলনও যখন হয়নি, তখন যে এ-সব গবেষণা করাতে বেশ খানিকটা কল্পনা-শক্তির প্রয়োজন হত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

পিথাগোরিয়ানরা ১০ সংখ্যাটিকে নিখুঁত (Perfect) সংখ্যা বলতেন। ১, ২, ৩, ৪-এর যোগফল হয় ১০। আবার ১, ২, ৩, ৪ মাত্র ব্যবহার করেই সঙ্গীত শাস্ত্রের সুরান্তর (Interval) নির্ণয়ের প্রণালীও এঁরাই আবিষ্কার করে গেছেন। এ ব্যাপারটা অতি সহজেই বায়ু-কম্পনের স্পন্দন-সংখ্যার দ্বারা বুঝান যায়। অবশ্য বায়ু-তরঙ্গের স্পন্দন দ্বারাই সুর সম্পন্ন হয়; আর স্পন্দন যতই দ্রুত হতে থাকে সুরও ততই চড়া হতে থাকে। স্পন্দন সংখ্যার অনুপাত দ্বারাই বিভিন্ন স্বরের মধ্যেকার স্বরান্তর প্রকাশ করা হয়। প্রথম সা-এর স্পন্দন সংখ্যা ২৪ ধরলে, স্পন্দন-সংখ্যা দাঁড়ায়,

সুর	সা	রে	গা	মা	পা	ধা	নি	সা
স্পন্দন সংখ্যা	২৪	২৭	৩০	৩২	৩৬	৪০	৪৫	৪৮

এখানে দেখা যাচ্ছে,

সা থেকে সা (চড়া সা বা অষ্টম সুর)-এর অন্তর ৪৮÷২৪=২÷১

সা থেকে পা (পঞ্চম সুর)-এর দূরত্ব ৩৬÷২৪=৩÷২

সা থেকে মা (মধ্যম বা চতুর্থ সুর)-এর দূরত্ব ৩২÷২৪=৪÷৩

সুরান্তর : ২÷১ কে বাংলায় সপ্তক এবং ইংরেজিতে অষ্টক (Octave) বলা হয়।

৩÷২ কে বাংলায় পঞ্চম এবং ইংরেজিতে পঞ্চম (Fifth) বলা হয়।

আর, ৪÷৩ কে বাংলায় মধ্যম এবং ইংরেজিতে চতুর্থ (Fourth) বলা হয়। এই কয়টিকেই সুসমঞ্জস ধ্বন্যন্তর বা স্বরান্তর বলা হয়। এই স্বরান্তরের সুরগুলো একত্রে বাজালেও কানে বেসুরো লাগে না, তাই এগুলোর সাধারণ নাম ইংরেজীতে Harmony, বাংলায় সমঞ্জস সুর বা সু-সংযোগ বলা যায়।

পিথাগোরিয়ানরা এক, দুই, তিন, চার দ্বারা যথাক্রমে বিন্দু, রেখা, তল (বা পৃষ্ঠ) ও ঘনক্ষেত্রও বুঝাতেন। যেমন,

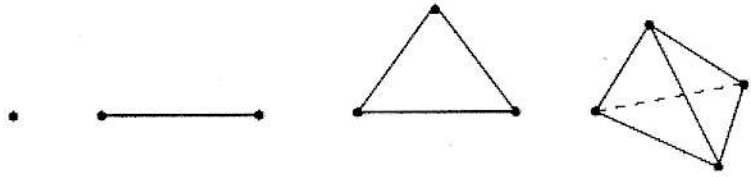

Point (1) বিন্দু | Line (2) রেখা | Area (3) পৃষ্ঠতল | Solid (4) ঘনক্ষেত্র

এর থেকেই ক্রমান্বয়ে বর্তমানকালে বহু-বিস্তারযুক্ত (Multi-dimensional) জ্যামিতি ও আলজাব্রার উদ্ভব হয়েছে।

প্রাচীন পিথাগোরীয় ভ্রাতৃসঙ্ঘ আকাশের তারাদেরও সংখ্যা কল্পনা করেছেন। কয়েকটা তারকাপুঞ্জের তারাগুলোকে কল্পিত রেখা দিয়ে সংযুক্ত করে সেগুলোকে মানুষ, জীব-জন্তু বা পদার্থের সাদৃশ্য-মূলে বিভিন্ন নামকরণ করে সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করেছেন। এইভাবে মেষ (Aries), বৃষ (Bull=Taurus), মিথুন (Twin=Gemini), কর্কট (Cancer), সিংহ (Leo), কন্যা (Virgo), তুলা (Libra), বৃশ্চিক (Scorpio), ধনু (Sagittarius), মকর (Capricorn), কুম্ভ (Aquarius), মীন (Pisces) প্রভৃতি কল্পিত রাশি (বুরুজ মোকাম)-কে যথাক্রমে ১ থেকে ১২ পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে নির্দেশ করেছেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে তাঁদের ধারণা জন্মে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, সমস্তই সংখ্যা বা রাশি দ্বারা কোনও না কোনওভাবে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং যে কোনও দুটো সংখ্যাকে পূর্ণসংখ্যক অংশে সমখণ্ডিত করে তাদের এক সাধারণ-খণ্ডাংশ পাওয়া যেতে পারে, যাকে আমরা গ.সা.গু. বা গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বলে থাকি। যেমন, ৩·৫ ইঞ্চি আর ৫ ইঞ্চি লম্বা দুটো রেখা থাকলে প্রথমটাকে ৭ ভাগে আর দ্বিতীয়টাকে ১০ ভাগে

সমখণ্ডিত করলে ঐ সংখ্যা দুটোর সাধারণ খণ্ডাংশ পাওয়া যাবে ·৫ ইঞ্চি। এই ধারণা দ্বারা পরিচালিত হয়ে শেষে তাঁরা এক বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হলেন। তাঁরা নির্ণয় করতে চাইলেন, একটি বর্গক্ষেত্রের বাহু এবং কর্ণের সাধারণ খণ্ডাংশ কত হবে? বহু চেষ্টা করেও এ প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর পাওয়া গেল না। প্রশ্নটাকে অন্যভাবে বলা যায়— দুটো বর্গক্ষেত্র দেওয়া আছে, একটির ক্ষেত্রফল অপরটির দ্বিগুণ। কমপক্ষে, ছোটটিকে কতখণ্ডে এবং বড়টিকে কতখণ্ডে সমখণ্ডিত করলে একটি সাধারণ খণ্ডাংশ পাওয়া যাবে? ছোটটির বাহুকে এক ধরলে, বড়টির বাহুকে আজকাল আমরা বলে থাকি $\sqrt{2}$ একক। যদি ধরে নেওয়া যায় কমপক্ষে বড়টিকে পূর্ণসংখ্যক m অংশে, আর ছোটটিকে পূর্ণসংখ্যক n অংশে সমখণ্ডিত করলে খণ্ডাংশগুলো পরস্পর সমান হয়, তাহলে অবশ্যই $\sqrt{2}\div m$ এবং $1\div n$ পরস্পর সমান হবে। অর্থাৎ $\sqrt{2}:m=1:n$ বা $\sqrt{2}\div 1=m\div n$ বা $\sqrt{2}=m\div n$।

বর্তমানে আমরা সংখ্যা প্রকরণের সাহায্যে সহজেই দেখাতে পারি, আমরা কখনই এমন কোনও দুটো পূর্ণ সংখ্যা বের করতে পারিনে, যার অনুপাত ঠিক $\sqrt{2}$ হয়। $\sqrt{2}$-কে যদি আমরা x বলি, তাহলে $x^2=2$ একটি সমীকরণ হল। এর মূল বা সমাধান কখনই দুটো পূর্ণ সংখ্যার ভাগফল দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। এজন্য $\sqrt{2}$ জাতীয় সংখ্যাকে অমূলীয় (irrational) সংখ্যা বলা হয়। এরকম সংখ্যা আরও অনেক আছে। যেমন, $\sqrt[3]{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt[2]{3}$, $\sqrt[3]{4}$, $\sqrt[4]{5}$ ইত্যাদি; এগুলোকে সমীকরণের আকারে প্রকাশ করলে দাঁড়ায় যথাক্রমে $x^3=2$, $x^2=3$, $x^3=3$, $x^3=4$, $x^2=5$ ইত্যাদি। যদি এক ইঞ্চি লম্বা একটি সরল রেখা টেনে তার প্রথম বিন্দুকে O এবং শেষ বিন্দুকে ১ বলা হয়, তবে মধ্যবর্তী অসংখ্য বিন্দুর মধ্যে যেমন অসংখ্য মূলীয় (Rational) সংখ্যা রয়েছে, তেমনি অসংখ্য অমূলীয় (Irrational) সংখ্যাও রয়েছে। এখানে বলে রাখা ভাল, গণিতে ব্যবহৃত rational শব্দটা 'ratio' বা অনুপাত থেকেও নিষ্পন্ন হতে পারে (Ratio-nal); তাহলে rational-কে 'অনুপাতী' আর Irrational-কে 'অননুপাতী' বলা যেতে পারে— অনুপাত বলতে এখানে অবশ্য এক পূর্ণ সংখ্যার সঙ্গে অপর এক পূর্ণ সংখ্যার অনুপাতই মনে করা হচ্ছে।

এইসব অমূলীয় বা অননুপাতী সংখ্যা আবিষ্কৃত হওয়াতে এঁদের পূর্বোল্লিখিত ধারণার মূলে আঘাত পড়ল। তাই এঁরা প্রথমে অনুপাতী সংখ্যার কথা চেপে যেতে চাইলেন। এমনকি, শোনা যায়, এঁদের ভ্রাতৃসঙ্ঘের প্রথম যে ব্যক্তি অপরের কাছে রহস্য প্রকাশ করেছিলেন, সঙ্ঘের তরফ থেকে তাঁর জীবনাবসানের কথাও বিবেচনা করা হয়েছিল। যাহোক, পিথাগোরাসের মৃত্যুর প্রায় দেড়শো বছর পরে ইউডক্সাস (Eudoxus) নামক একজন গ্রিক গণিতবিদ আনুপাতিক সংখ্যা সম্বলিত প্রস্তাব বা সমস্যা জ্যামিতির সাহায্যে সমাধান বা নির্ণয় করবার উপায় বের করেছিলেন। এখন আমরা যে যে সঙ্কেত দ্বারা বর্গমূল নির্দেশ করি, তা বেশী দিনের নয়। গ্রিক পণ্ডিতেরা বর্গ-'মূল', ঘন-'মূল' প্রভৃতি ব্যবহার না করে তাঁরা ১, ৪, ৯, ১৬, ২৫ ইত্যাদিকে বর্গ-সংখ্যা বলতেন, আর এগুলোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ১, ২, ৩, ৪, ৫ প্রভৃতিকে ঐসব বর্গ-সংখ্যার বাহু বলতেন। যেমন, বর্গ-সংখ্যা ২৫-এর বাহু হচ্ছে ৫, বর্গসংখ্যা ৬৪-র বাহুর পরিমাণ ৮ ইত্যাদি; কিন্তু আরবীয়েরা গ্রীকদের থেকে গণিতের অনেক বিষয় গ্রহণ করলেও, তাঁরা

অঙ্ক-লিখন প্রণালীতে ভারতীয়দের সহজ ও সুবিধাজনক সঙ্কেতই ব্যবহার করেছিলেন। এর ফলে আরবীয়দের গাণিতিক যুক্তি প্রণালী জ্যামিতি-ভিত্তিক না হয়ে বরং সংখ্যা-ভিত্তিক হয়ে পড়ল। তখন '১৬-এর বাহু ৪' না বলে, তাঁরা বলতে লাগলেন '১৬-র মূল হচ্ছে ৪'—এখানে মূল অর্থে শিকড়। সংখ্যা যেন একটি গাছ; মূল থেকে এর উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়। এরপরে অবশ্য এই অর্থ প্রসারিত হয়ে ঘন মূল, চতুর্থ মূল, পঞ্চম মূল ইত্যাদির প্রচলন হয়েছে। যেমন, ৪ সংখ্যাটি ১৬-র বর্গমূল, ৬৪-র ঘনমূল, ২৫৬-র চতুর্থ মূল, ১০২৪-এর পঞ্চম মূল ইত্যাদি।

আল্-খ্বওয়ারিজমির সংখ্যা-গণিত সংক্রান্ত পুস্তকখানা ইউরোপে প্রচারিত হবার পর, ইউরোপীয় গণিতজ্ঞেরা সংখ্যা-প্রকরণে আরবীয়দের শিকড়ের ধারণাই অবলম্বন করলেন। তারপর এর ল্যাটিন প্রতিশব্দ radix শব্দ ব্যবহৃত হতে লাগল 'মূল'-এর অর্থে; আরও লক্ষ্যযোগ্য যে আমরা যেমন 'মূল-নির্ণয়' প্রণালীকে প্রায়ই মূল-আকর্ষণ প্রণালী বলে থাকি, ইউরোপীয়েরাও তেমনি 'finding a root' না বলে সচরাচর আলজাব্রাতে 'extracting (dragging out) a root' বলে থাকেন। মধ্যযুগের শেষভাগে, যখন ক্রমশঃ প্রতীকের ব্যবহার চালু হতে লাগল তখন radix শব্দের সংক্ষিপ্ত $\mathcal{R}_x$ এর প্রচলন হল। এখনও এই চিহ্নটা ঔষধ-পত্রের নির্দেশনামায় (Prescription-এ) ব্যবহৃত হয়। এই সময় radix 25 বলতে 5 বুঝাত। ছাপাখানায় আনুমানিক এক শতাব্দী আগে ছোট হাতের r ব্যবহারের রেওয়াজ হয়েছিল; অর্থাৎ সে সময় r 25 বলতে 5 বুঝাত। মনে হয়, তাড়াতাড়ি r লিখতে গেলে যে চেহারা দাঁড়ায়, তাই ছাপায় √ হয়ে এখন লাঙ্গল-চিহ্ন বা মূল-চিহ্ন হয়ে গেছে। এজন্যই এখন আমরা 'দুই'-এর বর্গমূল লিখতে $\sqrt{2}$ লিখি।

গ্রিক পণ্ডিতেরা $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ প্রভৃতি সংখ্যার যে নাম দিয়েছিলেন তার থেকে বেশ মজার পরিণতি হয়েছে। তাঁরা logos শব্দটা ব্যবহার করতেন কখনও 'শব্দ' অর্থে, আবার কখনও বা 'শব্দ উচ্চারণকারীর মানসিক প্রক্রিয়া বা মন' অর্থে। যেসব সংখ্যা দুই পূর্ণসংখ্যার অনুপাত, সেগুলো মানুষের মনের ধৃতি বা ধারণার মধ্যে আছে বলে, সেসব সংখ্যা ছিল logos (অনুপাতী), আর যেগুলো পূর্ণসংখ্যার অনুপাত দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, সেসব সংখ্যা ছিল alogos (অননুপাতী)। এর প্রায় হাজার বছর পরে আরব গণিতজ্ঞ আল্-খ্বওয়ারিজমির হাতে গ্রীকদের লেখা পুস্তকের যে আরবি অনুবাদখানা পড়েছিল, তার অনুবাদক alogos শব্দের পারিভাষিক অর্থ জানতেন না, তাই তিনি তাঁর আরবি অনুবাদে যে শব্দ ব্যবহার করেছিলেন তার মানে 'শব্দহীন' অর্থাৎ বধির। সুতরাং খ্বওয়ারিজমি $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ ইত্যাদিকে 'শব্দহীন' বা 'বধির' সংখ্যা বলেই মেনে নিলেন। এর প্রায় তিনশো বছর পরে ঘেরাডো (Gherado) নামক একজন ইউরোপীয়ান আল্-খ্বওয়ারিজমির একখানা আরবি পুস্তক লাটিন ভাষায় অনুবাদ করবার সময় 'শব্দহীন' বা 'বধির'-এর লাটিন তরজমা 'Surdus' লিখলেন। সেই থেকে এখনও আমরা বর্গমূল-সমন্বিত $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ ইত্যাদি সংখ্যাকে surd (বধির) সংখ্যা বলে থাকি, যার তরজমা আসলে 'অননুপাতী' বা 'অমূলীয়' বললেই অধিক অর্থপূর্ণ হয়।

বর্তমানে আমরা পাটীগণিত (Arithmetic) শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করি, তারও ইতিহাস আছে। গ্রিক গণিতজ্ঞেরা Arithmetic শব্দ দ্বারা বুঝতেন সংখ্যা-বিজ্ঞান (গ্রিক শব্দ arithmos=সংখ্যা, আর techne=বিজ্ঞান); কিন্তু এর দ্বারা এঁরা এখনকার মতো প্রধানতঃ হিসাব রাখা বা প্রাথমিক যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগই বুঝতেন না। এই শেষোক্ত অর্থে তাঁরা logistic শব্দ প্রয়োগ করতেন। প্রতিদিনের এইসব হিসাবকে যা 'আবাকাস' বা হিসাব-তক্তির সাহায্যে করা হত তাকে এঁরা বিজ্ঞানের পর্যায়ে বলেই গণ্য করতেন না। ক্রমে ক্রমে তাঁরা উচ্চতর সংখ্যা-বিজ্ঞানকে আরবদের অনুকরণে আলজাব্রা বলতে শুরু করেন। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবার arithmetic শব্দটার ব্যবহার চালু হল বটে, তবে সেটা logistic-এর হীনার্থে। তখন থেকে এ যাবৎ পাটীগণিত (পাটিতে ব'সে প্রাথমিক হিসাব শিক্ষা, অথবা পরিপাটিরূপে সম-মান যুক্ত সংখ্যা একই স্তম্ভে বা পাটিতে লিখে মিশ্র বা অমিশ্র হিসাব শিক্ষা) নিম্নমানের সহজ হিসাব-নিকাশই বুঝিয়ে আসছে। সম্ভবতঃ একটু ভ্রমাত্মক ধারণা থেকেই এমন হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক সময় লাটিন ars-metrica শব্দের প্রচলন দেখা যায়; এর অর্থ আর্ট বা শিল্পকলার মাপ (Ars—আর্ট; Metrica—মাপন)। মনে হয়, arithmetic আর ars-metrica একই শব্দ মনে করে (অন্ততঃ প্রয়োগক্ষেত্রে) এর ব্যবহার নিম্ন মানের হিসাবেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

গ্রীকদের একখানা বিখ্যাত প্রাচীন ধাঁধা-সঙ্কলন বর্তমান আছে। খ্রীস্টীয় প্রায় পাঁচশো সালে এই সঙ্কলন করা হয়। এর মধ্যে ছেচল্লিশটা হচ্ছে সংখ্যা নির্ণয় বিষয়ে— বর্তমানে যা সমীকরণের সাহায্যে অনায়াসে সমাধান করা যায়; কিন্তু সে যুগে সহজ সংখ্যা-সঙ্কেত না থাকাতে এ ধরনের অঙ্ক কষা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। একটি ধাঁধা এই: কতগুলো আপেল ছিল, তা বণ্টন করে, এক-তৃতীয়াংশ দেয়া হল একজনকে, এক অষ্টমাংশ দ্বিতীয় জনকে, এক চতুর্থাংশ তৃতীয় জনকে, এক পঞ্চমাংশ চতুর্থ জনকে, ১০টি পঞ্চম জনকে এবং ১টি মাত্র ষষ্ঠ ব্যক্তিকে। কয়টি আপেল ছিল? বর্তমানে আমরা আলজাব্রায় ফেলে অঙ্কটাকে লিখি এইভাবে :

$$\frac{x}{3}+\frac{x}{8}+\frac{x}{4}+\frac{x}{5}+10+1=x$$

তারপর সমাধান করে পাওয়া যায় $x=120$; কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে এইভাবে অঙ্কপাতন করে সমীকরণের সমাধান করবার নিয়ম চালু হয়নি। তখন পর্যন্ত এ-সব অঙ্ক পরীক্ষণ দ্বারা করা হত; অর্থাৎ সম্ভাব্য কোনও একটি সংখ্যা ধরে নিয়ে, মিল করে দেখা হত যে শর্তগুলোর সঙ্গে সংখ্যাটি খাপ খায় কি না। মধ্যযুগে এই নিয়মকে বলা হত 'rules of false' অর্থাৎ 'মিছে বাছাই' বা 'যাচাই নিয়ম'— যাচাই করে মিছে সংখ্যাগুলো বাতিল করতে করতে শেষে সত্য সংখ্যাটা পাওয়ার নিয়ম।

অনুমান খ্রীস্টীয় ২৫০ অব্দে আলেকজান্দ্রিয়ায় ডাইয়োফ্যান্টাস (Diophantus) নামক একজন বিখ্যাত গণিতবিদ ছিলেন। তাঁর জন্ম-তারিখ বা জন্ম-বৃত্তান্ত আমরা প্রায় কিছুই জানিনে, তবে তাঁর সম্বন্ধে গ্রিক ধাঁধা-গ্রন্থে একটি ধাঁধা দেখা যায়, তা যদি সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে মানতে হয় যে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল চুরাশি বছর।

ধাঁধাটা এই : তাঁর জীবনের ষষ্ঠাংশ কাটলো বাল্যাবস্থায়, জীবনের আরও দ্বাদশাংশ কেটে গেলে গজালো তাঁর দাড়ি, এরপর জীবনের আরও সপ্তাংশ কেটে গেলে হল তাঁর বিয়ে, তার পাঁচ বছর পরে জন্মাল এক পুত্র; এই পুত্রটি পিতার বয়সের অর্ধাংশ মাত্র পেয়েছিল, আর ডাইয়োফ্যান্টাসের মৃত্যুর চার বছর আগেই মারা গিয়েছিল। মৃত্যুকালে ডাইয়োফ্যান্টাসের বয়স কত ছিল?

এই চুরাশি বছর বয়সের মধ্যে তিনি যে কাজ করে গেছেন, তার ফলে মৃত্যুর বহুকাল পরে বিশেষজ্ঞরা তাঁকে 'আলজাব্রার জনক' বলে অভিহিত করেছেন; কিন্তু এই মত যুক্তিযুক্ত কিনা, তা এখন যাচাই করে দেখা মুশকিল। তবে একথা ঠিক যে, তিনি তের খণ্ডে Arithmetic বলে একখানা পাটীগণিত লিখেছিলেন, তার ছয়খানা মাত্র এখন পাওয়া যায়। বইখানাকে অবশ্যই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গণিত পুস্তকের মধ্যে একখানা বলেই মনে করা যায়, কারণ প্রায় চৌদ্দশো বছর পরে বিখ্যাত ফরাসি গণিতবিদ ফের্মা (Fermat) নিজের মানসিক অনুশীলনের জন্য এ বই পাঠ করে উপকৃত হয়েছিলেন। এতে আছে সংখ্যা সম্বন্ধে এমন সব প্রশ্ন যার জবাব দিতে সমীকরণের সাহায্য লাগে। এর কতকগুলো সমীকরণ বেশ কঠিন, তাতে দ্বিঘাত, ত্রিঘাত ও চতুর্ঘাত সমীকরণের মূল আকর্ষণ [নির্ণয়] করবার দরকার হয়। কতকগুলোর আবার একাধিক নির্ণেয় মান আছে (বলাবাহুল্য, সে যুগে আলজাব্রার অক্ষর-প্রতীকের ব্যবহার জানা না থাকায় এসব প্রশ্নের সমাধান আরও দুরূহ ছিল)। কিন্তু গ্রিক গণিতের কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতে, ডাইয়োফ্যান্টাস যে এ ধরনের প্রশ্ন প্রথম সমাধান করেছেন, তা নয়। তিনিও ইউক্লিডের মতো তৎকালীন যাবতীয় সংখ্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন তের খণ্ডে সংগ্রহ করেছিলেন। তা'ছাড়া, তিনি যেসব প্রক্রিয়ার সাহায্যে ঐসব প্রশ্নের সমাধান করেছিলেন, তার থেকেই যে বর্তমান আলজাব্রার প্রণালী উদ্ভূত হয়েছিল তাও ঠিক নয় : বস্তুতঃ তাঁর জীবনকালের থেকে পনেরশো বছরের মধ্যেও বর্তমান প্রণালীর উদ্ভব হয়নি।

বর্তমান আলজাব্রার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এতে সাঁটলিপির মতো কতকগুলো সঙ্কেত ব্যবহৃত হয়, তাই যেন এর ভাষা— সে ভাষা সাধারণ কথাবার্তার ভাষা নয়। এর কাজ হচ্ছে আলজাব্রার প্রক্রিয়াগুলোকে সহজ ও সংক্ষেপ করে ফেলা। ডাইয়োফ্যান্টাসের কৃতকার্যতার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না বটে, কিন্তু আলজাব্রার এই

সাঁটলিপি নিশ্চয়ই তাঁর আবিষ্কৃত নয়। আলজাব্রার প্রথম স্তর প্রাচীন মিসরীয় যুগ থেকে ডাইয়োফ্যান্টাসের সময় পর্যন্ত; অর্থাৎ খ্রীস্টীয় ২৫০ সাল পর্যন্ত ধরা যায়। এই যুগের শেষ চার শতাব্দীতে অজ্ঞাত সংখ্যাটিকে বলা হত 'Arithmos' বা অঙ্ক। এ ছিল একটি শব্দ-সঙ্কেত. বর্তমান x-এর মতো অক্ষর-সঙ্কেত নয়। 'অঙ্ক'কে 'অঙ্ক' বার নিয়ে যোগ করলে যা হয়, তাঁরা তাকে ঐ অঙ্কের শক্তি (power) নাম দিয়েছিলেন। এর অর্থ এই যে, 'অঙ্ক' বার 'অঙ্ক' নিলে হয় (অঙ্ক)^2। বর্তমানে আমরা বলি x বার x নিলে হয় x^2, আবার x বার x^2 নিলে হয় x^3, x বার x^3 নিলে হয় x^4 ... ইত্যাদি; যেমন 3 বার 3 নিলে হয় $3^2=9$; 3 বার 3^2 নিলে হয় $3^3=27$; 3 বার 3^3 নিলে হয় $3^4=81$ ... ইত্যাদি। অন্য কথায় 3 কে দুই বার নিয়ে গুণ করলে হয় $3^2=9$; 3 কে তিন বার নিয়ে গুণ করলে হয় $3^3=27$; 3 কে চার বার নিয়ে গুণ করলে হয় $3^4=81$। ডাইয়োফ্যান্টাসের কথার তর্জমা করে নিয়ে আমরা x-এর দ্বিঘাতকে বলি x-এর দ্বিতীয় শক্তি ($=x^2$), x-এর ত্রিঘাতকে বলি x-এর তৃতীয় শক্তি ($=x^3$) ইত্যাদি। এছাড়া এই সম্পর্কে x বলতে শুধু অজ্ঞাত বা নির্ণেয় সংখ্যাই নয়, আমরা এখন x বলতে যেকোনও সংখ্যা বুঝি, তা' সে পূর্ণ সংখ্যাই হোক বা ভগ্নাংশ, অনুপাতী সংখ্যাই হোক বা অননুপাতী। ডাইয়োফ্যান্টাসের সময় 'এক কম দশ'-এর প্রচলন হয়েছিল, কিন্তু 'দশ কম এক'-এর কোনও মানে ছিল না। যোগ সংখ্যা ও বিয়োগ সংখ্যার ধারণা জন্মাতে আরও প্রায় পনর শতাব্দী সময় লেগেছিল।

এখন দেখা যাক পাটীগণিত (Arithmetica)-এর স্থলে সংখ্যা-বিজ্ঞান বুঝাতে 'আলজাব্রা' নাম কেমন করে হল। আরবীয় গণিতবিদ আল-খ্ওয়ারিজমি 'হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা, লিখন-পদ্ধতি' ছাড়াও আর একখানা বই লিখেছেন 'সমীকরণ' সম্বন্ধে। তিনি সেই বইয়ের নাম দিয়েছিলেন— আল্-জব্র-ও-আল-মুকাবালা (অর্থাৎ সংযোজন ও বিয়োজন)। আজ আমরা যাকে সমীকরণের সমাধানে 'পক্ষান্তরণ' বা 'পক্ষান্তরকরণ' বলি, উপরোক্ত আরবি নামটি তারই বর্ণনা। 'আল্-জব্র' মানে 'একত্র করা' আর 'আল্-মুকাবালা'র মানে 'সামনা সামনি' রাখা। সমীকরণ সমাধানের শেষ স্তরে, একদিকে সব অজ্ঞাত বা নির্ণেয় সংখ্যা আর অন্যদিকে জ্ঞাত বা প্রদত্ত সংখ্যা থাকে। এরা যেন পরস্পর 'মুকাবালা' করে বা 'সামনাসামনি দাঁড়ায়। এর পরের ধাপেই সহজে নির্ণেয় সংখ্যাটির মান নির্ণয় করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক সমীকরণটি হচ্ছে : $5x+2=2x+23$

এখানে 2 ও 23 প্রদত্ত সংখ্যা; আর $5x$ ও $2x$ অজ্ঞাত সংখ্যা, নির্ণেয় x-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। আমরা $2x$-কে পক্ষান্তর করে বাম দিকে আনতে পারি। তা করতে হলে ডান দিক (পক্ষ) থেকে $2x$ সরাতে হবে; অর্থাৎ $2x$ বাদ দিতে হবে; কাজে কাজেই উভয়পক্ষ সমান রাখতে হলে বাম পক্ষ থেকেও $2x$ বাদ দিতে হবে। তা'হলে বাঁদিকে থাকলো $(5x-2x)=3x$, এইভাবে বামপক্ষ থেকে 2 সরানোর মানে 2 বাদ দেওয়া; ডানপক্ষ

থেকেও 2 বাদ দিতে হবে, তা'হলে ডান দিকে থাকলো (23—2)=21; সমীকরণটি এখন সহজ করে লেখা গেল :

$$3x=21,$$

সুতরাং, $x=21\div3=7$

এখন সমাধান পাওয়া গেল; নির্ণেয় সংখ্যাটি ৭।

আল্-খ্বওয়ারিজমির বইখানার লাটিন অনুবাদের নাম দেওয়া হয়েছিল 'Ludus algebrae et almucgrabalesque'। সুখের বিষয়, অবশেষে শুধু 'আলজাব্রা' নামটুকু টিকে গেছে, তবে লাটিন বা গ্রিক নাম না রেখে আরবি নাম রাখায় অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বিস্ময় প্রকাশ করেন। বলাবাহুল্য, আল্-খ্বওয়ারিজমির ঋণ-স্বীকারের চিহ্নস্বরূপই তৎকালীন ইউরোপবাসী 'আলজাব্রা' নামটি পছন্দ করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'আল্-জব্‌র' শব্দটা সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে বিজয়ী মূরদের সময় ইউরোপে প্রচলিত হয়েছিল। মধ্যযুগে স্পেনীয় নাপিতকে বলা হত 'আলজেব্রিস্টা' অর্থাৎ 'হাড়-জোড়া'; কারণ ঐ সময় নাপিতেরা শুধু চুলই কাটত না, ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়া, চুঙ্গি দিয়ে বাত-রক্ত বের করা প্রভৃতি উপরি কাজও করত। আল্-জব্‌র-এ 'একত্রীকরণ' অর্থ মনে রাখলে অঙ্কের 'আলজাব্রা' আর নাপিতের হাড়-জোড়ার মধ্যে কিছুটা মিল আছে বলে মানতে হবে বৈকি!

মধ্যযুগে আল্-খ্বওয়ারিজমির আলজাব্রার অন্ততঃ তিনটি লাটিন অনুবাদ হয়েছিল। এর একটি করেছিলেন বিখ্যাত অনুবাদক ঘেরাডো (Gherado), আর একটি করেছিলেন রবার্ট নামক একজন ইংরেজ। এই শেষোক্ত লাটিন অনুবাদের প্রথম ইংরেজি সংস্করণ বের করেন ১৯১৫ সালে কারপিন্‌সকি (Karpinski, L.C.)। ইংলন্ডের বড় লাইব্রেরীতে এর কপি রক্ষিত আছে।

আনুমানিক ৮০০ থেকে ১৪৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে ইউরোপের আঁধার যুগ বলা হয়। এই সময়টা বলতে গেলে কি গণিতের ক্ষেত্রে, কি অন্য কোনও ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনও নতুন চিন্তাধারার সাক্ষাৎ মিলে না। অবশ্য, দ্বাদশ খ্রীস্টাব্দে একবার এক ঝলক আলো দেখা গিয়েছিল। তখন বোনাক্কির পুত্র লিওনার্ডো ফি-বোনাক্কি আল্-খ্বওয়ারিজমির আলজাব্রা ও হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা লিখন-পদ্ধতি সম্বন্ধে একখানা পুস্তক রচনা করেন। এঁর জন্মভূমি উত্তর ইতালির পিসা নগরে, তবে উত্তর আফ্রিকায়ই তাঁর শিক্ষারম্ভ হয়; কারণ সেখানেই তাঁর পিতা শুল্ক-বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। এতে তিনি আলজাব্রার নিয়মাদি সম্বন্ধে এবং রোমান পদ্ধতির অসুবিধা আর হিন্দু-আরবীয় পদ্ধতির সুবিধা সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি π-এর সীমা নির্দেশ করেন 3.1410 এবং 3.1427-এর মধ্যে। এই সীমা আর্কিমিডিসের নির্দেশিত সীমার থেকেও একটু সংকীর্ণ বটে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বোধ হয় তাঁর 'আট কম পাঁচ'-এর ধারণা বুঝাবার চেষ্টা। একে তিনি বলেন 'ধারে ৩'। অবশ্যই এটি ঋণ-সংখ্যা বা বিয়োগ-সংখ্যা বুঝবার প্রথম চেষ্টাগুলোর মধ্যে অন্যতম। আরবেরা ত্রিকোণমিতির কি কি উন্নতি করেন তারও

বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর লেখায়; কিন্তু এই দপ করে জ্বলে উঠা বাতি অচিরে স্তিমিত হয়ে গেল। তারপর ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দের দিকে আঁধার যুগের অজ্ঞতা দূর হতে শুরু করল এবং কিছুদিনের মধ্যেই গ্রিক স্বর্ণযুগের চেয়েও উজ্জ্বলতর আলোকে দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বলতে গেলে আর্কিমিডিসের সময় থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত গাণিতিক জ্ঞানের অতি সামান্যই উন্নতি হয়েছিল। তারপর হঠাৎ, যেন রাত পোহাতে না পোহাতেই, ১৬০০ থেকে ১৭০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গণিতের উৎকর্ষ শুরু হল। সে উন্নতির ধারা এখন পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার কি করে সম্ভব হল তা' জানতে হলে কয়েকটা ঐতিহাসিক ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে।

প্রথম ঘটনা হচ্ছে ১৪৫৩ সালে তুর্কী সৈন্যের দ্বারা কন্‌স্টান্টিনোপল অবরোধ। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে এঙ্গল, সাক্সন, ফ্রাঙ্ক, গথ এবং অন্যান্য টিউটনরাও রোমান সাম্রাজ্যের উপর হামলা করেছিলেন; কিন্তু এ পর্যন্ত এই সাম্রাজ্যের পূর্ব তোরণ কনস্টান্টিনোপলের উপর কোনও আক্রমণই সফল হয়নি। প্রাচীন বাইজেনটিয়াম নগরের ধ্বংসাবশেষের উপর এই নগর স্থাপিত হয়েছিল ৩৩০ খ্রীস্টাব্দে রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইনের দ্বারা। রোমানরা গ্রীকদের কাছ থেকে যে সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েছিল, এই নগরে এ যাবৎ তা অক্ষুণ্ন ছিল। এক হাজার বছরেরও ঊর্ধ্বকাল আক্রমণের পর আক্রমণ প্রতিহত করে এই নগর অজেয় ছিল; কিন্তু ১৪৫৩ সালে তুর্কী আক্রমণের মুখে সে ঐতিহ্য চূর্ণ হয়ে গেল। এই পরাজয়ের ফলে পশ্চিম ইউরোপে চিন্তা ও কার্য উভয় ক্ষেত্রেই বিষম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। মধ্যযুগে পূর্ব ও পশ্চিমের সন্ধিস্থলে এই কনস্টান্টিনোপল নগর পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যিক বন্দর বলে বিখ্যাত ছিল। এখন এই পূর্ব-পশ্চিমের সংযোজক দরজা গেল বন্ধ হয়ে।

তার কিছুদিন পরেই আবিষ্কৃত হল নয়া দুনিয়া (তথা আমেরিকা মহাদেশ), যার ফলে পৃথিবীর ইতিহাসের ধারাই গেল বদলে। এর বৃত্তান্ত সংক্ষেপে এই : চতুর্দশ শতাব্দীর কোনও সময় চীনদেশে চুম্বক-শলাকার ব্যবহার প্রচলিত হয়, তার সাহায্যে নাবিকেরা কোনও উপকূল বা তটভূমিকে সর্বদা দৃষ্টিপথে না রেখেও সাহস করে সমুদ্রপথে দূর-দূরান্তে পাড়ি জমাতে শুরু করল; আর এই সময় পর্তুগালে ছিলেন এক অধিপতি যিনি অন্যান্য রাজ্যাধিপতির মতো যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে মেতে থাকার চেয়ে বরং জ্ঞানচর্চাতেই সময় ক্ষেপণ করতে ভালবাসতেন। ইনিই পর্তুগালের প্রিন্স হেনরী, 'সমুদ্র-বিহারী' বলে পরিচিত। ইনি গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, মানচিত্র অঙ্কন ও সামুদ্রিক চলাচলে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। প্রজাদের কর থেকে যে রাজস্ব তাঁর হাতে আসতো, তা দিয়ে তিনি সাহসী নাবিকদের সমুদ্রযাত্রায় উৎসাহ দিতেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল আফ্রিকা ঘুরে জলপথে ভারতবর্ষে আগমন করা। কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ চালাতে লাগলেন। তাঁর জীবন-কালে না হলেও তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরেই তাঁর সাহায্য-পুষ্ট নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৭ সালের ৮ই জুলাই তারিখে লিসবন থেকে রওয়ানা

হয়ে খ্রীস্টমাস দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার নাতাল ও পর বছর ২০শে মে তারিখে ভারতে পৌঁছবার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রযাত্রার আগেই ১৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে পঁচিশ বছর বয়স্ক স্পানিস-ইহুদি যুবক কোলাম্বাস এক জাহাজ-ডুবির পর সাঁতরিয়ে প্রিন্স হেনরীর রাজধানীর কাছে এসে উঠেন। তারপর তিনি দীর্ঘকাল সেখানে অবস্থান করে প্রিন্স হেনরীর সংস্পর্শে এসে সমুদ্রযাত্রার সমুদয় তত্ত্ব শিক্ষা করেন। অবশেষে ১৪৯২ খ্রীস্টাব্দে সান্টামারিয়া, নিনা ও পিন্টা (Santa-Maria, Nina, Pinta) জাহাজ যোগে তিনি যে নয়া দুনিয়া আবিষ্কার করেন। তা শুনে সমগ্র ইউরোপ কেবল বিস্ময়ে অভিভূত হল না, বরং দুঃসাহসী অভিযানে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। আমেরিকা ও ভারতের সমুদ্রপথ আবিষ্কার হচ্ছে দ্বিতীয় ঘটনা।

তৃতীয় ঘটনাও কনস্টান্টিনোপলের পতনের সঙ্গে জড়িত; কারণ ঐ ঘটনার পর বহু গুণী ও বিদ্বজ্জন পলায়ন করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং বিশেষ করে, ইতালিতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এইসব দেশ এতদিন অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে ছিল। এখন এই জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশে ও সহায়তায় আবার নতুন করে গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হল। কন্‌স্টান্টিনোপলের লাইব্রেরীর বহু পুস্তকের নকল এইসব পুনর্বাসিত গুণীর কাছে ছিল। তাতে করে অতি সত্বর ইউরোপের দেশগুলোতে লোকের মনে আত্মবিশ্বাস ফিরে এলো এবং এই নতুন পরিস্থিতিতে নতুন চিন্তারও বিকাশ হতে লাগলো।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপে ছাপাখানার প্রবর্তন হল। এই বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দ্বারা জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন সবিশেষ ত্বরান্বিত হয়। ছাপাখানা ও পার্চমেন্টের বদলে কাগজের প্রচলন দ্বারা বহু সংখ্যক পুস্তক অল্প সময়ে অল্প মূল্যে সরবরাহ করতে পারায় লোকের জ্ঞানার্জনের সুযোগ-সুবিধা অনেক বেড়ে গেল। এরই ফলে ১৫০০ খ্রীস্টাব্দের কাছে এসেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র হঠাৎ প্রসারিত হয়ে পড়ল এবং ব্যবহারিক জগতের সংস্পর্শে এসে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং, নৌ-প্রবহণ-বিদ্যা এবং বায়বীয় যানবাহন-বিদ্যাও দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলল।

এই প্রবল বন্যার প্রথম ঢেউস্বরূপ আমরা গিরেলামো কার্ডান (Girelamo Cardan)-এর নাম উল্লেখ করতে পারি। উত্তর ইতালির তিসিনো নদীর তীরে একটি শহরের নাম পাভিয়া (Pavia)। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর এ শহর বারংবার লুণ্ঠিত হয়েছে— পঞ্চম শতাব্দীতে আটিলা (Attila) এবং তাঁর হূন সৈন্য দ্বারা; অষ্টম শতাব্দীতে লম্বার্ড এবং ফ্রাঙ্কদের দ্বারা এবং দশম শতাব্দীতে মাজিয়ারদের দ্বারা; কিন্তু বারেবারেই এর ধ্বংসাবশেষ থেকে আবার এ শহর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ১৫০১ খ্রীস্টাব্দে এই শহরে কার্ডানের জন্ম হয়। ইনি একজন খ্যাতিমান আইনজ্ঞের পুত্র। এঁর ভাগ্যে ছিল নানা বিষয়ে খ্যাতি (বা অখ্যাতি) অর্জন করা— গণিতজ্ঞ হিসাবে, জ্যোতিষী হিসাবে, বৈজ্ঞানিক হিসাবে, জুয়াড়ী হিসাবে এবং প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী হিসাবে। ইনি পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা আরম্ভ করেন, পরে পাডুয়া (Padua)-তে গিয়ে চিকিৎসা বিদ্যার গ্রাজুয়েট হিসাবে

শিক্ষা সমাপ্ত করেন। প্রথমে তিনি ডাক্তারি করে অবস্থার উন্নতি করতে যত্নবান হন; কিন্তু তাতে সুবিধে হয় না, এমন কি, একসময়ে স্ত্রীসহ দরিদ্রশালায় ভর্তি হতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপর ভাগ্যফলে মিলান (Milan)-এর কোনও সিনেটর বা ব্যবস্থাপক সভার সদস্যের পুত্রকে চিকিৎসা করে ভাল করেন। তাঁর সুপারিশে তিনি ডাক্তার হিসাবে প্রাকটিস করবার অনুমতি পান। ইতিপূর্বে, অবশ্য তিনি স্বভাবজ পুত্র বলে অনুমতি লাভে অকৃতকার্য হয়েছিলেন। সে যা'হোক, ডাক্তারী ব্যবসায়ে তো প্রতিষ্ঠিত হলেন; কিন্তু জুয়াখেলায় এবং ডাক্তারীর সঙ্গে সম্পর্কহীন অন্যান্য বিষয়ে এত অধিক সময় ক্ষেপণ করতে লাগলেন যে, ডাক্তারী ব্যবসায়ে বিশেষ সুবিধে হল না। যা'হোক আবার ভাগ্যফলে তিনি পাডুয়াতে চিকিৎসা বিদ্যার প্রফেসর হিসাবে নিয়োগপত্র পেয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে তিনি গণিত সম্বন্ধে রচনাদি প্রকাশ করতে থাকেন। এর ফলে নিক্কলো ফন্টানা (Niccolo Fontana) নামক একজন গণিতজ্ঞের সঙ্গে পত্রালাপের সুযোগ পেলেন। ফন্টানা তোতলা ছিলেন, তিনি টার্টাগ্লিয়া (Tartaglia=তোত্লা) নামেই অধিক পরিচিত। টার্টাগ্লিয়া ১৫০০ খ্রীস্টাব্দে ব্রেসসিয়া (Brescia)-তে জন্মগ্রহণ করেন। বারো বছর পরে ফরাসিরা যখন এই শহর দখল করে নেয় তখন টার্টাগ্লিয়ার পিতা এবং আরও অনেককে স্থানীয় গীর্জার ভিতরে হত্যা করা হয়। নিক্কলোও মরে গেছে বলে প্রথমে মনে হয়েছিল। পরে তাঁর মা এসে কোনও ক্রমে বাদ-দরজা দিয়ে টার্টাগ্লিয়াকে নিয়ে সরে পড়েন। তাঁর খুলি, চোয়াল আর তালু ফেটে দু'ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। মায়ের চেষ্টা ও যত্নে তিনি বেঁচে উঠলেন বটে, কিন্তু ছিন্ন-তালুর জন্যে অবশিষ্ট জীবন তাঁকে তোতলা হয়েই কাটাতে হয়। এঁরা (মাতা ও টার্টাগ্লিয়া) এমন নিঃস্ব ছিলেন যে, স্লেট কিনতে না পারায় সমাধিফলক খুঁজে এনে তার উপরেই কোনওরকমে জোগাড়-করা একখানা বইয়ের প্রশ্নাবলীর সমাধান লিখতেন। এত বাধা সত্ত্বেও তিনি এরূপ বিদ্যা ও জ্ঞাননিষ্ঠার পরিচয় দেন যে, যথাসময়ে তিনি ভেনিসের অধ্যাপক হয়ে পরে প্রফেসর পদ পর্যন্ত পেয়েছিলেন। এই সময় তিনি নিম্নলিখিত ত্রি-ঘাত সমীকরণ সমাধান করবার একটি উপায় আবিষ্কার করেন। সমীকরণটি ছিল $x^3+ax^2=b$, যার a এবং b যেকোনও দুটো নির্দিষ্ট সংখ্যা।

তখনকার দিনে গণিতজ্ঞের মধ্যে প্রশ্ন সমাধানে পাল্লা দেওয়া-দেওয়ির রেওয়াজ ছিল। টার্টাগ্লিয়া যখন প্রচার করলেন, তিনি উক্ত ধরনের ত্রি-ঘাত সমীকরণের সমাধান করতে পারেন, তখন ফিয়োর (Fiore) নামক একজন অখ্যাত ব্যক্তি তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করলেন। ঠিক হল প্রত্যেকেই ত্রিশটা প্রশ্ন তৈরি করে অপর ব্যক্তির হাতে দেবেন। ত্রিশ দিন সময় দেওয়া হবে, এর মধ্যে যিনি অধিক সংখ্যক প্রশ্নের সমাধান করতে পারবেন, তিনিই জয়ী হবেন এবং কোনও আইনজ্ঞের নিকট নির্দিষ্ট পরিমাণে গচ্ছিত অর্থ পুরস্কার পাবেন। টার্টাগ্লিয়া ত্রি-ঘাত সমীকরণ সমাধানের একটি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন, তাই তিনি দুই ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর সবগুলো অঙ্কের ফল নির্ণয় করে ফেললেন; কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী টার্টাগ্লিয়ার প্রস্তাবিত একটি সওয়ালেরও জবাব বের করতে পারলেন না।

টার্টাগ্‌লিয়া কিছুকাল যাবৎ তাঁর নিয়মটা গোপন রেখেছিলেন। পরে কার্ডান অনেক সাধ্যসাধনা করার পর তিনি কার্ডানের কাছে এটি প্রকাশ করেন — শর্ত ছিল, বিষয়টা যেন অন্যের কাছে প্রকাশ করা না হয়; কিন্তু কয়েক বছর পরে (১৫৪৫ সালে) দেখা গেল কার্ডান নুরেনবার্গ থেকে প্রকাশিত তাঁর 'আর্‌স ম্যাগনা' (Ars Magna) নামক পুস্তকে নিয়মটা উদ্ধৃত করেছেন। এই নিয়ে দুই জনের মধ্যে তুমুল বিতর্ক বেধে গেল। কার্ডান যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিলেন, তাতে কোনও সন্দেহ নাই — যদিও তিনি টার্টাগ্‌লিয়াকে এই নিয়ম আবিষ্কারের আংশিক স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত ঐ নিয়ম কার্ডানের নিয়ম বলেই উল্লিখিত হতে দেখা যায়; সুতরাং টার্টাগ্‌লিয়ার ক্রোধ বা আপত্তিকে অমূলক বলা যায় না।

যা'হোক, উক্ত পুস্তকে ত্রি-ঘাত সমীকরণ ছাড়াও, সমসাময়িক আলজাব্রার যা কিছু জানা ছিল, তার সবকিছু বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছিল। এই পুস্তকেই আমরা সর্বপ্রথম বিয়োগাত্মক মূলের উল্লেখ দেখতে পাই; তিনিই ঋণ-সংখ্যার ধারণা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। মোটের উপর আর্‌স ম্যাগনাতে বর্তমান প্রণালীর মতো অক্ষর-সংকেতের ব্যবহার করা না হলেও, একে আলজাব্রার নবযুগের অগ্রদূত বলা যেতে পারে।

আজ আমরা কার্ডানকে প্রধানতঃ (টার্টাগ্‌লিয়ার আবিষ্কৃত) ত্রি-ঘাত সমীকরণের সমাধান প্রণালীর জন্যই স্মরণ করি; কিন্তু সমসাময়িক কালে তিনি বিশেষ সম্মান পেয়েছিলেন একখানা জ্যোতিষী বইয়ের (Astrology) রচয়িতা হিসাবে। মধ্যযুগে জ্যোতিষশাস্ত্রকে নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানের অন্তর্গত মনে করা হত। ইউরোপের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনকার দিনে গণিত বলতে শুধু জ্যোতিষশাস্ত্রকেই বোঝাতো। অবশ্য, অক্সফোর্ডে জ্যোতিষশাস্ত্রের পরিবর্তে জ্যোতির্বিদ্যা বা নক্ষত্রবিদ্যা (Astronomy) এবং ইউক্লিডের প্রথম দুই খণ্ডের সম্যক জ্ঞানের উপরই জোর দেয়া হত। আমরা দেখতে পাই, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাক্কাল পর্যন্ত অনেক উঁচুদরের গণিতবিদ জ্যোতিষবিদ্যাকে যথার্থ বিজ্ঞান বলেই সমাদর করতেন। ইংলন্ডের বিখ্যাত ব্যঙ্গকার সুইফ্‌ট (Swift) ১৭০৮ সালে জ্যোতিষশাস্ত্রকে ব্যঙ্গ করে একখানা বই লেখেন — 'আইজাক বিকারস্টায় মহোদয়ের রচিত ১৭০৮ সালের ফলাফল নির্ঘণ্ট'। এই মারণ আঘাতেই জ্যোতিষশাস্ত্রের সম্মান বিশেষরূপে ব্যাহত হয়; কিন্তু কার্ডানের সময় ঐ বিদ্যাকে বিস্তর সম্মান ও সমীহ করা হত। কার্ডানের নীতিহীন আচরণের আর একটি নমুনা এই, মার্টিন লুথারের প্রতি তিনি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। এজন্য কুষ্ঠি-পত্রে তাঁর জন্মদিন পরিবর্তন করে তাঁর জন্য এক 'মন্দভাগ্যওয়ালা' কুষ্ঠি রচনা করে দেন। কার্ডান সাধারণ বিজ্ঞানের উপর আরও দুইখানা জনপ্রিয় বই লিখেছিলেন। বর্তমানে অবশ্য তাঁর মতাবলী আমাদের কাছে অদ্ভুত ঠেকে, তবু একথা স্বীকার করতে হবে যে, তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন, পৃথিবীর যাবতীয় সংঘটনই নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই ঘটে থাকে।

কার্ডানের পুস্তকাদির জন্য তাঁর খ্যাতি নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্কটল্যান্ডের সেন্ট য়্যান্‌ড্রুজের আর্চবিশপ হ্যামিলটন তাঁকে ডেকে পাঠান চিকিৎসার জন্য। আশঙ্কা

করা গিয়েছিল যে আর্চবিশপ ক্ষয়রোগে ভুগছেন। কার্ডান বললেন, তিনি ঐ রোগের চিকিৎসা জানেন। সৌভাগ্যের বিষয় আর্চবিশপের ক্ষয়রোগ হয়নি, সুতরাং কার্ডানের মান রক্ষা হল (কারণ, পরে তিনি স্বীকার করেছিলেন, ক্ষয়রোগের চিকিৎসা তিনি জানেন না)। স্কটল্যান্ড থেকে ফিরবার পথে ইংলন্ডের তরুণ রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ড তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। কার্ডান তো রাজার কুষ্ঠিতে সুচতুরভাবে অনেক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা লিখে দিলেন; কিন্তু এক বছরের মধ্যেই রাজার মৃত্যু হলে সব ভবিষ্যদ্বাণী নস্যাৎ হয়ে গেল।

এই দুই ঘটনার — অর্থাৎ না-হওয়া অসুখ সারানো, আর নক্ষত্রের প্রভাব গণনায় নৈপুণ্য দেখানোর পর, তাঁর নিজের নক্ষত্রেরও যেন একটু ক্রুর দৃষ্টি দেখা যায়। তাঁর ছেলেরা তাঁর নামের বেইজ্জতি করে। — একজনের তো খুনী আসামী হিসাবে প্রাণদণ্ডই হয়ে গেল। তিনিও জুয়া খেলার দিকে অধিক ঝুঁকে পড়েন। তাঁর মাথাও খারাপ হয়ে গেল; চাকরি গেল; তারপর পোপের প্রদত্ত ভাতার উপর নির্ভর করে আরও কয়েক বছর বেঁচে থেকে ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে পঁচাত্তর বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পরে তাঁর বহু অপ্রকাশিত লেখার সামান্য কিছু অংশ (এক পঞ্চমাংশেরও কম) ছাপা হয়েছিল। যা'হোক, তিনি নিজে গণিতজ্ঞ হিসাবে কি দান করে গেছেন, তার চেয়ে তাঁর প্রভাবে ভবিষ্যৎ গবেষণার যে ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়েছিল, তারই মূল্য এখন অধিক বলে বিবেচিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভকাল পর্যন্ত একজনের পক্ষেই গণিত ও বিজ্ঞানের সমুদয় নব-আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচিত থাকা, এমনকি কোনও কোনও বিষয়ে নতুন দিক উন্মোচন করাও সম্ভবপর ছিল; কিন্তু আজ গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এতই বিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে, কেউই নিজের ক্ষুদ্র পরিসরের বাইরে অন্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার আশা করতে পারেন না। এমন কি আজকের দিনে 'সব বিষয়েরই কিছু কিছু, আর একটি বিষয়ে সবকিছু জানবার' আর আশা নাই।

এইবার আলজাব্রার অগ্রগতির তৃতীয় স্তর সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। এটি আলজাব্রার অক্ষর-প্রতীক ও বহু ব্যবহৃত চিহ্ন সংক্রান্ত ব্যাপার। আমরা একটি তালিকা প্রস্তুত করে প্রত্যেকটির বিশদ ব্যাখ্যা না করে বরং কয়েকটি সমীকরণের উদাহরণ দিয়ে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বইয়ে যেমন পাওয়া যায় তার বর্ণনা করেই বিষয়টা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করব।

প্রথমে আমরা ১৫৫৯ খ্রীস্টাব্দে লিখিত একটি সমীকরণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লক্ষ্য করি। সমীকরণটি হচ্ছে :

এর মধ্যে আছে, গ্রিক অক্ষর ρ (রো), যাকে ডাইয়োফ্যানটাস লিখতেন ξ (জিটা) রূপে আর বর্তমানে আমরা লিখি x (এক্স) রূপে। এটি অবশ্য অজ্ঞাত বা নির্ণেয় সংখ্যা; আর আছে একটি হীরক-চিহ্ন (diamond) ◊ ; এটি ডায়োফ্যানটাসের সময় লেখা হত Δ^{γ} রূপে, আর আমরা লিখি x^2 রূপে। আগেই বলা হয়েছে x^2 হচ্ছে x সংখ্যার দ্বিতীয় শক্তি।

আর আছে একটা বাক্স বন্ধনীর প্রথমাংশ [; এটি সম্ভবত গ্রন্থকারের নিজের আবিষ্কার। এটা হচ্ছে আমাদের 'সমান চিহ্ন'=।

P অক্ষর রয়েছে চারবার। এটি লাটিন শব্দ Plus-এর আদ্যক্ষর। এটি অবশ্য আমাদের যোগ চিহ্ন। এখন আমরা বর্তমান সংকেত অনুসারে সমীকরণটা লিখে ফেলতে পারি এইভাবে :

$1x^2+6x+9=1x^2+3x+24$, বা $x^2+6x+9=x^2+3x+24$

দ্বিতীয় উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দে লিখিত একখানা ইতালীয় গ্রন্থ থেকে। বর্ণনাটি এই :

এখানে আমরা 'সমান চিহ্ন' দেখছিনে, তার বদলে দেখছি 'equale a' পুরোপুরি লেখা হয়েছে; কিন্তু এতে একটি বৃহৎ পদক্ষেপ দেখতে পাচ্ছি। এই লেখক আমাদের 'x-এর বিভিন্ন শক্তি' প্রকাশের বর্তমান প্রণালীর প্রায় কাছাকাছি এসে গেছেন। এতে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বা 'ঘাত' প্রকাশ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর ব্যবহার না করে একই প্রতীক-এর উপর ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা লিখে বিভিন্ন 'শক্তি' বুঝাচ্ছেন। পূর্ব পৃষ্ঠায় ৩ -এর মানে x^3, অন্যত্র এই গ্রন্থকার x-এর স্থলে ρ না লিখে লিখেছেন ↓ , অর্থাৎ x-এর প্রথম শক্তি। সুতরাং উপরোক্ত সমীকরণটা বর্তমান পদ্ধতিতে লিখলে যে রূপ নেবে, তা হচ্ছে:

$$x^6+8x^3=20$$

তৃতীয় উদাহরণে ১৬২৯ খ্রীস্টাব্দে লিখিত একজন ফরাসি গ্রন্থকারের সমীকরণ দেখানো হচ্ছে : $1(4)+35(2)+24=10(3)+50(1)$

এতে দেখা যাচ্ছে, যোগ চিহ্ন হিসাবে আমাদের বর্তমান চিহ্ন + ব্যবহৃত হয়েছে। একটি সংখ্যা আর একটির সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে, এই কথা বুঝাবার জন্য মধ্যযুগে অনেক সময় লাটিন শব্দ et (এবং) লেখা হত, যেমন 5 et 8; আবার অনেক সময় এর বদলে গিরে দেওয়ার সঙ্কেত & লেখা হত। তাড়াতাড়ি লিখতে গেলে এটি দেখা যায় ৳ -এর মতো; তাই এখন + এর রূপ নিয়েছে। এই সঙ্কেত গণিতজ্ঞেরা সর্বাগ্রে ব্যবহার করেন নাই, — বণিকেরা অনেক আগের থেকেই এই সঙ্কেত ব্যবহার করতেন, তারপর পঞ্চদশ শতাব্দীতে গণিতেও এর ব্যবহার ক্রমশঃ শুরু হয়। আগে গুদাম-বাবুরা 'বাড়তি' বুঝাতে

এই সঙ্কেত ব্যবহার করতেন। যেমন, এক বস্তা মাল যদি ওজনে 2 (পাউন্ড বা অন্য যে কোনও একক) অতিরিক্ত হত, আর 15 পাউন্ড যদি উচিত ওজন হত, তাহলে ঐ বস্তার উপর লেখা পড়ত 15+2। আবার এ-ও দেখা যাচ্ছে, এখানে বর্তমান 'সমান চিহ্ন'ও ব্যবহার করা হয়েছে। এই চিহ্ন প্রথম কখন ব্যবহৃত হয়েছিল, তা-ও নির্ণয় করা যায়। ইংরেজি ভাষায় প্রথম আলজব্রার বই প্রকাশিত হয় ১৫৫৭ খ্রীস্টাব্দে। এর গ্রন্থকার রবার্ট রেকর্ডে (Recorde) লিখেছেন : আমি এই চিহ্নটা ব্যবহার করেছি, 'bicause noe 2 thynges can be more equalle' অর্থাৎ যে কোনও দুটো জিনিস নিন, তারা কখনও (এই দুটো রেখার চেয়ে) বেশী সমান হতে পারে না। এই রবার্ট রেকর্ডে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ উভয়স্থানেই অধ্যয়ন করেছিলেন, পরে শেষোক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৫৪৫ সালে চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেন। পরে তিনি চতুর্থ এডওয়ার্ড ও রানী মেরীরও চিকিৎসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। আবার জীবনের কোনও সময় কিছুকাল আয়ার্ল্যান্ডে একটি সরকারি চাকরিও করেছিলেন। যাহোক, রবার্ট রেকর্ডের আলজব্রা বইয়ের নাম ছিল বুদ্ধির শান (Whetstone of Witte)। বইখানা শেষ হয়েছে নাটকীয় ভঙ্গীতে নিম্নলিখিত কথোপকথন দিয়ে।

শিক্ষক : দেখো তো, দরজায় ঘন ঘন কড়া নাড়ে কে?

ছাত্র : উনি একজন পত্র-বাহক।

শিক্ষক : খবরটা কি, আমার কানে কানে বলো তো। হুঁ, তাই নাকি? তাহলে তো দেখছি আর কোনও উপায় নেই, ঐসব বিপদ থেকে রেহাই পেতে হলে আমার পড়াশুনা, শিক্ষাদান সব ছেড়ে-ছুড়ে দিতে হবে। আরও কিছুদিন শান্তিতে অবসর যাপন করব, এমন বুলন্দ নসিব আমার নয়।

যা হোক, রেকর্ডেকে ধরে নিয়ে জেলে দেওয়া হল — কেউ বলে দেনার দায়ে; কেউ বলে আয়ার্ল্যান্ডে কি সব করে এসেছিলেন তারই জন্য। জেলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এখন ১৬২৯ সালের সমীকরণের দিকে আর এক নজর দেওয়া যাক। সমীকরণটা এই : $1(4)+35(2)+24=10(3)+50(1)$

বলয় বন্ধনীর ভিতর যেসব সংখ্যা আছে, সেগুলো অজ্ঞাত বা নির্ণেয় সংখ্যার 'শক্তি' বা 'ঘাত' প্রকাশ করছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সমীকরণটি দাঁড়ায় :

$$x^4+35x^2+24=10x^3+50x$$

চতুর্থ উদাহরণে আমরা ১৬৩৭ খ্রীস্টাব্দে লেখা বিখ্যাত ফরাসি গণিতজ্ঞ ডেকার্ট-এর একটি সমীকরণ উল্লেখ করি। ডেকার্ট লিখেছেন এইভাবে :

$$yy\}cy-\frac{cx}{b}y+ay-ac$$

ডেকার্টে সর্বদাই সমান চিহ্ন নির্দেশ করতেন বর্তমান ভুজ-বন্ধনীর শেষাংশ (}) দিয়ে। দেখা যাচ্ছে, সপ্তদশ শতাব্দীতে রেকর্ডের সমান চিহ্ন '=' সর্বত্র চালু হয়নি। ডেকার্টের জীবনকালে তাঁর ব্যবহৃত সমান চিহ্নটির বহুল প্রচলন ছিল। আরও এখানে বিয়োগ চিহ্নের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে, এর উৎপত্তি কখন হয়, জানা নেই, তবে বণিকেরা অনেকদিন থেকেই ঘাটতি বুঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহার করতেন। কোনও বস্তা বা গাঁইটের উপর 15—2 লেখা থাকলে বুঝা যেত 15 গজ (বা অন্য কোনও একক)-ই হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু আছে ২ গজ কম। অবশ্য কোনও বণিকই বস্তার উপর '2−15' এর মতো বিভ্রান্তিকর লেখা লিখতে যেতেন না; কারণ এর কোনও অর্থই হয় না; কিন্তু গণিতজ্ঞেরা সমীকরণ সমাধান করতে গিয়ে অনেক সময় এমন অদ্ভুত অবস্থার সম্মুখীন হতেন বই কি! বহু শতাব্দী যাবৎ এসব ব্যাপার অসম্ভব বলে তাঁরা এগুলো অগ্রাহ্য করতেন। ডাইয়োফ্যান্টাসের Arithmetica-তে একটি প্রশ্ন আছে, যা বর্তমান প্রণালী মতে লিখলে দাঁড়ায় 4x+20=4। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, 1, 2, 3, 4... ইত্যাদি সংখ্যা মানের কোনওটি দিয়েই সমীকরণটি মেলে না। তাই ডাইয়োফ্যান্টাস এটাকে অসম্ভব বলে রায় দিয়েছেন। এর বহু পরে সংখ্যা মানের সঙ্গে দিক-এর ধারণা যুক্ত করা হয়। গণিতের ইতিহাসে আমরা বহুবার দেখতে পাই, কোনও এক যুগে কোনও বিশেষ ধারণাকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে; তার কারণ, তাঁদের সময়ে ঐসব ধারণা অসম্ভব বলে বিবেচিত হত। আবার কয়েক যুগ পরে হয়ত সেই ধারণাই অতিশয় স্পষ্ট বলে সকলে মেনে নিয়েছেন। এমনও হতে পারে যে আমাদের নাতিনাতনীরা অবিশ্বাসের হাসি হাসবে যখন তারা বই-পুস্তকে দেখতে পাবে ১৯৬১ সালে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিশিষ্ট গণিতবিদ ছাড়া আর কেউ বুঝতেই পারত না। এমনকি মনীষী ডেকার্ট পর্যন্ত কতকগুলো সংখ্যাকে 'কাল্পনিক' বা 'অবাস্তব' (Imaginary) বলে চিহ্নিত করেছিলেন, আর আজকে সেগুলো ডাল-ভাতের শামিল হয়ে গেছে। এখন আবার ডেকার্টের সমীকরণে ফিরে আসা যাক :

$$yy\} cy - \frac{cx}{by} + ay - ac$$

এখানে a, b, c, x, y এই পাঁচটি অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটিই কোনও না কোনও সংখ্যার নির্দেশক। এই প্রতীক চিহ্নের প্রবর্তন করেছিলেন ভিয়েটা (Vieta) ১৫৯০ খ্রীস্টাব্দে। সর্বদা না হলেও সচরাচর বর্ণমালার শেষের দিকের অক্ষরগুলো অজ্ঞাত সংখ্যার বদলে, আর প্রথমদিকের অক্ষরগুলো, কোনও বিশেষ প্রশ্নে নির্দিষ্ট সংখ্যার বদলে ব্যবহার করা হয়। এসব সংখ্যাকে 'আক্ষরিক সংখ্যা' (Literal number) বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ আক্ষরিক সংখ্যা 'a' বলতে প্রয়োজন মতো কখনও 3, কখনও 10, কখনও বা $\sqrt{3}$... ইত্যাদি বুঝতে হবে। 'a'-এর মান বলে দেওয়া হলে $a^2, a^3, \ldots a^{\frac{1}{3}}$ প্রভৃতির সুস্পষ্ট মান দাঁড়ায়। এই দিক দিয়ে 'a' সংখ্যাটা 'elastic' বা 'বহুমানগ্রাহী'।

সমীকরণটাতে দেখা যাচ্ছে ডেকার্ট y^2 না লিখে yy লিখেছেন। আমরা বর্তমানে দুই বা ততোধিক আক্ষরিক সংখ্যার গুণ বুঝাতে হলে সেই সংখ্যাগুলো পর পর লিখে দেই, এদের ভিতরে কোনও চিহ্ন দেইনে। যেমন $ab=a \times b$, $abc=a \times b \times c$ ইত্যাদি। ডেকার্টের y^2 লেখার প্রণালী এই রীতির একটি উদাহরণ। লক্ষ্য করার বিষয়, আক্ষরিক সংখ্যার সময় ab বলতে $a \times b$ বুঝালেও, পাটীগণিতিক সংখ্যার বেলায় 56 বলতে 5x6 বুঝায় না বরং তখন স্থানীয় মান বিচার করে 6+5x10 বুঝায়, (একথা আগেই বলা হয়েছে)। আবার $3\frac{1}{2}$ এর অর্থ $3+\frac{1}{2}$ হলেও cp বলতে সর্বদাই $c \times p$ বুঝায়। দুই শতাব্দী পূর্বেও y^2 কে yy লেখার রেওয়াজ বেশ চালু ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার কলেজেও x^2 কে xx এবং x^3 কে xxx রূপেই লেখা হত।

এখন দেখা যাক বিয়োগ সংখ্যার ধারণা কেমন করে আসল। হাজার হাজার বছর ধরে আদিম মানুষ কিছুই না (o) থেকে আরম্ভ করে বাড়তে বাড়তে ১, ২, ৩ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে যতদূর ইচ্ছা ততদূর পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা করেছিল। ক্রমে ক্রমে এইসব সংখ্যার আপেক্ষিক স্থান এবং বাড়তির দিক ও ঘাটতির (বিপরীত) দিকের ধারণাও জন্মাল। যখন দেখা গেল ডান দিকে অগ্রসর হতে হতে সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং বাঁ দিকে হটে আসতে আসতে ক্রমশঃ কমে আসে, তখন কোনও দুঃসাহসিক গণিতবিদ ভাবলেন, ডান দিকে যখন বহুদূর পর্যন্ত যাওয়া যায়, বাঁ দিকেই বা যাওয়া যাবে না কেন?

$$\ldots -4 -3 -2 -1\ 0\ \ 1\ 2\ 3\ 4\ldots$$

আর শূন্যে এসেই বা থেমে যাবে কেন? তখন সদৃশ যুক্তি দিয়ে যোগ সংখ্যার মতো বিয়োগ সংখ্যারও কল্পনা করা হল; এগুলো সবই শূন্যের থেকে কম এবং যতই বাঁ দিকে যাওয়া যায়, সংখ্যাগুলো ততই কমতে থাকে। অন্য কথায় সংখ্যার ক্রম এবং দিক সম্বন্ধে ধারণাটা একটু পাকা হবার পরেই ঋণ-সংখ্যা বা বিয়োগ-সংখ্যার ধারণা করতে আর কোনও বাধা রইল না। তখন ডাইয়োফ্যান্টাসের সমীকরণ :

$4x+20=4$ এরও একটা মানে বেরিয়ে পড়ল।

x কে যদি আমরা − 4 বলি, তাহলে চারবার − 4 গেলে, ঘাটতির দিকে − 16 তে পৌছা গেল, অর্থাৎ সংখ্যা স্কেলের ঋণের দিকে ১৬ পর্যন্ত যাওয়া হল। তারপর যদি ডান দিকে কুড়ি ঘর যাওয়া যায়, তাহলে শেষে সংখ্যা-স্কেলের +4-এ গিয়ে থামা যাবে। সুতরাং ডাইয়োফ্যান্টাসের সমীকরণে নির্ণেয় সংখ্যাকে ঋণের দিকে বা ঘাটতির দিকে (অর্থাৎ −4) ধরলে সমীকরণটির শর্ত পূর্ণ হয়। এ সম্ভব হল এক দিকে বিস্তৃত সংখ্যার ধারণাকে বর্ধিত করে উভয় দিকে বিস্তৃত সংখ্যার ধারণা করার ফলে। অবশ্য দিক বলতে শুধু ডান বা বাঁ বোঝায় না, — উত্তর-দক্ষিণ; পূর্ব-পশ্চিম; উপর-নীচ প্রভৃতি যে কোনও বিপরীত দিকই বোঝাতে পারে। এখন আমাদের কাছে মনে হয়, এ আর এমন কি ব্যাপার? স্পষ্টই তো বোঝা যাচ্ছে; কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে এই ধারণায় আসতে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের হাজার হাজার বছরের কঠিন চিন্তা ও কল্পনা-শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল।

সদিক সংখ্যার ধারণার সঙ্গে ঘূর্ণনেরও সম্বন্ধ রয়েছে। ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকের ঘুরনকে সোজা ঘুরন বা যোগ ঘুরন বললে, ঘড়ির কাঁটার দিকের ঘুরনকে উল্টো বা বিয়োগ ঘুরন বলতে হয়। এইসব ধারণার বিকাশ হওয়াতে গাণিতিক গবেষণার ক্ষেত্র অনেক প্রসারিত হয়েছে। আগেকার গাণিতিকদের কাছে এইসব ধারণা অজ্ঞাত থাকায়, তাঁদের গবেষণার ক্ষেত্রও অনেক সংকীর্ণ ছিল। আমরা আগেই দেখেছি কার্ডান (ষোড়শ শতাব্দীতে) বিয়োগ-সংখ্যার ব্যবহার করেছেন। ১৬১৪ খ্রীস্টাব্দে নেপিয়ারের লেখা থেকে জানা যায়, তাঁর সময় শূন্যের চেয়েও কম সংখ্যাকে বিয়োগ সংখ্যা বলা হত। নেপিয়ার বিয়োগ-সংখ্যাকে সমপরিমাণ যোগ-সংখ্যা বৃত্তাকারে দুই সমকোণ ঘুরে ঠিক বিপরীত অবস্থানে পৌছালে যা হয় সেই সংখ্যারূপেও কল্পনা করেছেন; অর্থাৎ একটি সংখ্যাকে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধিস্থ যেকোনও বিন্দু পর্যন্ত টানা সরলরেখা দ্বারা নির্দেশিত করলে ঐ ব্যাসার্ধটি যখন অর্ধ-বৃত্ত পরিমাণ ঘুরে ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত হয়, তখন এই শেষোক্ত ব্যাসার্ধটি হবে সম-পরিমাণ বিয়োগ সংখ্যা।

যদি OP=n হয়,
তবে OP$'$= - n

অনেক সময় মূল বিন্দু O-কে শূন্য ধরে P বিন্দুকে বলা হয় n এবং P$'$ বিন্দুকে বলা হয় - n। খুব সম্ভব, বিয়োগ সংখ্যার এই ধারণাই পরিণামে সদিক সংখ্যা বা Vector-এর ধারণা উদ্ভবের সাক্ষাৎ কারণ।

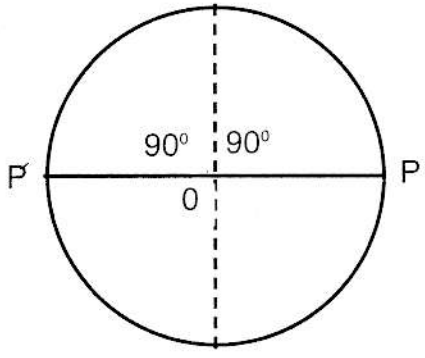

আলজাব্রায় ব্যবহৃত প্রতীকের অভিব্যক্তির ইতিহাসে ফরাসি গাণিতিক ভিয়েটা (Francois Vieta)-র নামোল্লেখ না করলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দে পুরাতন পয়টু (Poitou) প্রদেশে। তিনি ছিলেন সমৃদ্ধিশালী লোক, বহু বছর যাবৎ আইন-ব্যবসা করেছেন। অবসর সময়টা তিনি থেলিস-এর মতোই গণিতচর্চায় কাটিয়ে দিতেন। তিনি অতিশয় সদাশয় ও দয়ালু লোক ছিলেন। একসময় তিনি কোনও এক বৈজ্ঞানিককে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত নিজের বাড়ীতে রেখে তাঁর যাওয়ার সময় যাতায়াত খরচা পর্যন্ত দিয়েছেন; অথচ তিনি ভিয়েটার মতের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। তিনি নিজের খরচায় বই ছাপিয়ে ইউরোপের সর্বত্র গণিতজ্ঞদের কাছে পাঠাতেন।

আলজাব্রায় প্রতীক ব্যবহারের যেসব উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তারমধ্যে ভিয়েটার বিশিষ্ট প্রয়োগের উদাহরণ দেওয়া হয়নি। ভিয়েটা ১৫৯০ খ্রীস্টাব্দের আগে থেকেই অক্ষর-প্রতীক ব্যবহার করে আসছিলেন। পরে ডেকার্ট তা গ্রহণ করেন। ভিয়েটা 'প্রদত্ত'

বা 'নির্ণেয়' সকল সংখ্যাই অক্ষর দিয়ে নির্দেশ করতেন, তবে তাঁর রীতি ছিল স্বরবর্ণগুলো (a, e, i, o, u, y) অজ্ঞাত সংখ্যার জন্য, আর ব্যঞ্জন বর্ণগুলো জ্ঞাত সংখ্যার স্থলে ব্যবহার করতেন। জন ওয়ালিস (John Wallis) বিশেষভাবে এই কথার উল্লেখ করেছেন। ইনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির জ্যামিতির প্রফেসর ছিলেন এবং পরবর্তীকালে নিউটনকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। ভিয়েটা যে শুধু অক্ষর-প্রতীক ব্যবহারেরই পথ-প্রদর্শক ছিলেন তা নয়; তিনি একখানা আলজাব্রার বইও লেখেন– নাম Art of Analysis (বিশ্লেষণের ব্যবহারিক প্রয়োগ) এবং আর একখানা Theory of equations বা সমীকরণ তত্ত্ব, যেখানা তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। তিনিই আলজাব্রার নিয়মে সর্বপ্রথম সীমাভিসারী (Convergent) জ্যামিতিক শ্রেণীর যোগফল নির্ণয়ের সূত্র আবিষ্কার করেন। যথা :

$$1+(\frac{1}{4})+(\frac{1}{4})^2+(\frac{1}{4})^3+.....+(\frac{1}{4})^n+..... = \frac{1}{1-\frac{1}{4}}$$

এ-রকম শ্রেণীর যোগফল ইতিপূর্বে আর্কিমিডিস নির্ণয় করেছিলেন জ্যামিতিক পদ্ধতিতে। উপরোক্ত শ্রেণীর প্রথম রাশিকে a এবং সাধারণ অনুপাতকে $r(<1)$ বললে সূত্রটা দাঁড়ায় এইরকম : $a+ar+ar^2+ar^3+...+ar^n+... = \frac{a}{1-r}$

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জ্যামিতির মতো আলজাব্রারও যে কোনও কোনও শ্রেণীতে রাশিগুলোর মধ্যে কোনও বিশেষ গঠনপ্রকৃতি থাকতে পারে, এ-কথা ভিয়েটাই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে তাঁর এই আবিষ্কার অনেক ফলপ্রদ হয়েছে।

তিনিই সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, জ্যামিতিক চিত্রাঙ্কন ও মাপন ছাড়া অন্য উপায়েও শুধু গাণিতিক হিসাবের সাহায্যেই π-এর মান নির্ণয় করা যায়। তিনি দেখিয়েছেন,

$$\frac{2}{\pi} = \sqrt{\frac{1}{2}}\cdot\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}\cdot\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}}\cdots$$

আলজাব্রার অক্ষর-প্রতীকের বিকাশ হওয়াতেই আজ যাকে আমরা Analysis (আলজাব্রার ভিত্তি-বিচার) বলি, তার উৎপত্তি হয়েছে। পাটীগণিত আর আলজাব্রার মধ্যেকার সীমারেখা নির্দিষ্ট করা বেশ কঠিন। বোধ হয়, উদাহরণ দিয়েই এই পার্থক্যের প্রধান বিষয়ের উপর আলোকপাত করা সহজ। প্রথমে একটি ৪ ইঞ্চি লম্বা আর ৩ ইঞ্চি প্রস্থওয়ালা আয়তক্ষেত্রের কালি বের করতে হলে একে ১ ইঞ্চি লম্বা আর ১ ইঞ্চি চওড়া ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত করে দেখা যায় যে প্রত্যেক সারিতে লম্বাইয়ের দিকে পর পর চারটি বর্গক্ষেত্র আছে, আর সমস্ত আয়তক্ষেত্রের মধ্যে এইরকম তিনটি সারি আছে। এর থেকে গুণে দেখা গেল যে মোট ৪ × ৩ টি বর্গক্ষেত্র আছে। এটি পাটীগণিতের ব্যাপার। এর পরে আসছে আলজাব্রার ব্যাপার। তখন আর ৪ ও ৩-এর কথা ভাবছিনে, যেকোনও আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যকে a এবং প্রস্থকে b ধরলে আমরা উপরোক্ত চিন্তা-প্রণালীর সঙ্গে মিলিয়ে লিখে ফেলি, কালি=দৈর্ঘ্য×প্রস্থ। অর্থাৎ $A=ab$।

এই ধরনের প্রশ্নের সমাধানে যে আসল বা নিত্য-উপস্থিত (essential) চিন্তাধারা ক্রিয়া করছে তা এই : যে সাধারণ বিচারপদ্ধতি বহু সংখ্যক বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিবারই একইরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, তা ঐরূপ সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে হলে কেবল, বিশেষের স্থলে নির্বিশেষ বা সাধারণ প্রতীক ব্যবহার করে পূর্বোক্ত বিচারপদ্ধতি অনুসরণ করলেই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে। এখন বলা যায়, প্রথম সিদ্ধান্তগুলো পাটীগাণিতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং শেষোক্ত সাধারণ সিদ্ধান্ত আলজাব্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে পাওয়া গিয়েছে।

প্রতীক ব্যবহার করে বহু জটিল গাণিতিক বিচার সহজ ও সংক্ষেপ করে ফেলা হয়েছে। এর জন্য ভাল করে আলজাব্রিক প্রতীক-ভাষা আয়ত্ত করা প্রয়োজন। পাঠক হয়ত লক্ষ্য করেছেন, ভিয়েটা তাঁর বইয়ের নাম Art of Algebra না বলে Art of Analysis বলেছেন। তিনি ইচ্ছে করেই এমন করেছিলেন। তাঁর এ ইঙ্গিত পুরোপুরি না হলেও আংশিকভাবে গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে Analysis বলতে উচ্চাঙ্গের আলজাব্রার কোনও কোনও বিশেষ বিভাগ বুঝায়, যেমন Calculus অর্থাৎ হিসাব-প্রক্রিয়া-বিচার। আজকাল আলজাব্রা ছাড়াও মিশ্রগণিত এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও Analysis বা ভিত্তি-বিচার প্রযুক্ত হচ্ছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ত্রিকোণমিতির অভ্যুদয়

আমরা বর্তমানে যাকে ত্রিকোণমিতি বলি, তা আলজাব্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এভাবে ধরলে ত্রিকোণমিতি অষ্টাদশ শতকের আগে আরম্ভ হয়েছে বলা যায় না; কিন্তু ত্রিকোণমিতিকে জ্যামিতির সঙ্গে সম্পর্কিত মনে করলে, এর উৎপত্তি আর বিকাশ হয়েছিল গ্রিক জ্যোতির্বেত্তা আর গাণিতিকদের আমলে অর্থাৎ খ্রীস্টীয়-অব্দ আরম্ভ হবার দুইশো বছর আগের থেকে দুইশো বছর পরে পর্যন্ত সময়ের মধ্যে। আর যদি একে শব্দার্থ বিচার করে 'তিন কোণের পরিমাপ' বিদ্যা বলে মনে করা হয়, তাহলে বলতে হবে, এর প্রারম্ভকাল অনুমান খ্রীস্টপূর্ব দুই হাজার বছরের কাছাকাছি কোনও সময়। যাহোক, এই বিদ্যার 'ত্রিকোণমিতি' নাম দেওয়া হয়েছে ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে পিটিস্‌কাস্‌ নামক একজন গণিতজ্ঞের দ্বারা।

স্পষ্টই বোঝা যায়, প্রাচীন পিরামিড যাঁরা তৈয়ার করেছেন তাঁরা অবশ্যই কোণের পরিমাপ করতে পারতেন; কিন্তু এইটুকু ক্রিয়াজ্ঞানের অধিক এমন কিছু তাঁরা আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন বলে জানা যায়নি, যাকে জ্যামিতির সীমা ছাড়িয়ে ত্রিকোণমিতি বলে যথার্থই অভিহিত করা যেতে পারে। অবশ্য, আহমিস্‌-এর পাপিরাসে 'সেক্‌ত' বা 'সেকেত্‌' বলে একটা শব্দ আছে; কিন্তু তার মানে সুস্পষ্ট নয়। খুব সম্ভব, সেকেত্‌-এর অর্থ 'পিরামিডের গাত্র-তলগুলো সবই সমতল ভূমির সঙ্গে সমানভাবে কাত হয়ে ওঠা' বোঝায়। তবে এটা ঠিক যে তাঁরা সময় অনুসারে ছায়ার দৈর্ঘ্য-পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির বিষয় অবগত ছিলেন। পরে আরবীয়েরা এই জ্ঞানকে ভিত্তিস্বরূপ ব্যবহার করে ত্রিকোণমিতির কতকগুলো তথ্য আবিষ্কার করেন এবং ত্রিকোণমিতিক যন্ত্রাদিও উদ্ভাবন করেন।

জ্যামিতিক তথ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ত্রিকোণমিতিক জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে আরিস্টার্কাস (Aristarchus), হিপার্কাস (Hipparchus), মেনেলাস (Menelaus) ও টলেমি (Ptolemy), এই চারজন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ জ্যোতির্বিদের নাম করতে হয়। মানব-সভ্যতার গোড়া থেকেই আকাশের তারার দিকে চেয়ে মানুষ একটি গোলকের কল্পনা করেছে যা আমাদের পৃথিবীকে চারদিকে ঘিরে রেখেছে এবং যার ভিতরের পৃষ্ঠে তারাগুলো যেন বিঁধানো রয়েছে। আমরা আগেই দেখেছি, আর্কিমিডিস ও এপোলোনীয়দের সময়েই জ্যামিতি উন্নতির প্রায় চরম সীমায় উঠে গিয়েছিল; আর শুধু

জ্যামিতির সাহায্যেই সংখ্যা-বিদ্যা সম্বন্ধীয় জ্ঞানও সঞ্চিত হচ্ছিল, যা পরবর্তীকালে আলজাব্রার প্রতীক পদ্ধতি অনুসারে পুনর্লিখিত হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে, আর্কিমিডিসের মৃত্যুর পর থেকে অক্ষরপ্রতীক-পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রায় আঠারশো বছরের মধ্যে 'বিশুদ্ধ গণিত'-এর কোনও অগ্রগতি হয়নি বললেই চলে, তবে এই সময়ে শুধু জ্যামিতিক জ্ঞানের সাহায্যে জ্যোতির্বিদ্যার যতটুকু উন্নতি করা সম্ভব তা করা হয়েছিল।

খ্রীস্টপূর্ব ২৮০ সালে স্যামস্-এর অধিবাসী গ্রিক গণিতজ্ঞ আরিস্টার্কাসই সর্বপ্রথম কর্কটক্রান্তি (বা গ্রীষ্ম-ক্রান্তি) লক্ষ্য করেন। এর একশো পঁয়তাল্লিশ বছর পরে হিপার্কাস এই কথা উল্লেখ করেন। এর থেকে অনুমান করা যায় যে আরিস্টার্কাস আর্কিমিডিসের চেয়ে পঁচিশ বছরের বড় এবং ইউক্লিডের চেয়ে কয়েক বছরের ছোট ছিলেন। বর্তমানে আমরা এঁকে গণিতজ্ঞ হিসাবে নয়, বরং একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ হিসাবেই স্মরণ করি; কারণ তিনিই সর্বপ্রথম সিদ্ধান্ত করেন যে সূর্য স্থির আছে আর পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। অবশ্য, তাঁর যুগে তিনি প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ বলেই পরিচিত ছিলেন।

তাঁর লেখা মাত্র একখানা বই 'চন্দ্র ও সূর্যের আয়তন ও দূরত্ব' পাওয়া গেছে। পৃথিবীর ঘূর্ণন ও পরিক্রমণ সম্বন্ধে তাঁর মতামতের বিষয় আর্কিমিডিস উল্লেখ করেছেন 'Sand Reckoner' (বা বালু গণনা) নামক পুস্তকে। এই বইয়ে আর্কিমিডিস নির্ণয় করতে চেয়েছেন বিশ্ব-সংসারে মোট কতটি বালু-কণা আছে। অবশ্য এতে তাঁর আবিষ্কৃত বৃহৎ সংখ্যা লিখনপদ্ধতিও কাজে লেগেছিল। বিশ্ব-সংসার বা জগৎ সম্বন্ধে আলোচনাকালে তিনি আরিস্টার্কাসের মত উল্লেখ করে বলেছেন, এ মত আরিস্টোটলের মতের বিরুদ্ধ। আরিস্টার্কাস বলেছিলেন, 'নিশ্চল তারাগুলো অনড়, সূর্যও অনড়, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে বৃত্তাকারে ঘোরে, আর সূর্য পৃথিবীর কক্ষ-বৃত্তের কেন্দ্রে অবস্থিত রয়েছে।' এই বর্ণনায় বৃত্তের স্থলে 'বৃত্তাভাস' লিখলেই আধুনিক মতবাদের সঙ্গে মিলে যায়। খ্রীস্টপূর্ব প্রায় পাঁচশো বছর আগে পিথাগোরাসের কোনও শিষ্য বলেছিলেন, 'তর্কশাস্ত্রের যুক্তি-নির্ভর সিদ্ধান্ত যত বিশ্বাসযোগ্য, আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য ততটা নয়।' এক্ষেত্রে তাই প্রমাণিত হয়েছে।

আরিস্টার্কাস চিন্তার দিক দিয়ে আঠারশো বছর অগ্রবর্তী ছিলেন। বৈজ্ঞানিকেরা ১৫৪৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মত সমর্থন করেন, কিন্তু জনসাধারণের পক্ষে এ মত গ্রহণ করতে আরও কয়েক শতাব্দী লেগেছিল। ১৪৯৯ খ্রীস্টাব্দে নিকোলাস কোপার্নিকাস (Nicolus Copernicus) নামক পোলান্ড দেশীয় একজন ছাত্র (যাঁর পিতা জার্মান বংশোদ্ভূত ছিলেন বলে জার্মানীও কোপার্নিকাসকে নিজেদের লোক বলে দাবী করে) প্যাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় ডিগ্রী গ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম ছিল নিকোলাস কপার্নিগ (Nicolaus Koppernigh)। তিনি চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে গণিতবিদ্যায়ও ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমান যুগে আশ্চর্য ঠেকে, একই ছাত্র কেমন করে একই সময়ে দুটো বিষয়ে ডিগ্রী লাভ করতে পারে? মনে রাখতে হবে যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে গণিতবিদ্যা বলতে

প্রধানত জ্যামিতি আর জ্যোতির্বিদ্যা বুঝাতো, চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞানও তেমন বিস্তীর্ণ ছিল না, আর ডিগ্রী পেতে হলে ক্লাসে উপস্থিত থাকলেই চলতো, এখনকার মতো লিখন পরীক্ষার কড়াকড়ি ছিল না; কিন্তু তাই বলে, গণিতবিদ্যায় কোপার্নিকাসের যে গভীর জ্ঞান ছিল তাতে সন্দেহ করবার কোনও কারণ নেই। আজও তিনি সর্বকালের জ্যোতির্বিদ্‌দের মধ্যে অন্যতম বলে পরিগণিত। প্যাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যক্ষতা করেই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর গণিতবিদ কার্ডান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১৫৪৩ খ্রীস্টাব্দে কোপার্নিকাস যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সেই সময় তাঁর সদ্যপ্রকাশিত ছাপার বই তাঁর হাতে দেওয়া হয়। এ বই আজ বিশ্ববিখ্যাত। খ্রীস্টীয় অব্দ প্রবর্তনের প্রায় তিনশো বছর পূর্বে আরিস্টার্কাস যে মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন এই পুস্তকে সেই মতবাদ পুনরুজ্জীবিত হল। মধ্যবর্তী আঠার শতাব্দী ধরে লোকে আরিস্টোটলের মতই আঁকড়ে ধরে ছিল।

কোপার্নিকাসের মতবাদ (বা, সুবিচার করতে হলে, আরিস্টার্কাসের মতবাদ) বহুকাল যাবৎ সাধারণ লোক-সমাজে গৃহীত হয়নি। তার কারণ, একে তো এটা আমাদের ইন্দ্রিয়ের সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতার বিপরীত, তার উপর রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকেরা এ মত চাপা দেবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন। এমনকি ১৬৩৩ সালেও এরা Inquisition বা শাস্ত্র-বহির্ভূত মতবাদের দলন সংস্থার ভয় দেখিয়ে গ্যালিলিওকে এই মতবাদের পোষকতা প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছিলেন। ধর্মযাজকদের মধ্যেও কেউ কেউ মনে মনে এই মতের সত্যতা অনুভব করলেও প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করেছেন। তাঁদের ভয় ছিল, 'বিশ্বজগতের কেন্দ্রস্থলে মানবের অধিষ্ঠান' — এই ধারণা বিদূরিত হলে তাঁদের অনুবর্তীদের ধর্মবিশ্বাস বা ঈমান দুর্বল হয়ে পড়বে।

আবার শেক্সপিয়রও ১৫৯৬ সালে 'ভেনিসের সওদাগর' নাটকে লিখেছেন 'ঐ দেখ আকাশের মেঝেটা উজ্জ্বল সোনার চুমকি দিয়ে কেমন সুন্দর কাজ করা। এমন একটাও তারা দেখতে পাবে না যার গতিতে সুমিষ্ট দিব্য-সঙ্গীত উৎপন্ন হয় না'। এর থেকে দেখা যায়, তিনি তখনও আরিস্টোটলের মতই আঁকড়ে রয়েছেন। সুতরাং নিঃসন্দেহেই আরিস্টার্কাস পৃথিবীর গতি সম্বন্ধীয় ব্যাপারে তাঁর যুগের থেকে মানসিক উৎকর্ষে প্রায় আঠারশো বছর অগ্রবর্তী ছিলেন।

আরিস্টার্কাস যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করে পৃথিবীর আয়তন ও চন্দ্র-সূর্যের দূরত্ব নির্ণয় করেছিলেন তার থেকেই প্রকৃত ত্রিকোণমিতির সূচনা হয়েছে বলা যায়। আরিস্টার্কাসের চিন্তার ধারাটা এইরকম : চাঁদ সূর্যের কিরণ পেয়ে উজ্জ্বল হয় বলেই আমরা পৃথিবী থেকে তাকে উজ্জ্বল দেখি। এর থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, আমরা যখন আকাশে আধখানা চাঁদ দেখি, সে সময়ে সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল যোগ করে যে ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়, তার চন্দ্রস্থ কোণ অবশ্যই একটি সমকোণ হবে। এরপর তিনি এক উপযুক্ত সকাল দেখে পরীক্ষা করলেন। আরিস্টার্কাসের কাছে কোণ-মাপক নিখুঁত যন্ত্র ছিল না, তিনি আন্দাজ করলেন উপরোক্ত ত্রিভুজের পৃথিবীস্থ কোণটি ৮৭° ডিগ্রী, সুতরাং সূর্যস্থ

কোণ ৩° ডিগ্রী হবে। এর থেকে তিনি ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সাহায্যে নির্ণয় করলেন যে পৃথিবী থেকে চাঁদ যত দূরে, সূর্য তার থেকেও আঠার থেকে কুড়ি গুণ অধিক দূরে অবস্থিত। অবশ্য, কোণের মাপ ত্রুটিপূর্ণ হওয়াতে তাঁর সিদ্ধান্ত ঠিক হয়নি। আসলে সূর্যস্থ কোণ ৩° ডিগ্রীর স্থলে মাত্র ৮'৮৬ (মিনিট) হবে। এই শুদ্ধতর তথ্য থেকে হিসাব করলে তিনি অবশ্যই পেতেন, সূর্যের দূরত্ব চাঁদের দূরত্বের প্রায় ৩৮৮ গুণ। যাহোক, তিনি যে প্রণালীতে হিসাব করেছিলেন তা সত্যই নির্ভুল এবং বর্তমান ত্রিকোণমিতির একটা মূলীভূত ধারণা। অবশ্য তখনকার দিনে বৃত্তচাপের দ্বারা কোণ মাপবার প্রণালী আবিষ্কৃত হয়নি, তবু বৃত্তচাপ ও চাপের জ্যা-এর মধ্যকার সম্পর্ক থেকেই তিনি যে জটিল যুক্তি প্রয়োগে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তা অতিশয় বিস্ময়কর।

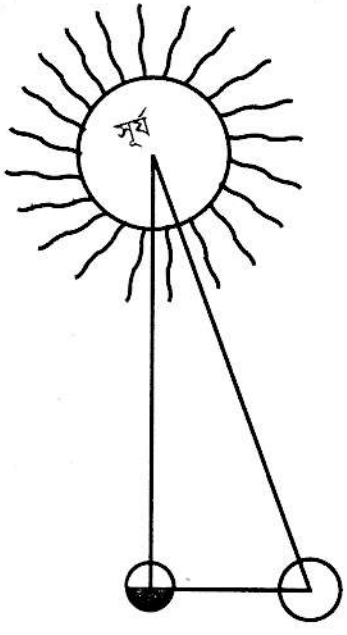

এখানে স্পষ্টতার জন্য পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব অতিরিক্ত বাড়িয়ে দেখান হয়েছে। সূর্যস্থ কোণ আসলে এক ডিগ্রীর ষষ্ঠাংশ মাত্র।

আরিস্টার্কাসের কাছে যে আভাস পাওয়া গিয়েছিল তা আর একটু স্পষ্টায়িত করেন হিপার্কাস (Hipparchus) প্রায় দেড়শো বছর পরে। হিপার্কাসের বিস্তৃত জীবন-পরিচয় পাওয়া যায় না। আমরা কেবল জানি, তাঁর জন্মভূমি বিথাইনিয়ার (Bithynia) অন্তর্গত নাইসেইয়া (Nicaea) নগরে, আর তাঁর গাণিতিক গবেষণা খ্রীস্টপূর্ব ১৬১ সাল থেকে ১২৬ সালের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্লুটার্কের ইতিহাসে তাঁর নাম উল্লিখিত হয়নি; কারণ তিনি তো আর বিখ্যাত যোদ্ধা, কূটনীতিক বা বক্তা ছিলেন না; তিনি ছিলেন মাত্র সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ আর ত্রিকোণমিতির জনক। প্লুটার্কের কাছে এসব গুণের অবশ্যই কোনও অর্থ থাকবার কথা নয়। হিপার্কাসের বইয়ের হাওলা দিয়েছেন পরবর্তী অনেক বিখ্যাত গণিতবিদ আর জ্যোতির্বিদ। তাঁদের মধ্যে টলেমি অন্যতম। হিপার্কাস আটশো স্থির নক্ষত্রের অবস্থান তালিকা বা ক্যাটালগ দিয়েছিলেন। টলেমি এই ক্যাটালগ ব্যবহার করেছিলেন। এই ক্যাটালগে প্রত্যেকটি তারার অবস্থান আকাশ-গোলকের (Celestial globe) উপরকার কৌণিক দূরত্ব দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। বর্তমানে আমরা যে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ (latitude ও longitude) বলি, এ-ও ঠিক তাই। ইনি

ছিলেন গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ ভূগোলবিদ্ — আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ও গণিত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রাজা টলেমি অবশ্য অন্য ব্যক্তি।

ইউরোপের রোমান সম্রাটগণ যদি হিপার্কাসের একটি মূল্যবান আবিষ্কারের প্রতি মনোযোগ দিতেন, তাহলে পঞ্জিকার বছর-গণনায় অনেক অস্পষ্টতা ও গোলযোগের মীমাংসা হয়ে যেত। পৃথিবীটা সূর্যের চারিদিকে এক চক্কর দিতে যে সময় লাগে, তাই একবছর; আর এই সময়ের মধ্যে নিজের অক্ষের উপর যত পাক ঘুরে আসে তাই হল এক বছরের দিনের সংখ্যা। অবশ্য, এই হিসাব করতে আরিস্টোটলের মতানুসারে সূর্যই পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরুক, কিংবা আরিস্টার্কাসের মত অনুসারে পৃথিবীই সূর্যের চারপাশে ঘুরুক, তাতে কিছু আসে যায় না। হিপার্কাস অবশ্য আরিস্টোটলের ভ্রান্ত মতই গ্রহণ করেছিলেন।

উত্তর গোলার্ধের একটি খাড়া খুঁটির মধ্যদিনের ছায়া যে মকর ক্রান্তিতে সবচেয়ে বড় আর কর্কট ক্রান্তিতে সবচেয়ে ছোট হয়, এ তথ্য প্রথমে কে লক্ষ্য করেছিলেন, তা এখন আর জানবার উপায় নেই। হিরোডোটাস বলেন, গ্রিকরা বাবিলনীয়দের কাছ থেকেই ছায়া-ঘড়ির ব্যবহার শিখেছিলেন; অথচ এই যন্ত্র খ্রীস্টপূর্ব দেড় হাজার সালেও মিসরীয়রা ব্যবহার করতেন, কালের ব্যবধান নির্ণয়ের জন্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভূপ্রোথিত কাঠির হ্রস্ব-দীর্ঘ ছায়ার দৈনিক তালিকা রেখে হ্রস্বতম মধ্যাহ্ন-ছায়া প্রথমে বৃদ্ধি পেয়ে আবার হ্রাস পেতে পেতে যতদিনে আবার হ্রস্বতম হয়ে পড়ত, তাকে একবছর বলে গণ্য করা হত। আবার, প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছায়ার দৈর্ঘ্য ও অবস্থান দেখে দিবসের ঘণ্টা নির্ণয় করা হত।

হিপার্কাস জানতেন ২৮০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে কর্কট ক্রান্তিতে ছায়া কাঠির মধ্যাহ্ন ছায়া কোন্ তারিখে হ্রস্বতম হয়, আরিস্টার্কাস তার বিবরণ লিখে রেখে গিয়েছিলেন। এর ১৪৫ বছর পরে (১৩৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) হিপার্কাস লক্ষ্য করলেন যে ৩৬৫১/৪ দিনকে এক বছর ধরে হিসাব করলে যখন মকর ক্রান্তি হওয়ার কথা, তার প্রায় ১১ ঘণ্টা পূর্বেই মকরক্রান্তি ঘটে গেল। এর থেকে তিনি হিসাব করে দেখলেন যে বছরের পরিমাণ ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা না হয়ে বরং ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট ১২ সেকেন্ড হবে। বর্তমান সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে হিসাব করে দেখা গেছে যে, বছরের প্রকৃত দৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড; অর্থাৎ হিপার্কাসে ভুল হয়েছিল মাত্র ৬ মিনিট ২৬ সেকেন্ড।

খ্রীস্টপূর্ব ৪৬ অব্দে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার পঞ্জিকার সংস্কার করেন। তখন জুলিয়াস সিজার ও তাঁর সহকারী জ্যোতির্বিদ সোসিজেনিস (Sosigenes) স্থির করলেন সাধারণ বছর ৩৬৫ দিনেই ধরা হবে, তবে চার বছর পর পর বিশেষ (লম্ফ) বছর ৩৬৬ দিনে ধরা হবে। প্রকারান্তরে তাঁরা ৩৬৫১/৪ দিনের সাধারণ হিসাবকেই গ্রহণীয় মনে করলেন। এই সূত্রে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই সময় জুলিয়াস সিজার পঞ্চম রোমান মাস কুইন্টাইলিস-কে 'জুলিয়াস' নাম দিলেন। তাই এখনও আমরা ঐ মাসকে জুলাই মাস বলে থাকি। তিনি আরও ঘোষণা করলেন যে তৎকালীন একাদশ মাস

'জানুয়ারিয়াস' থেকেই বছর গণনা শুরু হবে। [দ্রষ্টব্য : 'জেনাস' (Jenus) ছিলেন প্রাচীন ইটালীয় দেব, যাঁর হাতে নগরের ফটক ও দ্বার রক্ষার ভার। তাঁকে চিহ্নিত করা হত মাথার সামনে পিছনে দুই দিকেই চোখ-মুখ দিয়ে। তাঁর নামেই একাদশ মাসের নাম ছিল জানুয়ারিয়াস।] পূর্বে বছর শুরু হত মার্চ থেকে সেখান থেকে গুণে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নবেম্বর, ডিসেম্বর সত্যই সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম মাসের নাম ছিল; কিন্তু বর্তমানে ঐ মাসগুলোর নাম বদল না হয়েও হয়ে পড়েছে বর্তমান বছরের যথাক্রমে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ মাস। প্রসঙ্গক্রমে আরও উল্লেখ করা যায় যে পরবর্তী সম্রাট অগাস্টাস সিজারও ছাড়বার পাত্র ছিলেন না; তাঁর প্রস্তাবমতো রোমান বছরের ষষ্ঠ মাস সেক্সটিলিস (Sextilis)-এর নাম পালটে নতুন নাম রাখা হল অগাস্ট (August)। এখানে আরও স্মর্তব্য যে জুলিয়াস সিজার নিজের নামীয় মাসের স্থিতিকাল ৩১ দিন বরাদ্দ করেছিলেন, সেই কারণে পরবর্তী অগাস্ট মাসকেও ৩১ দিনের মাস বলে স্বীকার করতে হয়েছে। বছরের ৩৬৫ দিন ঠিক রাখতে গিয়ে বেচারা ফেব্রুয়ারী মাসকেই সব আব্দার সহ্য করে ছোট হতে হয়েছে। যাহোক, সান্ত্বনা হিসাবে 'লক্ষ বছরের' হিসাবে বাড়তি দিনটা এই মাসেই বরাদ্দ করা হয়েছে।

জুলিয়ান পঞ্জিকায় হিপার্কাসের আবিষ্কারের উপর কোনও গুরুত্ব না দেওয়ায় পঞ্জিকার বছর প্রকৃত বছরের চেয়ে বড় বলে ধরা হল; ফলে, প্রতি বছর উত্তর বিষুবায়ন (এবং দক্ষিণ বিষুবায়নও) ক্রমাগত পঞ্জিকার বছর থেকে পিছনে পড়তে লাগল। [দ্রষ্টব্য: সূর্য আপাতঃদৃষ্টিতে বিষুবরেখার উপর দিয়ে যায় বছরে দুই বার — একবার উত্তরায়ণের সময়, মার্চের ২০শে তারিখে সূর্য যখন বিষুব রেখা পার হয়ে উত্তর দিকে যায়, আরেকবার দক্ষিণায়নের সময় সেপ্টেম্বরের ২২শে কি ২৩শে তারিখে। এই দুই সময় সূর্য বিষুব রেখার উপরে আসে বলে পৃথিবীর সর্বত্রই দিন ও রাত সমান দীর্ঘ হয়। উত্তর বিষুবায়নকে বাসন্তী বিষুবায়ন বা vernal equinox, আর দক্ষিণ বিষুবায়নকে শারদীয় বিষুবায়ন বা autumnal equinoxও বলা হয়।] ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী পঞ্জিকার দিনকে উত্তর বিষুবায়নের সঙ্গে মিল রেখে যথাস্থানে আনবার জন্য একযোগে দশটি দিন বাদ দিয়ে জুলিয়ান পঞ্জিকার সংস্কার সাধন করলেন। কিন্তু ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দের আগে পর্যন্ত ইংল্যান্ডে এই সংস্কার চালু করা যায়নি। অতদিনে অবশ্য দশ দিনের স্থলে এগার দিন বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। সুতরাং ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে ২রা সেপ্টেম্বরের পরের দিনই ৩রা সেপ্টেম্বর না হয়ে হল ১৪ই সেপ্টেম্বর। এর ফলে ইংল্যান্ডে দাঙ্গা বেধে গেল। সাধারণ লোকে ভাবল, 'গবর্নমেন্টের লোক আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে হস্ত ক্ষেপ করছে। তা কি আর আমরা করতে দেব?' হতে পারে সে সময় বর্তমানের চেয়ে অনেক অল্প লোকে গণিতের ধার ধারত। যাহোক, তারা মনে করল তাদের জীবন থেকে এগারটা মূল্যবান দিন ঠকিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তাই তারা 'আমাদের জীবনের এগার দিন ফিরিয়ে দাও' ধ্বনি করতে করতে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লেগে গেল।

রাশিয়াতে মাত্র এই সেদিন প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরে তাদের পঞ্জিকার সংস্কার করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সমসূত্রে এসে পড়েছে। এতদিনে অবশ্য তাদের পঞ্জিকা থেকে অশুভ ১৩টি দিন বাদ দিতে হয়েছে। জুলিয়াস সিজার যদি হিপার্কাসের আবিষ্কারটি আর একটু শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা করে তাঁর প্রথম সংস্কারটি সাধন করতেন, তা' হলে অবশ্যই এতসব দিগদারি থেকে বাঁচা যেত।

আমরা দেখেছি, প্রত্যেক সৌর-বছর আমাদের গণনায় ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ডের সমান। সুতরাং ৩৬৫ দিনে বছর ধরলে ৪ বছরে ২৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ৪ সেকেন্ড সময় কম ধরা হয়; আবার প্রতি চতুর্থ বছরের স্থিতিকাল ১ দিন বা ২৪ ঘণ্টা বাড়িয়ে দিলেও খানিকটা অতিরিক্ত বাড়ান হয়ে যায়। এর থেকে হিসাব করে দেখা যায় ৪০০ বছরে মোট ৯৬ দিন ২১ ঘণ্টা ৫ মিনিট ৪০ সেকেন্ড, অর্থাৎ প্রায় ৯৭ দিন বাড়ান উচিত। অন্য কথায়, প্রতি ৪০০ বছরে প্রায় ৯৭টা লম্ফ বছর ধরলে অনেকটা বাস্তবানুগ হয়। তাই গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকায় জুলিয়াস পঞ্জিকার উপর এই সংশোধনটুকু জুড়ে দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ১৭০০, ১৮০০, ১৯০০, ২০০০ খ্রীস্টাব্দের প্রথম তিনটি সাধারণ বছর, আর শেষেরটি মাত্র লম্ফ বছর (বা লাফা বছর) হবে। তা'হলে ৪০০ বছরে মোট ৯৭টি লাফা বছর হয়। অবশ্য, এতেও আবার প্রতি চারশো বছরে ২ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট ২০ সেকেন্ড অতিরিক্ত হয়ে গেল। এর থেকে হিসাব করে দেখা যায় যে গ্রেগরিয়ান পদ্ধতি অনুসরণ করলেও আবার খ্রীস্টীয় ৪৯০৫ সালে গিয়ে পুরো একদিনের ব্যবধান দাঁড়াবে। তখন বছর গণনায় আবার কিছু করবার প্রয়োজন দেখা দেবে।

আমরা পঞ্জিকার প্রসঙ্গ ধরে হিপার্কাসের কাল থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। তবু হয়তো এই আলোচনা থেকে, অঙ্কশাস্ত্রে যাঁরা অ-পণ্ডিত, তাঁরাও বর্তমান সভ্যতায় গণিতের দান সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করতে পেরেছেন। গণিতশাস্ত্রকে বিজ্ঞানের সম্রাজ্ঞী বলা হয়ে থাকে। এ বিদ্যার অস্তিত্ব না থাকলে আমাদের জীবন-ধারণ হয়ে পড়তো নিতান্ত এলোমেলো, নিয়ম-শৃঙ্খলার বহির্ভূত। হিপার্কাসের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের খুঁটি-নাটি বিষয় নিয়ে আলোচনার স্থান এটি নয়। তবু আকাশ-গোলকের উপর বিষুবায়ন বিন্দুদ্বয়ের অগ্রবর্তনের (precession of the equinoxes) কথা উল্লেখ না করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। কারণ এই আবিষ্কারের জন্যই তিনি প্রাচীনকালে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বেত্তা বলে গণ্য হয়েছিলেন। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই : আমাদের পৃথিবীটা সম্পূর্ণ বর্তুলাকার নয়, বরং কিঞ্চিৎ ভার-সাম্যহীন উপবর্তুল। এই কারণে অক্ষরেখার উপর ঘূর্ণনের সময় অক্ষটা স্থির না থেকে একটু একটু নড়বড় করে। এর ফলে অক্ষটা (আর সেই সঙ্গে নিরক্ষবৃত্ত বা বিষুববৃত্তও) ক্রমাগত একই দিকে বছরে সামান্য একটু ঘুরে যায়। হিপার্কাস আন্দাজ করেছিলেন এই দিক্‌পরিবর্তন প্রতি বছর ·০১০২° ডিগ্রী মাত্র। বর্তমান সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই ঘূর্ণনের পরিমাণ বছরে ·০১৫৬° ডিগ্রী, অর্থাৎ অক্ষটা ঘুরতে ঘুরতে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে প্রায় ২৩,০৭৭ বছর সময় লাগে!

এইবার আমরা জ্যোতির্বিদ্যা থেকে ত্রিকোণমিতির দিকে দৃষ্টিপাত করি। বর্তমান যুগে এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তাকেই আমরা অধিক মর্যাদা দিয়ে থাকি। গোড়াতে ত্রিকোণমিতি ধনু ও গুণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। লাটিন ভাষাতেও 'ধনুর' নাম আর্কাস, আর 'ছিলার' নাম কর্ডা। তাই বৃত্তাংশকে arc এবং জ্যা-কে chord বলা হয়।

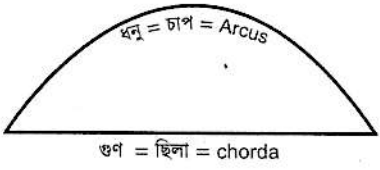

চতুর্থ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে আলেকজান্দ্রিয়ার থিয়ন (Theon) নামক একজন গণিতজ্ঞ উল্লেখ করেছেন, হিপার্কাস ১২ খণ্ডে 'বৃত্তের ভিতরে জ্যায়ের পরিমাপ' (chord in a circle) নামক একখানা পুস্তক রচনা করেন। প্রসঙ্গতঃ বিজ্ঞানের প্রতি সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গীর একটি নমুনা উল্লেখ করা যেতে পারে : থিয়নের কন্যা হাইপাথিয়া (Hypatia) (আনুমানিক ৩৫৫-৪১৫ খ্রীস্টাব্দ) পৌত্তলিক বিজ্ঞান জানতেন এই অপরাধে ধর্মোন্মত্ত 'খ্রীস্টান' জনতা তাঁকে হত্যা করেছিল। তা'ছাড়া টলেমি সিন্ট্যাক্সিস (Syntaxis) নামক গ্রন্থে তাঁর সময়ে প্রচলিত জ্যা-এর দৈর্ঘ্য মাপন-প্রণালী বর্ণনা করেছেন। তিনি যে এসব নিয়ম হিপার্কাস থেকেই পেয়েছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। চাপের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে জ্যা-এর দৈর্ঘ্য সম্পর্কিত করাই ছিল এর মূল কথা। অতএব দেখা যাচ্ছে বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্যকে প্রকারান্তরে 'কোণ'-এর বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। অবশ্য, বৃত্তচাপ ও সমগ্র পরিধির দৈর্ঘ্য বৃত্তের ব্যাসার্ধের উপর নির্ভর করে। গ্রিক গণিতজ্ঞরাও বাবিলনীয় পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। সমগ্র পরিধিকে ৩৬০টি অংশ বা ধাপে (grade) বিভক্ত করে তার নাম দেন এক মিনিট, আবার মিনিটের ৬০ ভাগের নাম দেন সেকেন্ড। সংখ্যার মাথায় ছোট একটি শূন্য বসিয়ে 'ডিগ্রী' বুঝাবার রেওয়াজ মধ্যযুগেই শুরু হয়।

পার্শ্বস্থ চিত্রে একই বিন্দু O কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ব্যাসার্ধ নিয়ে একাধিক বৃত্ত আঁকা হয়েছে। একটি সরল রেখা OX থেকে OP পর্যন্ত ঘুরলে যে কোণ উৎপন্ন হয়, তার পরিমাণ অন্তঃস্থ বৃত্তে মাপলে AB, মধ্যস্থ বৃত্তে মাপলে CD এবং বহিঃস্থ বৃত্তে মাপলে EF হয়; কিন্তু মাপবার একক ছিল যথাক্রমে এই বৃত্তগুলোর ব্যাস, অর্থাৎ যথাক্রমে ÁA, ĆC ও É E। বর্তমানে আমরা বৃত্তের ব্যাসার্ধকে ১ ধরে যে-কোনও চাপের কেন্দ্রস্থ কোণ মেপে থাকি। এর

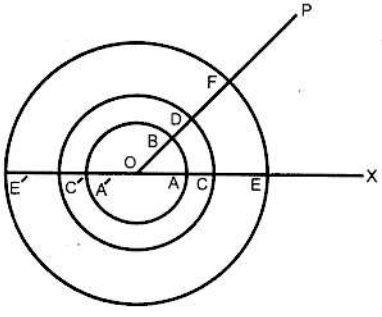

প্রণালীকে রেডিয়ান (radian) প্রণালী বলা হয়। অবশ্য, সম্পূর্ণ পরিধি ব্যাসার্ধের 2π গুণ, অর্ধ পরিধি ব্যাসার্ধের π গুণ, আর পরিধির চতুর্থাংশে ব্যাসার্ধের $\pi/2$ গুণ হয়। এজন্য ৩৬০° ডিগ্রীতে 2π রেডিয়ান, ১৮০°-তে π রেডিয়ান, আর ৯০°-তে $\pi/2$ রেডিয়ান। আমরা আগেই দেখেছি π কে কোনও পূর্ণসংখ্যার পূর্ণাংশরূপে প্রকাশ করা যায় না। তা' না গেলেও ঔপপত্তিক গণিতে রেডিয়ান একককে কোণ মাপাই যুক্তির দিক দিয়ে সহজ ও স্বাভাবিক বলে গণ্য করা হয়। হিপার্কাসের যুগে সম্পূর্ণ ব্যাসকে ১২০ ভাগে ভাগ করে যেকোনও চাপের জ্যা-এর পরিমাণ নির্ণীত হয়েছিল, এবং জ্যা-এর দৈর্ঘ্য এবং চাপের সম্বন্ধ-তালিকা প্রণীত হয়েছিল। যেমন ৬০° কোণের সংশ্লিষ্ট জ্যা-এর পরিমাণ ব্যাসার্ধের সমান, সুতরাং তার পরিমাপ ১২০÷২=৬০, সংক্ষেপে crd $60^{\circ}=60p$, এস্থলে ব্যাসের ১২০ ভাগের এক ভাগকে p(=part) দিয়ে নির্দেশিত হয়েছে। ঐভাবে crd $30^{\circ}=37p455''$; crd $72^{\circ}=70p323''$; crd $90^{\circ}=84p51'10''$; crd $120^{\circ}=103p55'23''$ ইত্যাদি। বলা বাহুল্য crd $180^{\circ}=120$ এইটেই সর্ববৃহৎ জ্যা-পরিমাণ।

টলেমির (Ptolemy) সিন্ট্যাক্সিসকে আরবগণ আল-মাজেস্ট (Al-majest) (অতিশয় মর্যাদাবান) পুস্তক বলে অভিহিত করেছিলেন; সেই থেকে ইউরোপেও এই নামই প্রচলিত হয়ে গেছে। আলমাজেস্টে অর্ধডিগ্রী ব্যবধানে $(1/2)^{\circ}$ থেকে ১৮০° পর্যন্ত সমুদয় জ্যা-পরিমাণের তালিকা দেওয়া হয়েছে। তবে এর কতটুকু টলেমির নিজস্ব দান তা' আর এখন নির্ণয় করা যায় না। নিঃসন্দেহে হিপার্কাস এর গোড়া-পত্তন করে গিয়েছিলেন, আর মেনেলাস (Menelaus)ও অনেক কিছু রেখে গিয়েছিলেন। যা'হোক, জ্যা-এর ঐতিহাসিক সূত্র ধরে অগ্রসর হতে হতে দেখা যায় ভারতীয়েরা টলেমির সিন্ট্যাক্সিস রচনার পর তিন-চার শতাব্দীর মধ্যে জ্যা-সম্বন্ধীয় তথ্যাদি আয়ত্ত করে ফেলেছেন। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পাটলিপুত্র (পাটনা) নগরের ভারতীয় গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট অনেক জটিল হিসাব করেছিলেন, যার ধরণকে জ্যামিতিক না বলে বরং গাণিতিক বা আলজাব্রিক বলা যেতে পারে। এর ফলে গাণিতিক জ্ঞানে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছিল বলা যায়। ত্রিকোণমিতিতে আর্যভট্ট দুটো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেন। প্রথমতঃ তিনি জ্যায়ের পরিবর্তে অর্ধ-জ্যা ব্যবহার করেন; দ্বিতীয়তঃ চাপ (বা কেন্দ্রস্থ কোণ), ব্যাসার্ধ, অর্ধ-জ্যা সর্বক্ষেত্রেই একই একক, কৌণিক মিনিটের ব্যবহার প্রবর্তন করেন। হয়তো প্রশ্ন করবেন, 'সে কেমন কথা? কৌণিক একক দিয়ে আবার দৈর্ঘ্য মাপা যাবে কেমন করে?' ভাবুন, ব্যাসার্ধের সমান লম্বা একটি সুতো বৃত্তের পরিধির উপর টান টান করে স্থাপন করা হয়েছে। তা' হলে এই সুতোর উভয় প্রান্ত কেন্দ্রে যে কোণ ধারণ করে, সেই কোণের পরিমাণ অবশ্যই সুতোটার দৈর্ঘ্যের সমান বা ঐ বৃত্তের ব্যসার্ধের সমান। এখন, এই কোণের পরিমাণ কত? নিশ্চয়ই এই পরিমাণের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিধিস্থ কোণ ৩৬০ ডিগ্রীর যে সম্বন্ধ, ব্যাসার্ধের সঙ্গে সমগ্র পরিধির দৈর্ঘ্যেরও সেই সম্বন্ধ। অর্থাৎ কোণটি হচ্ছে $1/2\pi \times ৩৬০^{\circ}=৫৭\cdot২৯৫৭৮^{\circ}$ (ডিগ্রী), যদি $\pi=৩.১৪১৫৯২৬$ ধরা হয়) $=৩৪৩৭\cdot৭৪৭$ মিনিট (প্রায়) = এক রেডিয়ান। অতএব দেখা যাচ্ছে, রেডিয়ান একক প্রবর্তনের সম্মান

আর্যভট্টেরই প্রাপ্য। (বলে রাখা ভাল, তখনও π সঙ্কেতটি প্রবর্তিত হয়নি, — এর ব্যবহার শুরু হয় মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে)।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই জানা ছিল বৃত্তের পরিধির সঙ্গে ব্যাসের কোনও নির্দিষ্ট অনুপাত বা সম্পর্ক আছে, কিন্তু সে অনুপাতটি যে কত সে সম্বন্ধে ধারণা ছিল খুব অস্পষ্ট। বাবিলোনীয়দের এবং হিব্রুদের ধারণা ছিল এই অনুপাত ৩:১। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, পুরাতন সুসমাচারে (Old Testament, Kings V11 23) একটি 'molten sea' বা ধর্মযাজকদের হাতমুখ ধোওয়ার পিতলে নলাকার টাকীর বর্ণনায় বলা হয়েছে — এর এক কিনার থেকে অপর কিনার পর্যন্ত দশ হাত, আর সম্পূর্ণ বেড় ৩০ হাত। মিসরীয়গণ সত্যের আর একটু কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিলেন। আহ্‌মীজ পাপিরাসের সময়ে অর্থাৎ অনুমান ২২০০ বছর আগেই তাঁরা π-এর পরিমাণ (সম্ভবতঃ মেপে দেখে) নির্ণয় করেছিলেন ৩·১৬০৫; আর্কিমিডিস নির্ণয় করেছিলেন এর পরিমাণ ৩·১৪০ থেকে ৩·১৪২-এর মধ্যে আর আর্যভট্টের হিসাব আরও নির্ভুল, — তাঁর হিসাব অনুসারে এর মান দাঁড়ায় ৬২৮৩২÷২০০০=৩·১৪১৬, বর্তমান স্বীকৃত মানের সমান।

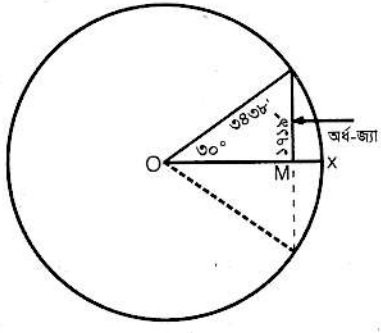

আর্যভট্টের অর্ধ-জ্যা বুঝতে হলে পার্শ্বস্থ চিত্র দেখুন। তিনিই এক্ষেত্রে সমকোণী ত্রিভুজ ব্যবহার করেছিলেন। বলতে গেলে তাঁরই প্রক্রিয়া একটু অদল-বদল করে আমরা আজও ব্যবহার করছি। সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলোর আনুপাতিক সম্বন্ধই বর্তমান ত্রিকোণমিতির মূলভিত্তি। গ্রীকদের চিন্তাপদ্ধতির সঙ্গে আর্যভট্টের পদ্ধতির তুলনা এইভাবে করা যায় : ধরুন ৩০° কোণের সম্বন্ধে জানতে হলে, গ্রীকরা ৩০° একটি কোণের সংশ্লিষ্ট জ্যা-এর সাহায্য নিতেন। আর্যভট্ট তা' না করে একই উদ্দেশ্যে একটি ৬০° কোণের 'অর্ধ-জ্যা'-এর কল্পনা করে, তার সাহায্যে ৩০° কোণের বৈশিষ্ট্য পরখ করতেন। বর্তমানে আমরা এই অর্ধ-জ্যা এর সঙ্গে ব্যাসার্ধের সম্বন্ধকে 'সাইন' (sine) বলে অভিহিত করে থাকি। বর্তমান সংকেত অনুসারে যে কোনও কোণ সম্বন্ধেই সাধারণভাবে বলা যায়,

$$\text{Sin } A = {}^1/_2 \text{ (crd 2 A)}$$

আর্যভট্ট অবশ্যই কোণের অর্ধ-জ্যা বা half-chord না বলে একে বলেছিলেন ঐ কোণের jiva জিহ্বা। তিনি হিসাব করে বের করেছিলেন ৩০°-র জিহ্বা ১৭১৯′; ১৫°-র জিহ্বা ৮৯০′; ৭·৫°-র জিহ্বা ৪৪৯′ ইত্যাদি। এর থেকে দেখা যায়, একটি সমকোণী ত্রিভুজের এক বাহু এবং কর্ণের ভিতরকার কোণ যদি A হয়, তবে অপর বাহুটাই হচ্ছে A-র জিহ্বা। একটা লম্বা কাঠির এক মাথায় আর একটা কাঠি আড়াআড়িভাবে লাগানো

থাকলে এই শেষোক্ত কাঠিকে বোধ হয় জিহ্বা বলা হত। কৃষিকার্যের ও সাধারণ গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত অনেক আসবাবের এই সংজ্ঞা অনুসারে জিহ্বা আছে : যেমন, কেদারা, কুড়াল, নিড়েনি, পাটসের, কাঁদৈল, কোঁটা, আঁকশি, ঝাঁপ, হুড়কো কল, জাঁতি কল ইত্যাদি। 'jiva' শব্দের অন্য অর্থও হয়ত হতে পারে। কারও কারও মতে, আরব্য গণিতবিদেরা ভারতীয় শব্দ 'জিভা'কে আরবিতে লিখতেন 'জিবা'। গাণিতিক পরিভাষায় এর 'অর্ধ-জ্যা' ছাড়া আরবি শব্দ 'জিবা'-র অন্য কোনও মানে আছে বলে মনে হয় না। তবে আরেকটি আরবি শব্দ আছে 'জায়ব' যার মানে 'বক্ষ', 'বক্ররেখা', 'পকেট' অথবা জামার 'কলার' বা 'গলছিদ্র'। আরবি শব্দ লিখবার পদ্ধতিতে যের, যবর, পেশ ছাড়া শুধু অক্ষরগুলোই লিখবার রীতি আছে। তাই সংক্ষেপে শুধু (jb) (جب) লেখা হয়ে থাকবে। এইবার ১১৫০ খ্রীস্টাব্দের স্পেনীয় নগর টলেডোতে যাওয়া যাক। তলোয়ারের ফলক তৈরির জন্য বিখ্যাত এই নগর সদ্য মুরদের কাছে থেকে স্বাধীন হয়ে গেছে। আরবি পাণ্ডুলিপি লাটিন ভাষায় অনুবাদ করবার জন্য এখানে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই কলেজে ক্রিমোনার অধিবাসী ঘেরাডো নামক একজন বিখ্যাত অনুবাদকারী উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি অবশ্য বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ছিলেন না। তিনি অনেক বছর ধরে আরিস্টোটলের আরবি অনুবাদের অনুবাদ, আরবি ইউক্লিডের অনুবাদ এবং মেনেলসের 'sphaerica' (স্ফেরিকা), আল-খ্বওয়ারিজমির 'আলজব্‌র', টলেমির 'আলমাজেস্ট' ও আরও বহু আরবি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। কিন্তু তিনি আরবি শব্দ 'জিবা'-তে এসে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি ঐ বানানের কেবল 'জায়ব' শব্দটা জানতেন। কিন্তু 'জায়ব' মানে বক্ষ, — বক্ষের সঙ্গে গণিতের কি সম্বন্ধ? অবশেষে তিনি সুশীল অনুবাদকের মতো সিদ্ধান্ত করলেন; আরব গ্রন্থকারেরাই যখন ঐ রকম লিখেছেন, তবে তাঁর এত মাথাব্যথা কেন? তাই তিনি jb শব্দের ল্যাটিন অনুবাদ বসিয়ে দিলেন 'sinus'=বক্ষ, বক্ররেখা। এর থেকেই আজ আমরা পেয়েছি কোণের 'Sine' শব্দ, পরে এর সংক্ষেপ হয়েছে 'sin' যার উচ্চারণ 'সাইন'-এর মতো।

বর্তমানে কিন্তু 'সাইন' বলতে অর্ধ-জ্যা-এর দৈর্ঘ্য বুঝায় না, এখন বুঝায় একটা অনুপাত। এই অনুপাতের ধারণা প্রথম যিনি স্পষ্টভাবে প্রচলিত করেছেন, তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত সুইস গণিতজ্ঞ অয়লার (Euler)। ইনি ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইনিই চূড়ান্তভাবে ত্রিকোণমিতিকে জ্যামিতিক ভিত্তি থেকে আলজব্রীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৫৫০ খ্রীস্টাব্দে আর সমাপ্ত হয় অয়লারের সময়ে। এই মৌলিক পদক্ষেপ এখন এত সহজ আর হেলাফেলা মনে হয়। কিন্তু সবসময়ই কোনও কিছু ঘটে গেলে বিজ্ঞ হওয়া সহজ। কিন্তু সত্যিই আশ্চর্য লাগে দশমিক ভগ্নাংশ লেখাটা এখন এত সহজ ঠেকলেও ষোড়শ শতাব্দীর আগে কেউই একথা ভাবতে পারেননি; হিপার্কাস থেকে অয়লারের সময় পর্যন্ত 'সাইন' ছিল একটা দৈর্ঘ্য; কিন্তু দশমিক ভগ্নাংশ চালু হয়ে যাওয়া মাত্র কোণের 'সাইন' আর দৈর্ঘ্য থাকলো না, হয়ে গেল বিশুদ্ধ সংখ্যা। অর্থাৎ ত্রিকোণমিতির অনুপাতগুলো এখন আর ইঞ্চি, মিনিট, ঘনফুট প্রভৃতির এককের উপর নির্ভরশীল রইল না।

অয়লারের অনুপাত ব্যবহার করায় ত্রিকোণমিতি অতিশয় সহজ হয়ে পড়েছে। এখন আর কোনও ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্ত আঁকতে হয় না, জ্যা বা অর্ধ-জ্যাও আঁকতে হয় না। এখন কেবল দুটো সরল রেখা টানার ব্যাপার, যারা নির্দিষ্ট বা প্রদত্ত কোণে পরস্পর ছেদ করে। তারপর একটি সরল রেখার যে কোনও বিন্দু থেকে অন্যটির উপর লম্ব টানলেই সেই লম্বটি হল 'জিহ্বা' আর অঙ্কিত সমকোণী ত্রিভুজের কর্ণটি হল ব্যাসার্ধ। যে কোনও একক নিয়ে দৈর্ঘ্য দুটো মেপে জিহ্বা ও ব্যাসার্ধের অনুপাত নিলেই প্রদত্ত কোণটির 'সাইন' বেরিয়ে গেল একটি বিশুদ্ধ সংখ্যা। কোণের শুধু 'সাইন' জানলেই তার সবকিছু জানা হয়ে গেল।

পার্শ্বস্থ চিত্রে OX আর OV দুটো সরল রেখা O বিন্দুতে ছেদ করে A কোণ উৎপন্ন করেছে। এখন OV-এর উপর যে কোনও বিন্দু (O ছাড়া) P নিয়ে OX-এর উপর PM লম্ব টানা গেল। যদি OM=x, OP=r, MP=y হয়, তা'হলে আমরা সংজ্ঞা লিখতে পারি :

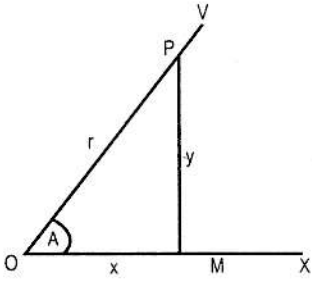

$$\sin A = \frac{y}{r}, \cos A = \frac{x}{r}, \tan A = \frac{y}{x};$$

$$\cos ecA = \frac{r}{y}, \sec A = \frac{r}{x}, \cot A = \frac{x}{y}$$

$$\sin A = \frac{1}{2}(crd\,2A); crdA = 2\sin\frac{1}{2}A$$

এই সংজ্ঞাগুলো থেকেই আজকাল আমরা সহজেই সমতলীয় ত্রিভুজের সমাধান বের করতে পারি; অর্থাৎ তিনটি বাহু ও তিনটি কোণের মধ্যে যেকোনও তিনটি অসম্পর্কিত সম্বন্ধ জানলেই অপরগুলোর মান নির্ণয় করতে পারি, কিছুটা সহজ জ্যামিতির সাহায্যে আর কিছুটা বা আলজাব্রা ও পাটীগণিতের সাহায্যে। কিন্তু গ্রীকদের সময় ব্যাপারটা এত সহজ ছিল না। তাঁরা ত্রিভুজকে কল্পনা করতেন, কোনও বৃত্তের ভিতর অন্তর্লিখিত তার বাহুগুলো উক্ত বৃত্তের জ্যা এবং কোণগুলো বিপরীত চাপের কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক। তারপর হিপার্কাসের প্রণীত জ্যা ও চাপের তালিকার সাহায্যে ত্রিভুজের সমাধান করা হত। এর থেকে তাঁরা সহজেই অধুনা প্রচলিত সূত্র : $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ এবং এইরূপ আরও অনেক সূত্র আজকার মত সহজরূপে নয় বরং বেশ খানিকটা 'পেচিদা' বা জটিল আকারে চিন্তা করে বের

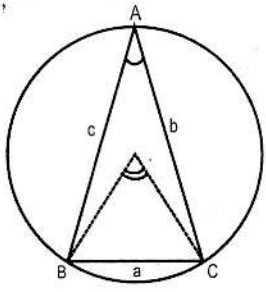

করেছিলেন। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জ্যামিতিক জ্ঞানকে ব্যবহারিক কৃষি সম্পর্কিত কাজে আর জ্যোতির্বিদ্যা ও সমুদ্রযাত্রাদি কার্যে প্রয়োগ করা। কাজে কাজেই তাঁর অন্ততঃ ২ হাজার বছর আগেই গোলকের উপর অঙ্কিত ত্রিভুজ সম্বন্ধে অনেক তথ্যই আবিষ্কার করেছিলেন। এমন কি, ইউক্লিড যখন তাঁর "Elements" প্রণয়ন করেন, তখন তিনি গোলক সম্বন্ধেও অনেক প্রতিজ্ঞার কেবল সামান্য কথন বা সাধারণ বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন। সেগুলো এতই পরিচিত ছিল যে, তার প্রমাণ দেবার আবশ্যক বোধ করেননি। তাঁরা গোলকের উপরকার ক্ষুদ্র বৃত্ত ও বৃহৎ বৃত্তের বিষয় জানতেন। আগেই আমরা দেখেছি, ইরাটোস্থিনিস (Eratosthenes) কেমন করে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করেছিলেন। তাঁরা এও জানতেন যে সমুদ্রপথে যে কোনও স্থান থেকে অন্য কোনও স্থানে যাওয়ার সবচেয়ে হ্রস্ব পথ হচ্ছে বৃহৎ বৃত্তের উপর দিয়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বিষুব রেখা বা নিরক্ষবৃত্ত ছাড়া একই অক্ষ-বৃত্তের উপর অবস্থিত দুইটি শহরের মধ্যে বায়ু পথে গমনাগমন করতে হলে অক্ষবৃত্ত ধরে গেলে ঘুরো হয়, ঐ দুই স্থলের সংযোজক বৃহৎ বৃত্ত ধরে গেলেই ক্ষুদ্রতম পথে যাওয়া হয়। এসব কথা প্রায় ১০০ খ্রীস্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার মেনেলস (Menelaus) যাঁকে 'গোলক ত্রিকোণমিতির জনক' বলা হয় — তাঁর তিন খণ্ডে সমাপ্ত sphaerica গ্রন্থের প্রথম দুই খণ্ডে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তখনকার দিনে এসব কথা গ্রীকদের বেশী বোঝাবার দরকার ছিল না। তিনি শুরুতেই গোলক ত্রিভুজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন 'গোলকের' উপর তিনটি বৃহৎ বৃত্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের নাম 'গোলক ত্রিভুজ'।

সাধারণ পাঠক গোলক ত্রিভুজ ও বৃহৎ বৃত্তের সম্বন্ধে বুঝতে চাইলে, একটি গোলকের উপর টান করে তিনটে রাবারের ফিতে পরিয়ে দেখতে পারেন। ফিতেগুলো পিছলে না গেলেই বুঝতে হবে প্রায় বৃহৎ বৃত্তের উপর দিয়েই পরানো হয়েছে। প্রথম দুটো ফিতে দ্বারাই গোলকটা চারখণ্ডে বিভক্ত হবে; এর প্রত্যেক খণ্ডের নাম lune বা চন্দ্রবেষ্টন। দেখা যাচ্ছে, সমতলের উপর দুটো সরলরেখা দ্বারা 'স্থান' বেষ্টন করা যায় না, অথবা অন্য কথায়, দুই বিন্দুর সংযোজক একটি মাত্র ক্ষুদ্রতম রেখা আছে; কিন্তু গোলকের উপরকার দুটি বিপরীত বিন্দুর বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রতম সংযোজক রেখা (বৃহৎ বৃত্ত) আছে। এরপর তৃতীয় ফিতেটি পরিয়ে দিলে দেখা যাবে, (এটি প্রথম দুটোর সংযোগ বিন্দুর উপর দিয়ে না গেলে) আগের প্রত্যেক চন্দ্রবেষ্টন দুটো করে গোলক ত্রিভুজে বিভক্ত হয়েছে। এইভাবে মোট আটটা গোলক ত্রিভুজ পাওয়া যাবে। তিনটে পরস্পরছেদী বৃহৎ বৃত্তের দ্বারা এমন ত্রিভুজও উৎপন্ন হতে পারে যার এক বাহু (বা চাপ) অর্ধবৃত্তের চেয়েও বড়, এবং একটি কোণ দুই সমকোণের চেয়েও বড়। আমরা সচারাচর এমন ত্রিভুজের সমাধান চাইনে; কারণ যেসব রেখা বা চাপদ্বারা এই ত্রিভুজ গঠিত তার অন্য অংশের দ্বারা গঠিত এমন সংশ্লিষ্ট ত্রিভুজও আছে যার প্রত্যেক বাহু অর্ধবৃত্তের চেয়ে ছোট, এবং প্রত্যেক কোণও দুই সমকোণের চেয়ে ছোট। মেনেলস একথা জানতেন; তাই তিনি গোলক ত্রিভুজের

আলোচনা সীমিত করেছেন ঐসব ত্রিভুজের মধ্যে যার কোনও বাহুই অর্ধবৃত্তের চেয়ে বৃহৎ নয়। মেনেলসের sphaerica-র তৃতীয় খণ্ড উচ্চতর গোলক ত্রিকোণমিতির উপর যেসব প্রাচীন গ্রন্থ এ-যাবৎ আবিষ্কৃত হয়েছে তারমধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু কেবল গণিতজ্ঞ ও ভূগোলবিদদের জন্য নয়, সমুদ্রযাত্রীদের জন্যও অপরিহার্য। এসবের বিস্তৃত বিবরণ এস্থলে দেওয়া চলে না। তবে এইমাত্র বলে রাখা ভাল যে সমকোণী গোলক ত্রিভুজের সমাধান এবং এর বাহু ও কোণের মধ্যেকার সম্বন্ধ প্রকাশক সূত্র প্রাচীন গ্রীকদের আমলেই জানা হয়ে গিয়েছিল। অসমকোণী ত্রিভুজের সমাধান করতে হলে সচরাচর তাকে দু'টো সমকোণী ত্রিভুজে অন্তর্বিভক্ত বা বহির্বিভক্ত করেই করা হয়। তখনকার দিনের অনেক সূত্র বেশ জটিল ছিল। ১৬১৪ খ্রীস্টাব্দে সুবিখ্যাত নেপিয়ার — লগারিদমের আবিষ্কর্তা — এইসব সূত্রকে সংহত আকারে মনে রাখবার মতো রূপ দান করেন। তার ফলে বিবিধ সূত্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ স্পষ্টায়িত হয়ে ব্যবহারিক প্রয়োগ সহজ হয়ে গেছে। গ্রীকদের সময় বর্তমানে ব্যবহৃত অনেক তালিকাই তৈরি হয়নি, তাই তাঁদের নির্ভর করতে হত শুধু হিপার্কাসের 'বৃত্ত-জ্যা'-র তালিকার উপর। বর্তমানে অন্ত তঃ পক্ষে ছয় প্রকার বিভিন্ন তালিকা ব্যবহার করে অনেক সহজে হিসাব করা সম্ভব হয়েছে।

এরপর আমরা সুবিখ্যাত টলেমির বিষয় কিছু আলোচনা করব। ইনি অনুমান ১০০ খ্রীস্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানতে পারিনি — কেবল এইমাত্র জানি যে তিনি ১২৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে কয়েকখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যার মধ্যে একখানা এখন বিশ্ববিখ্যাত। আরবীয়েরা এঁকে অতিশয় সম্মান করতেন। ইনি ১৩ খণ্ডে 'আলমাজেস্ট' প্রকাশ করেন, এঁর বইয়ের আরবি তর্জমা হয়, তার থেকে আবার ১১৭৫ সালে লাটিন অনুবাদ হয়, আবার এর শেষ গ্রিক অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে। এতে হিপার্কাসের আবিষ্কারাদির বিবরণ, আর পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বে রবি-চন্দ্র-তারকার ঘূর্ণনের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ইউরোপীয় ও আরবীয় জ্যোতির্বিদরা বিনা দ্বিধায় এঁর মত স্বীকার করে নিয়েছিলেন, পরে ষোড়শ শতাব্দীতে কোপার্নিকাস এই মতের খণ্ডন করেন। অবশ্য, আমরা আগেই দেখেছি, এ মতের প্রথম উদ্‌গাতা আরিস্টার্কাস; তাই একে বরং আরিস্টার্কাসের মতবাদ বলাই সঙ্গত।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে জ্যামিতিতে ইউক্লিড যা করেছিলেন ত্রিকোণমিতিতে টলেমির তাই করে গেছেন, — অর্থাৎ এতে তাঁর নিজের দান হয়ত বেশী ছিল না, কিন্তু তিনি সমুদয় উপস্থিত জ্ঞানকে শ্রেণীবদ্ধ করে লোকের সামনে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি হিপার্কাস ও মেনেলসের 'জ্যা'-এর তালিকার সংশোধন ও পরিবর্ধন করেছিলেন।

সমকোণী ত্রিভুজে বিভক্ত না করে যে-কোনও গোলক-ত্রিভুজের সমাধান করবার কথা গ্রীকদের মনে উদয় হয়নি। সর্বপ্রথম আরবীয়েরাই খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীতে এই নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। আলবাত্তানী (৮৫৯-৯২৯) গোলক-ত্রিভুজের 'কোসাইন' নিয়ম আবিষ্কার করেন। আবুল-ওয়াফা (৯৪০-৯৯৭/৮) গোলক-ত্রিভুজের 'সাইন-

উপপাদ্য' প্রবর্তন করেন। এই তালিকা আট দশমিক বিন্দু পর্যন্ত শুদ্ধ ছিল। বর্তমানে আমরা যাকে সিকান্ট ও কোসিকান্ট বলি, আরবীয়েরা প্রকারান্তরে তাও প্রবর্তন করেন। অবশেষে ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে ভিয়েটা ও পিটিসকাসের দ্বারা ইউরোপে এই বিষয়ে আরও উন্নতি সাধিত হয়।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে আর্যভট্টের বৃত্তের স্থলে সমতল ত্রি-কোণ-মিতিক সমকোণী ত্রিভুজের প্রচলন আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু দেখা যায়, আরবে আল খ্বওয়ারিজমি (৮২৫ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে) সাইন এবং ট্যানজেন্ট সমেত নক্ষত্রের তালিকা এবং ত্রিকোণমিতির কোণের তালিকা প্রণয়ন করেন, আলবাত্তানী কো-ট্যানজেন্টের তালিকা প্রস্তুত করেন, আবুল ওয়াফা সিকি ডিগ্রী ব্যবধানে সাইনের তালিকা প্রণয়ন করেন, আল্-জারকালী (Arzachel ১০২৯-১০৮৭ খ্রীস্টাব্দ) টলেডীয় নক্ষত্র-তালিকা প্রস্তুত করেন। এই গ্রন্থ লাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে পুনর্জাগরিত ইউরোপে ত্রি-কোণমিতির উন্নয়নে সাহায্য করেছিল। অয়লার অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে ত্রিকোণমিতির অনুপাত প্রবর্তিত করলেও, অন্ততঃ চার-পাঁচশো বছর পূর্বেই আরব গণিতজ্ঞেরা ত্রিকোণমিতির সাইন, কোসাইন, ট্যানজেন্ট প্রভৃতি অনুপাতের সাহায্যেই নির্ণয় করবার প্রথা প্রয়োগ করে গিয়েছিলেন। বস্তুতঃ তাঁরা খাড়া কাঠির শোয়ানো ছায়াকে বলতেন 'Umbra recta' আর খাড়া দেওয়ালের উপর শোয়ানো কাঠির ছায়াকে বলতেন 'Umbra versa', আর ছায়াকাঠিকে বলতেন 'নোমন' (Gnomon)। ছায়াকাঠির দৈর্ঘ্যকে একক ধরে তাঁরা এই দুই প্রকার ছায়ার দৈর্ঘ্য প্রকাশ করতেন। অতএব দেখা যাচ্ছে তাঁরা ট্যানজেন্ট ও কো-ট্যানজেন্টকে দু' দৈর্ঘ্যের অনুপাত হিসাবেই জানতেন।

সমতল জ্যামিতিতে টলেমির একটি বিশিষ্ট দান হচ্ছে 'টলেমীর উপপাদ্য'। উপপাদ্যটি এই : বৃত্তের অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের দুই জোড়া বিপরীত বাহুর গুণফলের সমষ্টি, এর কর্ণদ্বয়ের গুণফলের সমান। অর্থাৎ বৃত্তে অন্তর্লিখিত ABCD চতুর্ভুজের বাহুগুলো যদি যথাক্রমে a, b, c, d হয়, আর কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য যদি x ও y হয়, তা' হলে $ac+bd=xy$।

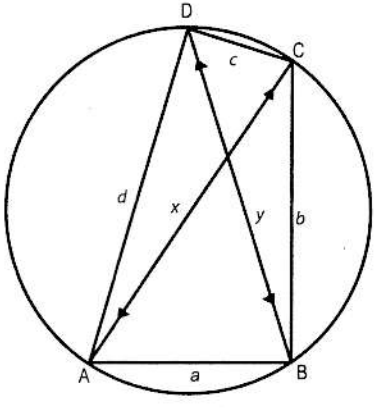

বর্তমানকালে আমরা যে দুটো ফর্মুলা ব্যবহার করি :

Sin (A−b) = sin A cos B+cos A sin B

এবং cos (A+B)=cos A cos B − sin A sin B.

এগুলোকে টলেমির উপপাদ্যের বিকল্প বলা যেতে পারে। গণিতজ্ঞ পাঠকেরা নিজে নিজেই একথা পরখ করে দেখতে পারেন।

টলেমি তাঁর জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতির জ্ঞান মানচিত্র অঙ্কনে খাটিয়েছিলেন। সমতলের উপর গোলাকার পদার্থের অনুকৃতি অঙ্কনে যেসব সমস্যা বা দুরূহতা রয়েছে সাধারণ লোকে সে ধারণা করতে পারে না। টলেমি Orthogonal projection, stereographic projection (লম্ব প্রক্ষেপ, ঘন প্রক্ষেপ বা ত্রি-তল প্রক্ষেপ) প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন 'Analemma' ও 'Planisphaerica' নামক গ্রন্থদ্বয়ে। এইসব গাণিতিক ধারণা তিনি বিশেষ করে নক্ষত্রের মানচিত্র অঙ্কনেই প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। রেনেসাঁ যুগের মানচিত্রকারেরা তাঁর কাছ থেকেই শিক্ষালাভ করেছিলেন বলা যায়। এইসব ম্যাপ না থাকলে পঞ্চদশ শতাব্দী ও পরবর্তীকালের সামুদ্রিক ভূ-প্রদক্ষিণ অসম্ভব হয়ে পড়তো। কিন্তু টলেমির এ-সম্পর্কিত যাবতীয় গণিতবিদ্যা জানা থাকলেও তিনি ইরাটোসথেনিস নির্ণীত পৃথিবীর পরিধির পরিমাণ ২৫০,০০০ স্টেডিয়া গ্রহণ না করে Strabo নামক অপর একজন ভূগোলবিদের স্বীকৃত মাপ, ১৮০,০০০ স্টেডিয়া-ই গ্রহণ করেছিলেন। তা'ছাড়া সেসময় খুব অল্প সংখ্যক স্থানেরই অক্ষাঙ্ক জানা ছিল; দ্রাঘিমাঙ্ক নির্ণয়ের জন্যও হিপার্কাস বর্ণিত রাহু-গ্রাস নিয়ম ছাড়া অন্য কোনও নিয়ম জানা ছিল না, আর দূরত্ব সম্বন্ধেও অধিকাংশ স্থলেই পর্যটকদের অনুমানের উপরই নির্ভর করতে হত। মোটকথা, তাঁকে যেসব মাল মসলা নিয়ে কাজ করতে হয়েছিল তা তাঁর ম্যাপ-তৈরী সংক্রান্ত গভীর জ্ঞানবত্তার উপযুক্ত ছিল না। তবে তিনি বর্তুলের উপর অঙ্কিত চিত্র বা দেশের সীমারেখাদি সমতল ক্ষেত্রে বিন্যস্ত করবার যে উপায় নির্ধারণ করেছিলেন, তার সঙ্গে বর্তমান প্রচলিত নিয়মের বিশেষ কোনও পার্থক্য দেখা যায় না।

টলেমির অঙ্কিত ম্যাপ মধ্যযুগে নির্মিত ম্যাপের চেয়ে যে অনেক উৎকৃষ্ট ছিল, তাতে কোনই সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ মানচিত্র অঙ্কন-বিদ্যা যেন এই সময় দ্বিতীয় শৈশবে ফিরে গিয়েছিল। কারণ, সেই যুগে পৃথিবীটা যে বর্তুলাকার একথা বিশ্বাস করাতেও খ্রীস্টীয় ধর্মাধিকরণদের নিষেধাজ্ঞা ছিল। তখন লোকদের শেখানো হত পৃথিবীটা সবদিকে সমুদ্র দিয়ে ঘেরা একটি সমতল চাকতির মতো। পশ্চিম ইউরোপে গ্রীকভাষার চর্চা লুপ্তপ্রায় হয়ে পড়ায় গ্রিক দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও গণিতবিদদের বহু শতাব্দীর সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার প্রায় অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরবদের প্রভাবে, এবং আরবি অনুবাদের লাটিন অনুবাদ চালু হয়ে গেলে টলেমির 'আলমাজেস্ট'-এর কথা আবার সাধারণের গোচরে আসে। এ-কথাও স্মরণীয় যে, 'আলমাজেস্ট'-এর লাটিন অনুবাদ প্রথম মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে অন্যতম। এরপর ১৫০০ সালে কোলাম্বাসের একজন সহচর, জুয়ান ডি লা কাসা (Juan de la Casa) একখানা পৃথিবীর ম্যাপ প্রকাশ করেন যাতে নব-আবিষ্কৃত আমেরিকার তটরেখাও সন্নিবিষ্ট হয়েছিল।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে সমুদ্রপথে গমনাগমনের নবযুগ আরম্ভ হয়। এর সুবিধার জন্য দিক্-নির্ণয় ও কৌণিক দূরত্ব সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। তাই আমরা

দেখতে পাই, ইউরোপে এই সময় ত্রিকোণমিতিক তালিকা প্রস্তুতের জোয়ার এসেছিল। রেটিকাস (Reticus) বৃত্তের ব্যাসার্ধের কোটি ভাগের এক ভাগকে একক ধরে সাইন, কোসাইন, ট্যানজেন্ট, কো-ট্যানজেন্ট, সিক্যান্ট ও কোসিক্যান্টের সাত দশমিক স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ তালিকা প্রস্তুত করেন। এই তালিকায় ডিগ্রীর প্রত্যেক ষষ্ঠাংশের উপরোক্ত ফাংশন (নির্ভরণ)-গুলোর মান দেওয়া হয়েছিল। এই তালিকা ১৫৫১ সালে প্রকাশিত হয়। এরপর ১৫৭৯ খ্রীস্টাব্দে ভিয়েটা এই তালিকা পরিবর্ধিত করে প্রতি মিনিট কোণের নির্ভরণের মান বের করে প্রকাশ করেন। রেটিকাস কোপার্নিকাসের বন্ধু এবং তাঁর সৌরকেন্দ্রিক মতবাদের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। ইনিই কোপার্নিকাসের পুস্তক মুদ্রণের তত্ত্বাবধান করেন, এবং তাঁর মৃত্যুশয্যায় মুদ্রিত পুস্তকের এক কপি তাঁর হাতে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম তালিকা প্রকাশিত হবার পর দশ দশমিক পর্যন্ত শুদ্ধ তালিকা প্রণয়নে হাত দেন। এইজন্য তিনি বৃত্তের ব্যাসার্ধের সহস্রকোটি ভাগের এক ভাগকে একক ধরে হিসাব আরম্ভ করেন। কিন্তু এই পুস্তক প্রকাশিত হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দে Elector Palatine (রাইন নদীর তীরবর্তী পালাটিনেট জেলার শাসনকর্তা) নিজের খরচায় এই পুস্তক প্রকাশ করেন। তারপর থেকে এই তালিকা 'Opus Palatinum' নামেই পরিচিত হয়ে আসছে। এই ধরনের তালিকার মধ্যে এটিই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। মাথা ঠিক রেখে নির্ভুলভাবে বিরাট বিরাট সংখ্যক হাজার হাজার গুণফল ও ভাগফল নির্ণয় করা যে কত কষ্টসাধ্য তা আজকাল কল্পনা করতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বোধহয়, এইসব অঙ্ক কষা সহজ করবার জন্যেই নেপিয়ার বিশ বছর আপ্রাণ চেষ্টা করে লগারিদম প্রণালী বের করেছিলেন। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব। পিটিসকাস (Pitiscus) বলেন, রেটিকাস তাঁর সঙ্গে কাজ করবার জন্য কয়েকজন অঙ্ক-নবিশ (computer) নিযুক্ত করেছিলেন। সকলের বারো বছরের সম্মিলিত খাটুনির ফলেই রেটিকাসের সুবিখ্যাত তালিকা 'Opus Palatinum' সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

লগারিদম

নেপিয়ার তাঁর ১৬১৪ সালে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ লগারিদম পুস্তকের ভূমিকায় "অতিপ্রিয় গণিতানুরাগী ছাত্রবৃন্দকে" লক্ষ্য করে লিখেছিলেন — "বৃহৎ সংখ্যার গুণ, ভাগ, বর্গমূল, ঘনমূল ইত্যাদি নির্ণয়ের মতো বিরক্তিকর দীর্ঘ প্রক্রিয়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে, সময়ের প্রশ্ন ত আছেই, তাছাড়া ভুলের সম্ভাবনাও অতিশয় মারাত্মক, আর কোথায় ভুল হল তা' ধরে সংশোধন করাও নিতান্ত সহজ নয়। এই সমস্ত বিবেচনা করে এই অসুবিধা দূর হতে পারে বা এর লাঘব হতে পারে — এমন সহজ এবং সংশয়মুক্ত প্রক্রিয়ার অন্বেষণ করতে আরম্ভ করলাম।"

একথা বোধ হয় সত্য যে কোনও একজনের চেষ্টাতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক উদ্ভাবনা বা আবিষ্কারই সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। এসব অগ্রগতি প্রথমে কারো দ্বারা সূচিত হয়েছে, এবং পরে বহু লোকের সমবেত চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে তা পরিণত আকার ধারণ করেছে। কিন্তু একমাত্র লগারিদমের ব্যাপারেই এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা গেছে।

১৯১৪ সালের জুলাই মাসে (অর্থাৎ বর্তমান জগতের অভিশাপস্বরূপ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার মাত্র সপ্তাহখানেক পূর্বে) সমস্ত সভ্য দেশ থেকেই প্রতিনিধিরা এসে জড়ো হলেন এডিনবরা শহরে। এর উপলক্ষ হচ্ছে তিনশো বছর আগে ১৪৭ পৃষ্ঠার যে একখানা বিখ্যাত পুস্তক (যার ৯০ পৃষ্ঠাই গাণিতিক তালিকায় ভরা) প্রকাশিত হয়েছিল তারই স্মৃতিসভা। এই বইখানার লাটিন নামের অর্থ হচ্ছে "ব্যবহার-বিধি সম্বলিত লগারিদমের তালিকা।" এডিনবরা শহরের নিকটবর্তী মার্চিস্টন (Merchiston)-এর অধিবাসী জন নেপিয়ারই এই পুস্তকের প্রণেতা। এর প্রকাশকাল ১৬১৪ খ্রীস্টাব্দ।

এই আন্তর্জাতিক সভার সভাপতি লর্ড মৌলটন উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন : "লগারিদমের উদ্ভাবন যেন আকাশ ফুঁড়ে হঠাৎ বহির্গত হল। এটা কোনও অতীত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কোনও পুরোবর্তী আবিষ্কারের নির্দেশিত ফল নয়। ... ... এ যেন গভীর সমুদ্রের তলদেশ হতে হঠাৎ উত্থিত বিরল দ্বীপের মতো, তার চতুষ্পার্শ্বেই অথৈ পানি।"

এই ১৪৭ পৃষ্ঠার বইখানি সমাপ্ত করতে নেপিয়ারের বিশ বছর ধরে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল। আবার, সর্বকালের প্রয়োজনে লাগবার মতো সার্থক পরিশ্রমও (অন্ততঃ জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে) আর কেউ করেছেন কিনা, তাতেও সন্দেহ আছে। নেপিয়ারের গাণিতিক প্রতিভা, মনঃসংযোগ ও অটল সংকল্পের ফলে পৃথিবীময় গণিতজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক, জ্যোতির্বিদ, এঞ্জিনিয়ার, একচুয়ারী এবং আরও অনেকের সময় ক্ষয়কারী প্রক্রিয়ার অঙ্ক কষতে যে কোটি কোটি ঘণ্টার অপব্যয় হত তা' বেঁচে গেছে। তা'ছাড়া এর ফলে গণিতের অনেক নতুন নতুন শাখার নির্গমনের ক্ষেত্রেও সহায়তা হয়েছে।

জন নেপিয়ারের জন্ম হয় ১৫৫০ সালে। তিনি একটি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ছিলেন। এঁর কয়েকজন পূর্বপুরুষ এডিনবরার মেয়র ছিলেন। তখন সেই দুরন্ত যুগে এ কাজে যথেষ্ট যোগ্যতা, চরিত্রবল আর অটল দৃঢ়তার প্রয়োজন হত। নেপিয়ার কিছুকাল বাড়ীতেই শিক্ষালাভ করবার পর ১৩ বছর বয়সে সেন্ট এন্ড্রুজ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন। ষোড়শ শতাব্দীতে সচরাচর এই ছিল ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশ করবার উপযুক্ত বয়স। কিন্তু তিনি এখানকার পাঠ সমাপ্ত না করেই স্কটল্যান্ডের বাইরে কোনও এক ইউনিভার্সিটিতে চলে যান। এও ছিল সম্পন্ন স্কটিস ভদ্রলোকদের সাধারণ নিয়ম। তবে তিনি যে ইউনিভার্সিটিতে পাঠ সমাপ্ত করেন, তার কোনও দলিলপত্র পাওয়া যায় না। তিনি ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দে বিবাহ করে স্টালিংশায়ার পল্লীতে তাঁর পিতার এস্টেটে গ্রামীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের জীবন আরম্ভ করেন।

এ সময় স্কটল্যান্ডে তুমুল ধর্মীয় বিরোধ ও ঘৃণা-বিদ্বেষ বর্তমান ছিল। নেপিয়ারও মহাউৎসাহে এসব ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সাথে প্রটেস্টান্টদের বিপদাশঙ্কা করে তিনিও আর্কিমিডিসের মতো ভীষণ ভীষণ সমরাস্ত্র নির্মাণ করেন। তিনি নিজেই বলেছেন, — "আল্লার মরজি, এই সুদক্ষ কারিগরদের নৈপুণ্যে, স্বদেশ রক্ষা করবার জন্য" তিনি এসব অস্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। এরমধ্যে ছিল — একটি আতশী আয়না, যার দ্বারা বিপক্ষীয় জাহাজ জ্বালিয়ে দেওয়া যাবে; একটি কামান, যার দ্বারা একটি বৃত্তচাপে অবস্থিত সবকিছু বিনষ্ট করে দেওয়া যাবে, যার দ্বারা ত্রিশ হাজার তুর্কিকে সংহার করা যাবে অথচ একজন খ্রীস্টানেরও প্রাণনাশ হবে না। একটি ট্যাঙ্ক জাতীয় ধাতব রথ ছিল, যা মনুষ্য-শক্তি দ্বারা দ্রুতগতিতে পরিচালিত হতে পারবে, আর তার মধ্যে নিরাপদে বসে ছিদ্রপথে শত্রুপক্ষকে গুলিবর্ষণ করে ঘায়েল করা যাবে। আর সমুদ্রে ডুব দিয়ে শত্রুকে আঘাত হানবার শক্তিসম্পন্ন একটি সাবমেরিন। যা-হোক, এইসব প্ল্যান শুধু কাগজে-কলমেই রয়ে গেছে; এমন কি এখনও রয়েছে। সে যা-হোক ১৫৯৩ সালে তাঁর একখানা গরম গরম যুক্তিপূর্ণ পুস্তিকা বাস্তবিকই প্রকাশিত হয়েছিল। এতে তিনি সেন্ট জন (St John)-এর থেকে পোষকতামূলক উদ্ধৃতিসহ ৩৬টি উপপাদ্যে প্রটেস্ট্যান্ট মতের অভ্রান্ত সত্যতার একেবারে গাণিতিক প্রমাণ দিয়েছিলেন। অবশ্য, তিনি নিজের এবং হাজার হাজার পাঠকের পূর্ণ সন্তোষ উৎপাদন করে প্রমাণ করেছিলেন যে পোপই দজ্জাল, (Antichrist) আর সৃষ্টিকর্তা গড ১৬৮৮ থেকে ১৭০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই পৃথিবীটা গারৎ

করবার সংকল্প করেছেন। এই বইয়ের একুশটি সংস্করণ হয়েছিল। আমরণ নেপিয়ার বিশ্বাস করতেন তিনি এই বই লিখেই মানবজাতির সবচেয়ে বেশী কল্যাণ সাধন করেছেন। কিন্তু এই বইয়ের ত্রি-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করবার জন্য কোনও বিশ্ব-অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়নি।

এই পুস্তক প্রকাশের কিছুকাল পরে নেপিয়ার অঙ্কশাস্ত্রে মনোনিবেশ করেন। তারপর কুড়ি বছর কঠোর পরিশ্রমের পর ১৬১৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি অমর গ্রন্থ "লগারিদমের তালিকা ও ব্যবহারবিধি" প্রকাশ করেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তিনশো বছর পরে তুর্কি থেকেও সালেহ্ মুরাদ নামক একজন প্রতিনিধি এডিনবরা বিশ্ব-সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

আমরা দেখেছি, নেপিয়ারের সময় পর্যন্ত ইউরোপে 'সাইন'-কে দৈর্ঘ্য হিসাবেই গণ্য করা হত। ইতর ভগ্নাংশ (Vulgar Fraction) বর্জন করবার জন্য খুব ছোট একক — বৃত্তের ব্যাসার্ধের কোটি ভাগের একভাগ বা সহস্র কোটি ভাগের এক ভাগ — নিয়ে নিকটবর্তী পূর্ণ সংখ্যক একক দিয়ে অর্ধ-জ্যা বা, সাইনের মান প্রকাশ করা হত। ত্রিকোণমিতিতে প্রায়ই দুইটি 'সাইনে'র গুণফল নির্ণয় করতে হয়। গুণফল চৌদ্দ অঙ্কের অথবা বিশ অঙ্কের সংখ্যা হতে পারে। নেপিয়ার ভাবলেন এই পরিশ্রম কোনও ক্রমে লঘু করা যায় কিনা। কল্পনাটা অবশ্যই আশ্চর্যজনক, কারণ শত শত বছর ধরে গুণনকে অপরিহার্য মৌলিক নিয়ম হিসাবেই ভাবা হয়েছে, ইতিপূর্বে কেউ কোনও দিন গুণন প্রক্রিয়া এড়িয়ে যাবার কথা কল্পনাও করেননি; আর তা'ছাড়া বর্তমান আলজাব্রার প্রতীক পদ্ধতিও তখন পর্যন্ত চালু হয়নি। তবু শুধু পাটীগণিত সম্বল করে আর পরে খানিকটা জ্যামিতিক অনুপাত-সমানুপাতের সাহায্যেই, ধৈর্য ও ইচ্ছাশক্তির বলে তিনি যে কেবল গুণকে যোগে, ভাগকে বিয়োগে, শক্তিকে গুণে আর শক্তিমূলকে ভাগে পরিণত করেছিলেন, তাই নয়; তিনি আরও এমন কতকগুলো মৌলিক ভাব ও ধারণা আবিষ্কার করলেন যা পরে গণিতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। প্রথমে অবশ্য তিনি দুটো সাইন-এর গুণফল নিয়েই কাজ আরম্ভ করেন, কিন্তু শেষে বুঝতে পারলেন, তাঁর নিয়ম শুধু এই বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয়, আরও অনেকক্ষেত্রে এর প্রয়োগ হতে পারবে।

আমরা বর্তমান সহজ প্রক্রিয়ার সাহায্যেই (অর্থাৎ আলজিব্রিক প্রতীকের সাহায্যেই) সহজে বুঝতে চেষ্টা করব গুণকে কেমন করে যোগে পরিণত করা যায়। আমরা জানি, a অক্ষর দ্বারা যেকোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা প্রকাশ করলে, আর x ও y কে যে-কোনও দুটো পূর্ণ সংখ্যা ধরলে,

$$a^x \times a^y = a^{x+y} \ldots\ldots\ldots (1)$$

এখন a^x কে M, a^y কে N এবং a^{x+y} কে P বললে উপরের সমীকরণটি দাঁড়ায় MxN=P।

এখন M ও N এই দুটি সংখ্যার গুণফল হচ্ছে P। আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে এই তিনটি সংখ্যাকে একটি সাধারণ সংখ্যা 'a'-র শক্তি হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

আমরা যদি ধরে নিই x ও y পূর্ণ সংখ্যা না হলেও প্রথম সমীকরণটা খাটবে, আর x সংখ্যাটা একের অধিক, আর a-কে উপযুক্ত শক্তিতে উঠিয়ে যেকোনও সংখ্যাই প্রকাশ করা যায়, তাহলে আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এই a-কে বলে 'ভিত্তি' বা base; আর a-কে ভিত্তি স্বীকার করে নিয়ে বলা যায় M সংখ্যাটির লগারিদম x, N সংখ্যাটির লগারিদম y, আর P সংখ্যাটির লগারিদম $x+y$। তাহলে দেখা গেল, দুটো সংখ্যার লগারিথম যোগ দিলে যা হয়, তাদের গুণফলের লগারিদমও তাই। এইভাবে চিন্তা করলে অনায়াসে ভাগের নিয়ম, বর্গ ও বর্গমূলের নিয়ম, ঘন ও ঘনমূলের নিয়ম — মোটকথা যেকোনও শক্তি ও শক্তিমূলের নিয়ম প্রমাণ করা যায়। অবশ্য উপরে আমরা যা যা ধরে নিয়েছি তাতে আপত্তির কিছুই নেই এবং সেগুলো রীতিমত প্রমাণ-প্রয়োগ দিয়ে সত্য বলে জানা গিয়েছে।

এখন কথা দাঁড়াচ্ছে একটা উপযুক্ত ভিত্তি ধরে নেওয়া, আর সেই ভিত্তিকে কোন্ শক্তিতে উঠালে কত হয়, তার তালিকা প্রণয়ন করা। তা'হলেই আমরা M-এর মোতাবেক x, N-এর যথাযোগ্য y বের করতে পারব; তারপর কোনও সংখ্যার লগারিদম x+y হয়, সেই সংখ্যা P আমরা তালিকা দেখেই বের করতে পারব। সংক্ষেপে এই হচ্ছে সাধারণ ব্যবহারিক লগারিদমের গোড়ার কথা।

অবশ্য ২, ৩,৪, ৫, ৬ প্রভৃতি যেকোনও সংখ্যাকে ভিত্তি ধরেই তালিকা প্রস্তুত করা যায়। তবু দশমিক পদ্ধতিতে সংখ্যা লিখন পদ্ধতি চালু হওয়ার পর ১০-কে ভিত্তি ধরে হিসাব করাই অনেক দিক দিয়ে সুবিধাজনক। আমরা জানি,

$১০^{০}=১$; $১০^{১}=১০$; $১০^{২}=১০০$; $১০^{৩}=১০০০$; $১০^{৪}=১০,০০০$ ইত্যাদি। এর থেকে দেখা যাচ্ছে ১-এর লগারিদম ০; ১০-এর লগারিদম ১; ১০০-এর লগারিদম ২; ১০০০-এর লগারিদম ৩ ... এবং

১	থেকে	১০	পর্যন্ত	সংখ্যার	লগারিদম	০ ও ১-এর মধ্যে
১০	থেকে	১০০	পর্যন্ত	সংখ্যার	লগারিদম	১ ও ২-এর মধ্যে
১০০	থেকে	১০০০	পর্যন্ত	সংখ্যার	লগারিদম	২ ও ৩-এর মধ্যে
১০০০	থেকে	১০,০০০	পর্যন্ত	সংখ্যার	লগারিদম	৩ ও ৪-এর মধ্যে ইত্যাদি।

অতএব, f যদি ভগ্নাংশ হয়, তবে যথাযোগ্য f নির্ণয় করে বলা যায়,

১	থেকে	১০	পর্যন্ত	সংখ্যার	লগারিদম	$০+f$;
১০	থেকে	১০০	পর্যন্ত	সংখ্যার	লগারিদম	$১+f$;
১০০	থেকে	১০০০	পর্যন্ত	সংখ্যার	লগারিদম	$২+f$;
১০০০	থেকে	১০,০০০	পর্যন্ত	সংখ্যার	লগারিদম	$৩+f$;

এসব স্থলে ০, ১, ২, ৩ প্রভৃতিকে বলে লগারিদমের characteristic বা পূর্ণাংশ, আর f-কে বলে লগারিদমের mantissa বা ভগ্নাংশ। উপরের তালিকা থেকে সহজেই দেখা যায়, কোনও সংখ্যা ১-এর থেকে অধিক হলে, তার পূর্ণ অংশটুকু

১টি	অঙ্ক	দ্বারা	প্রকাশিত	হলে	তার	লগারিদমের	পূর্ণাংশ হবে	০
২টি	"	"	"	"	"	"	"	১
৩টি	"	"	"	"	"	"	"	২
৪টি	"	"	"	"	"	"	"	৩ ইত্যাদি।

অর্থাৎ সংখ্যাটির পূর্ণাংশ যত অঙ্কদ্বারা প্রকাশিত হয়, লগারিদমের পূর্ণাংশ তার থেকে ১ কম, এই সাধারণ নিয়ম দিয়ে একের অধিক যে কোনও সংখ্যার লগারিদমের পূর্ণাংশ নির্ণয় করা যায়।

আমাদের সংখ্যাটি যদি ০ ও একের মধ্যে হয়, তবে মনে রাখতে হবে

$১০^{০}=১$; $১০^{-১}=·১$, $১০^{-২}=·০১$; $১০^{-৩}=·০০১$, $১০^{-৪}=·০০০১$ ইত্যাদি।

এর থেকে দেখা যাচ্ছে,

·১	থেকে	১	পর্যন্ত	সংখ্যার	লগারিদম $-১+f$
·০১	থেকে	·১	পর্যন্ত	সংখ্যার	লগারিদম $-২+f$
·০০১	থেকে	·০১	পর্যন্ত	সংখ্যার	লগারিদম $-৩+f$
·০০০১	থেকে	·০০১	পর্যন্ত	সংখ্যার	লগারিদম $-৪+f$

স্পষ্টতঃই কোনও দশমিক ভগ্নাংশের দশমিক বিন্দু ও পরবর্তী ধর্তব্য অঙ্কের মধ্যবর্তী স্থলে —

একটাও শূন্য না থাকলে লগারিদমের পূর্ণাংশ হবে −১, (লিখতে হয় $\bar{১}$);

একটা শূন্য থাকলে তার লগারিদমের পূর্ণাংশ হবে −২, (লিখতে হয় $\bar{২}$);

দুইটা শূন্য থাকলে তার লগারিদমের পূর্ণাংশ হবে −৩, (লিখতে হয় $\bar{৩}$);

তিনটা শূন্য থাকলে তার লগারিদমের পূর্ণাংশ হবে −৪, (লিখতে হয় $\bar{৪}$); ইত্যাদি।

কাজেই দশমিক ভগ্নাংশের লগারিদমের পূর্ণাংশ নির্ণয়ের এই নিয়ম পাওয়া গেল, — দশমিক ভগ্নাংশটির দশমিক বিন্দু ও পরবর্তী ধর্তব্য অঙ্কের মধ্যে যতগুলো শূন্য থাকবে, তার লগারিদমের পূর্ণাংশ তারচেয়ে গুনতিতে ১ বেশী হয়ে বিয়োগ চিহ্নিত হবে।

লগারিদমের পূর্ণাংশ যখন একটু লক্ষ্য করলেই অনায়াসে নির্ণয় করা যায়, তখন শুধু এর mantissa বা দশমিক ভগ্নাংশটুকুর তালিকা প্রস্তুত করলেই চলে। মনে রাখতে হবে, এর পূর্ণাংশটুকু যোগ চিহ্নিতই হোক, আর বিয়োগ চিহ্নিতই হোক, (দশমিক) ভগ্নাংশটুকু সর্বদাই যোগ চিহ্নিত হবে। উপরের বর্ণনা থেকেই একথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

১০-ভিত্তিক লগারিদমের একটা বিশেষ সুবিধা এই যে, সংখ্যাটিকে ১০, ১০০, ১০০০ প্রভৃতি দিয়ে গুণ করলে এর লগারিদমের সঙ্গে কেবল ১, ২, ৩ ইত্যাদি যোগ হবে, অর্থাৎ লগারিদমের ভগ্নাংশটুকুর (mantissa-র) কোনও পরিবর্তন হবে না। আবার এই সব সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলেও লগারিদমের থেকে ১, ২, ৩ ইত্যাদি বিয়োগ হবে। সুতরাং ১০ বা এর কোনও শক্তি দ্বারা গুণ বা ভাগ করলে mantissa-র কোনও পরিবর্তন হয় না। উদাহরণস্বরূপ :

৭০৪০০-এর	লগারিদম	হবে	$৪+f$
৭০৪০	"	"	"	$৩+f$
৭০৪	"	"	"	$২+f$
৭০·৪	"	"	"	$১+f$
৭·০৪	"	"	"	$০+f$
·৭০৪	"	"	"	$\overline{১}+f$
·০৭০৪	"	"	"	$\overline{২}+f$
·০০৭০৪	"	"	"	$\overline{৩}+f$

এখানে একই f সর্বত্রই চলবে, আর কেবল ৭০৪ এই ধর্তব্য অঙ্কগুলোর উপরেই f নির্ভর করবে। সব সংখ্যার ১০-ভিত্তিক (সাধারণ) লগারিদম জানা থাকলে, সহজেই অন্য যেকোনও ভিত্তিতে লগারিদম কত হবে, তা সহজেই নির্ণয় করা যায়। মনে করা যায়, e যেন নতুন ভিত্তি; এই ভিত্তিতে N সংখ্যার লগারিদম কত হবে আমরা তাই নির্ণয় করতে চাই। এখানে অবশ্যই N ও e-এর ১০-ভিত্তিক লগারিদম (ধরা যাক, a ও b) জানা আছে; আর N-এর e-ভিত্তিক লগারিদম x নির্ণয় হবে।

তালিকা থেকে দেখে a ও b-র মান পাওয়া যাবে। সাধারণ ভাষায় লিখলে প্রশ্নটা দাঁড়ায় :

$N=10^a$; $e=10^b$; $N=e^x$

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে $N=10^a$

আবার $N=e^x=(10^b)^x=10^{bx}$

সুতরাং $a=bx$

$$\log_e N = x = \frac{a}{b} = \frac{\log_{10} N}{\log_{10} e}$$

অর্থাৎ N-এর সাধারণ লগারিদমকে e-এর সাধারণ লগারিদম দিয়ে ভাগ দিলেই e ভিত্তিতে N-এর লগারিদম পাওয়া যায়।

প্রশ্ন হতে পারে, নেপিয়ার প্রবর্তিত এই নিয়মটার নাম 'লগারিদম' কেন হল? নেপিয়ার প্রথমে জ্যামিতিক শ্রেণীর সাহায্য নিয়ে লগারিদম নির্ণয় করেছিলেন। জ্যামিতিক শ্রেণীতে প্রত্যেক রাশি পূর্ববর্তী রাশির সঙ্গে একই অনুপাত রক্ষা করে। যেমন, ১ থেকে আরম্ভ করে ১, ২, ৪, ৮, ১৬ একটি জ্যামিতিক শ্রেণী, এর সাধারণ অনুপাত ২; আবার ১, $১/২$, $১/৪$, $১/৮$, $১/১৬$ একটি জ্যামিতিক শ্রেণী, এর সাধারণ অনুপাত $১/২$। নেপিয়ার প্রথম সংখ্যাটিকে ১০,০০০,০০০ (এক কোটি) ধরে আর সাধারণ অনুপাতকে ·৯,৯৯৯,৯৯৯ ধরে অঙ্ক কষতে আরম্ভ করেছিলেন। এইভাবে ১০০ রাশি পর্যন্ত হিসাব করবার পর, আর একটু ভিন্ন পন্থায় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কষ্টসাধ্য হিসাব করেন। এখানে এর বিশদ বর্ণনা দিতে গেলে বর্তমান মানুষের কাছে বে-মানান ঠেকতে পারে। সে যাই হোক, অনুপাতের ল্যাটিন প্রতিশব্দ logos, আর সংখ্যার প্রতিশব্দ arithmos; এই দুটো জোড়া দিয়ে 'লগারিদম' শব্দটা নেপিয়ার নিজেই নিষ্পন্ন করে গেছেন।

যখন আমরা স্মরণ করি যে নেপিয়ারের সময় দশমিক বিন্দুর ব্যবহার প্রচলিত হয়নি* (পৌনঃপুনিক দশমিকের ত কথাই নেই), জ্যামিতিক শ্রেণীর ধারণাও বিশেষ পরিণত হয়নি, আর সংখ্যার শক্তি-সূচক চিহ্নও চালু ছিল না, সেসময় নানাপ্রকার ঘুরানো বাক্য (circumlocution) ব্যবহার করে মানসিক চিন্তার প্রকাশ করে বহু ক্লেশে যে বিরাট সৌধ নির্মাণ করে গেছেন, তাতে সত্যিই চমৎকৃত হতে হয়।

নেপিয়ার অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গেই তাঁর ৯০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত লগ-তালিকা পুস্তিকাখানা প্রকাশ করেন। তিনি ভূমিকায় লিখেছিলেন, অন্যান্য গণিতজ্ঞেরা যদি তাঁর ধারণা দরকারে লাগবে বলে মনে করেন তবে তিনি কেমন করে এই তালিকা প্রস্তুত করলেন তার বিবরণ দেবেন। হয়ত কোথাও ভুলচুক থেকে গেছে, এই মনে করে তিনি লিখেছিলেন, 'Nothing is perfect at birth' — জন্মের থেকেই কোনও কিছুই একেবারে নিখুঁত হয় না।

যাহোক বইখানা বেরোতে বেরোতেই নামজাদা গণিতবিদদের প্রশংসা অর্জন করল। কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির এডওয়ার্ড রাইট (Wright) ও লন্ডনস্থ গ্রেশাম কলেজের প্রফেসর হেনরী ব্রিগ্‌স (Briggs)-এর কাছে বইখানা বিশেষ ভাল লেগেছিল।

রাইট সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধীয় কয়েকখানা পুস্তকের প্রণেতা হিসাবে নৌ-বিদ্যায় লগারিদমের ব্যবহারের উপযোগিতা বুঝতে পেরে অবিলম্বে নেপিয়ারের পুস্তকের ইংরেজি তর্জমা করে অনুমোদনের জন্য গ্রন্থকারের কাছে পাঠিয়েছিলেন। বইখানা যথাসময় নেপিয়ার-লিখিত মন্তব্যসহ প্রকাশিত হল। নেপিয়ার সেখানে বলেছেন, "এখন আমার স্বদেশবাসীদের মধ্যে অনেকেই এ বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ করেছেন এবং সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য একজন বিশিষ্ট গণিতবিদ 'ইতর ভাষা ইংরেজিতে' এর তর্জমা করে আমার বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছেন। আমি অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে পড়ে দেখলাম যে অনুবাদ সঠিক হয়েছে, আর আমার মনোভাবের ও মূল পুস্তকের সম্পূর্ণ অনুবাদ হয়েছে।" রাইট ১৬১৫ সালেই মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র-কর্তৃক ১৬১৮ সালে এই অনুবাদ-পুস্তক প্রকাশিত হয়।

হেনরী ব্রিগ্‌স তাঁর কোনও বন্ধুর নিকট (১৬১৫ সাল) চিঠিতে লিখেছেন, "আল্লাহর মর্জী হলে (ইন্‌শা আল্লাহ্‌) সামনের গ্রীষ্মেই আমি তাঁর (নেপিয়ারের) সঙ্গে দেখা করব। কারণ তাঁর বই দেখে যেমন আনন্দিত আর চমৎকৃত হয়েছি তেমনটি আর কখনও হয়নি।" সত্যি সত্যিই ব্রিগ্‌স গ্রীষ্মকালে নেপিয়ারের বাড়ীতে গিয়ে একমাস সেখানে অবস্থান করে এ বিষয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা করেন। অবশ্য নেপিয়ারও তাঁর নিয়মাদির উন্নতিসাধনের কথা চিন্তা করছিলেন। পরে দুই জনের চিন্তা ও চেষ্টায় কিছু কিছু পরিবর্তন করে নতুন সংস্করণ বের করা হয়। নতুন সংস্করণে ১-এর লগারিদমকে

* আমরা এখন যে সংখ্যাকে ২৩·৫৪৮ লিখি, নেপিয়ারের সময় Simon Stevin নামক একজন গণিতবিদ (১৫৮৫ সালে) ২৩(০)৫(১)৪(২)৮(৩), এইভাবে লিখবার প্রস্তাব মাত্র দিয়েছিলেন।

শূন্য ধরা হয়, ১০-এর লগারিদম ১, ১০০-এর লগারিদম ২ ইত্যাদি ক্রমে ১০^{a}-এর লগারিদমকে a ধরা হয়।

১৬১৭ সালে নেপিয়ারের বন্ধু ও সহকর্মী ব্রিগ্‌স (Briggs) ১ থেকে ১০০০ পর্যন্ত সংখ্যার ১০-ভিত্তিক লগারিদমের একখণ্ড পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ১৬২০ খ্রীস্টাব্দে গ্রেশাম কলেজের জ্যোতির্বিদ্যার প্রফেসর এডমান্ড গুনটার (Gunter) 'সাইন'-এর ১০-ভিত্তিক লগারিদমের প্রথম পুস্তক প্রকাশ করেন। তারপর ১৬২৪ সালে ১ থেকে ২০,০০০ পর্যন্ত, আর ৯০,০০০ থেকে ১০০,০০০ পর্যন্ত সংখ্যার লগারিদম প্রকাশ করেন। এর চার বছর পরে হলান্ডের গৌডা (Gouda) থেকে আড্রিয়ান ভ্লাক (Adrian Vlacq) ব্রিগ্‌স-এর বইয়ের ফাঁক পূরণ করে ২০,০০০ থেকে ৯০,০০০ পর্যন্ত সংখ্যার লগারিদম বের করে তার সঙ্গে ব্রিগ্‌স-এর নির্ণীত অংশটুকুও জুড়ে দেন, কিন্তু এতে তিনি নিজের নাম ব্যবহার না করে, বইখানাকে ব্রিগ্‌স-এর পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বলে আখ্যায়িত করেন। গাণিতিক সহযোগিতার এইসব দৃষ্টান্ত সত্যিই উদার মনের পরিচায়ক। অবশ্য, গণিতের ইতিহাসে আবিষ্কারের সম্মান ও কৃতিত্ব নিয়ে ক্ষুদ্রতা প্রকাশের দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

প্রায় ষাট-সত্তর বছর আগে পর্যন্ত যে শত শত লগ-টেব্‌ল প্রকাশিত হয়েছে, সে-সবই ১৬১৫ থেকে ১৬২৮ সাল পর্যন্ত তের বছরে ব্রিগ্‌স ও ভ্লাক যেসব তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন, তারই সাহায্যে তৈরি। ভ্লাক যে শুধু ১ থেকে ১০০,০০০ পর্যন্ত সংখ্যার লগারিদম বের করেছিলেন, তা নয়; তিনি সাইন, কো-সাইন, ট্যান, কো-ট্যান, সিক্যান্ট ও কো-সিক্যান্টের লগারিদমের দশ অঙ্ক যুক্ত ১০-ভিত্তিক তালিকা তৈয়ার করেছিলেন।

পূর্বোল্লিখিত গুনটার লগারিথমের নিয়ম অনুসরণ করে ইঞ্জিনিয়ারদের বহু-ব্যবহৃত স্লাইড-রুলও নির্মাণ করেছিলেন। আবার, জব্‌স্ট বার্গী (Jobst Burgi) উল্টা লগারিদম (anti-logarithm)-এর বইও বের করেছিলেন। মোটের উপর বলা যায় লগারিদম-এর নিয়ম উদ্ভাবিত হবার পর গণিতশাস্ত্রে নবযুগের সূচনা হয়েছে। সেই উন্নতি-প্রবাহ এখনও চলছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নিউটন (১৬৪২-১৭২৭)

গ্যালিলিও যে বৎসর মৃত্যুবরণ করেন, সেই ১৬৪২ খ্রীস্টাব্দের খ্রীসমাস দিবসেই একটি সামান্য কৃষক পরিবারে নিউটন জন্মগ্রহণ করেন লিঙ্কনশায়ারের গ্রানথাম শহর থেকে ছয় মাইল দূরে উল্‌সথ্রোপ (Woolsthrope) নামক একটি গণ্ডগ্রামে। তিনি মাতৃগর্ভে থাকতেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। পিতাও তেমন সঞ্চয়ী লোক ছিলেন না, তাই পরিবারটির অবস্থা বিশেষ সচ্ছল ছিল না। আর, জন্মকালে নিউটন নিতান্ত অপুষ্ট ছিলেন। সুতরাং তিনি যে বেঁচে থাকবেন তা কেউ ভাবতে পারেনি। যা হোক, সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি পুরো পঁচাশি বছর বেঁচে ছিলেন। তখন পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টিশক্তি বিন্দুমাত্রও ক্ষীণ হয়নি, আর মাথায় টাকও পড়েনি — যদিও তাঁর সব চুল ত্রিশ বছর বয়সেই পেকে সাদা হয়ে গিয়েছিল।

শারীরিক অপুষ্টতার দরুন গ্রাম্য স্কুলের ছাত্রদের মতো দুরন্তপনা করবার তেমন সুযোগ তাঁর ঘটেনি; তবে তিনি সময় কাটাতেন ছোট ছোট খেলার সামগ্রী তৈয়ার করে — যেমন জলচাক্কী (water wheel), বায়ু-ঘূর্ণি (wind mill), ঠেলাগাড়ী, নানা ধরনের ঘুড়ি ইত্যাদি। ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁর এই অভ্যাস ও দক্ষতা লেন্‌স-নির্মাণ আর আলোর প্রকৃতি নির্ণায়ক পরীক্ষণে বিশেষ কাজে এসেছিল। দ্রব্য-সামগ্রী নির্মাণের এই আনন্দ পরবর্তীকালে ভাব-রাজ্যে নবসৃষ্টির আনন্দে রূপান্তরিত হতে পেরেছিল। তাই আনন্দ লাভের জন্য তাঁকে অন্যের দ্বারস্থ হতে হয়নি। তিনি বিশ্ব-রহস্যের সন্ধানে নিয়োজিত হয়ে স্বীয় বিরাট মননশক্তির যোগ্য কাজই করেছিলেন। তাই তিনি মানস-প্রক্রিয়া, আত্মা বা পরমাত্মার সত্তা উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা না করে বরং চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র প্রভৃতির গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য ক্রমে ক্রমে গণিতশাস্ত্রের অকাট্য যুক্তির দিকেই বেশী ঝুঁকে পড়েন।

তিনি বিবাহ করেননি। পোশাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্যেরও ধার ধারেননি। অনেক সময় একমনে গাণিতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে করতে সময় মতো আহারের কথাও ভুলে যেতেন। সৌভাগ্যের বিষয়, তিনি শৈশবের ক্ষণভঙ্গুর দেহ নিয়েও প্যাসকালের মতো ভেঙে পড়েননি; বরং দৈনিক একাদিক্রমে আঠার-ঊনিশ ঘণ্টা পর্যন্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম সহ্য করে অতিশয় কঠিন কঠিন বিষয়ে পুস্তকাদি প্রণয়ন ও গবেষণা করে গিয়েছেন। আর্কিমিডিসের মতো তাঁরও অসাধারণ মনঃসংযোগ-ক্ষমতা ছিল।

১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দের মাইকেল মাস টার্ম (Michael Mass Term)-এ তিনি কেম্ব্রিজে গতির নিয়মাবলী (Laws of motion) সম্বন্ধে যেসব বক্তৃতা দেন সেগুলি ১৬৮৫ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকেই তাঁর বিশ্ববিশ্রুত পুস্তক 'প্রিন্সিপিয়া' (Principia)-র প্রথম ভাগে সন্নিবিষ্ট করে প্রকাশ করেন। তাঁর বিশ্ব-জাগতিক মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বও এতে সংযোজিত হয়। আবার ঐ বছরের গ্রীষ্মকালেই এর দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত করেন, আর এর পর নয় মাসের মধ্যে তৃতীয় খণ্ডও সমাপ্ত করেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করার ফলে, কয়েক বছর পরে তাঁর Nervous break down বা স্নায়বিক নিষ্ক্রিয়তার মতো অবস্থা হয়। যা-হোক, বছর খানেকের মধ্যেই তিনি আবার পূর্ণস্বাস্থ্য লাভ করে জোহান বার্নোলী ঘোষিত একটি কঠিন সমস্যার সমাধান করেন। সমস্যাটি ব্রাকিস্টোক্রোন (Brachistochrone) নামে পরিচিত; এর অর্থ স্বল্পতম সময় — অর্থাৎ একটি ভারি কণা (Particle) কোন্ জ্যামিতিক রেখা অনুসরণ করলে, স্বল্পতম সময়ে কোনও নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অপর একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে পৌঁছতে পারবে। নিউটন ১৬৯৭ সালের ২৯শে জানুয়ারি তারিখে প্রশ্নটি পেয়ে ৩০শে জানুয়ারি তারিখেই এর সমাধান (সাইক্লয়েড) করে ফেলেন। আবার ১৭১৬ সালে লাইবনিজ (Leibnitz) একটি কঠিন সমস্যা ঘোষণা করেন। নিউটনের বয়স তখন চুয়াত্তর বছর। তিনি পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই এর সমাধান করতে পেরেছিলেন। এসব সত্ত্বেও সত্যের খাতিরে বলতেই হয় যে, প্রিন্সিপিয়া প্রকাশ করবার ফলে তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বার পর নিউটনের ব্যবহারে বেশ খানিকটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়; প্রথমতঃ, এর পরে তিনি আর বিশেষ কিছু গাণিতিক বা বৈজ্ঞানিক দান রেখে যেতে পারেননি, দ্বিতীয়তঃ, সুবিখ্যাত গণিতবিদ্ লাইবনিজের সঙ্গে তাঁর যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বন্ধ ছিল, তা তিনি অনেকটা নিজের অবহেলায় বা দোষেই ক্রমে ক্রমে নির্লজ্জ শত্রুভাবাপন্ন করে তুলেছিলেন। রয়াল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি অনায়াসেই এই অবাঞ্ছিত পরিণতি রোধ করতে পারতেন। এসব কারণে মনে হয়, স্নায়বিক নিষ্ক্রিয়তা থেকে দৃশ্যতঃ মুক্ত হলেও কখনও তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করতে পারেননি।

নিউটনের জীবনকালকে তিনভাগে বিভক্ত করে দেখা যায়। প্রথম, লিঙ্কনশায়ারে বাল্যকাল; দ্বিতীয়, ১৬৬১ সাল থেকে ১৬৯৬ সাল পর্যন্ত তাঁর কেম্ব্রিজ জীবন; আর তৃতীয়, ১৬৯৬ থেকে ১৭২৭ সাল অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর উচ্চ বেতনে সরকারি চাকরি জীবন।

উল্‌সথ্রোপের নিকটেই দুটো ছোট স্কুলে পড়াশোনা করবার পর বার বছর বয়সে তাঁকে গ্রান্থাম শহরের 'গ্রামার স্কুল'-এ পাঠান হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে গ্রামার স্কুল চালু করা হয়েছিল, অল্প খরচে ল্যাটিন ও 'ক্লাসিক্‌স' বা প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞানদান করবার জন্য। এসব স্কুলে সচরাচর অঙ্ক শিক্ষা দেওয়া হত না, হলেও সে কুচিৎ-কিঞ্চিৎ। গ্রান্থাম স্কুলে আবাসিক ব্যবস্থা ছিল না। কাজে-কাজেই ক্লার্ক (Clark) নামক একজন বড়িবিক্রেতা কবিরাজ বা কম্পাউন্ডারের বাড়ীতে নিউটনের

থাকার ব্যবস্থা করা হল। পরবর্তীকালে নিউটন নিজেই বলেছেন, এখানে তাঁর পড়ায় বিশেষ মনোযোগ ছিল না। ক্লাসে তাঁর স্থান ছিল অতি নিম্নে। খুব সম্ভব, রোগা-পটকা চেহারা নিয়ে তাঁর মনে আত্মপ্রত্যয় ছিল না। স্যার ডেভিড ব্রুস্টার বলেন, একদিন নাকি একটি দুর্দান্ত ছেলে তাঁকে চটিয়ে চটিয়ে মারামারি বাধিয়ে দিল। নিউটন নাকি তাকে হারিয়ে দিয়ে, কান ধরে দেওয়ালের কাছে টেনে নিয়ে এসে দেওয়ালের সঙ্গে তার মাথা পটকিয়ে দিলেন! গল্পটা শুনতে এত ভাল যে বানানো বলেই মনে হয়! যা-হোক এরপর থেকে নাকি পড়াশুনায়ও তাঁর দ্রুত উন্নতি হতে লাগলো; এমন কি, তিনি স্কুলের সেরা পড়ুয়া হয়ে উঠেছিলেন।

নিউটনের বয়স যখন তিন বছর তখন তাঁর মাতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। কিন্তু ১৬৫৬ সালে তিনি আবার বিধবা হন। কাজে কাজেই পনর বছরে পড়তে পড়তেই নিউটনের মা তাঁকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পিতার ছোট খামারে কৃষিকার্যে লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু এ-কাজে নিউটনের মন বসল না। মাতা যখন সওদা করবার জন্য চাকরকে শহরে পাঠাতেন, নিউটনও চাকরের সঙ্গে শহরে যাবার সুযোগ করে নিতেন; আর, শহরে পৌছেই ক্লার্কের বাড়ীতে গিয়ে যতক্ষণ ফুরসত পাওয়া যায়, ততক্ষণ ক্লার্কের পুস্তকাদি পাঠ করতেন। ক্লার্কের বাড়ীতে কোন্ বিষয়ের পুস্তক তিনি পাঠ করতেন, তা জানা যায় না; তবে মনে হয়, কোনও বৈজ্ঞানিক বিষয়ের বই-ই হবে, কারণ এসব বিষয়ের বই স্কুলে পড়ানো হত না। এ না হলে পরে কেম্ব্রিজে গিয়ে তিনি কেন অঙ্ক আর বিজ্ঞান বিষয় নিলেন তার কোনও কারণ পাওয়া যায় না।

গোলাবাড়ীতে কাজ করবার সময়ও, যখন তাঁর গরু-বাছুর, ঘোড়া-ভেড়া ঠেকাবার কথা তখনও দেখা যেত তিনি গাছতলায় বসে হয়ত বই পড়ছেন, নয়ত কোনও যন্ত্রের মডেল তৈরি করতে ব্যস্ত রয়েছেন। এইসব দেখে-শুনে বুদ্ধিমতী মাতা বুঝলেন এ ছেলের দ্বারা খেত-খোলার কাজ চলবে না। তাই তিনি ছেলেকে আবার গ্রান্থাম গ্রামার স্কুলে পাঠিয়ে দিলেন। এই সময় তাঁর এক মামা, নিকটবর্তী পল্লীর রেক্টর রেভারেন্ড এইসকাফ (Ayscough)-এর পরামর্শমতো, তিনি কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। এই মামা তাঁর ভগ্নীকেও এই ব্যাপারে রাজি করালেন, আর নিউটনকে স্যান্ডারসন প্রণীত একখানা যুক্তি-বিজ্ঞান (Logic)-এর বই পড়তে দিলেন। ট্রিনিটি কলেজের একজন গ্রাজুয়েটের সুপারিশে নিউটন বেতনের দিক দিয়েও কিছু রেয়াত পেয়ে গেলেন।

১৬৬১ সালের জুন মাসে, ট্রিনিটি কলেজের মাস্টার, নিউটনকে ঐ কলেজের মেম্বর হিসাবে ভর্তি করে নেন। জুলাই মাসের ৮ তারিখে নিউটন কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির ছাত্র-মেম্বর হন, তারপর অক্টোবর মাসে কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে একজন অখ্যাত নিম্ন-গ্রাজুয়েট ছাত্র হিসাবে গণিত ও বিজ্ঞান শিখতে আসেন। ঐ সময় তিনি কেম্ব্রিজের নিকটবর্তী স্টোর-ব্রিজ (Stour bridge) গ্রামের বিখ্যাত মেলা থেকে 'নক্ষত্র' সম্বন্ধে একখানা পুস্তক ক্রয় করেন। পরে দেখলেন, তাঁর জ্যামিতিক জ্ঞান না থাকায় ভাল করে বুঝতে পারছেন না। কাজে কাজেই একখানা ইংরেজি ভাষায় লেখা ইউক্লিডের

এলিমেন্টও কিনলেন। কিন্তু পড়ে দেখে মনে করলেন, ইউক্লিডে যা আছে তা'তো সহজেই বোঝা যায়, এ বাজে বই দিয়ে আর কি হবে? সুতরাং ডেকার্টের জ্যামিতি আয়ত্ত করে ফেললেন। এটি ছিল ডেকার্টের নিজের লেখা বই, বেশ কঠিন। কোনও ভাল উপদেষ্টা থাকলে অবশ্য ওয়ালিস (Wallis)-এর লেখা সহজ কথায় ডেকার্টের জ্যামিতি পড়বার উপদেশ দিতেন। সে যাই হোক, ডেকার্টের বই পড়ে তাঁর মনে গণিতশাস্ত্রের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা আর অনুরাগ হয়। এরপর নিউটনের নিজের কাগজপত্র থেকে দেখা যায় ১৬৬৩-'৬৪ সালের মধ্যে তিনি ভিয়েটার সমুদয় পুস্তক এবং ওয়ালিস-এর Arithmetica Infiniorium-ও পড়ে ফেলেছিলেন, অর্থাৎ ঐ সময় তিনি অনন্ত রাশি-শ্রেণীর সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলেন। ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দেই তিনি ট্রিনিটিতে একটি বৃত্তি পরীক্ষা দেন। একজন পরীক্ষক, ডক্টর ব্যারো (Barrow) — যিনি এই কলেজের প্রথম লুকাসিয়ান প্রফেসর ছিলেন — নিউটনের জ্যামিতিক জ্ঞানের অপ্রতুলতার বিষয় উল্লেখ করে বিরুদ্ধ-রিপোর্ট দিয়েছিলেন। যা হোক, অন্য বিষয়ে ভাল জ্ঞান থাকায় নিউটন উক্ত বৃত্তি পেয়ে গেলেন, আর এই রিপোর্টে সুফলও হল।

নিউটন আবার ভাল করে ইউক্লিড পড়ে নিয়ে বুঝতে পারলেন, ইউক্লিডের এলিমেন্ট একেবারে ছেলেখেলা নয়। পরবর্তীকালে ইউক্লিডের জ্যামিতির মাধ্যমেই বিশ্বজাগতিক মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব জগতের সামনে উপস্থিত করেছিলেন। অবশ্যই তিনি নিজের উদ্ভাবিত 'ক্যালকুলাস' বা হিসাব-প্রণালীর সাহায্যেই উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তবু অন্য গণিতজ্ঞেরা ত তাঁর হিসাব-প্রণালীর সঙ্গে পরিচিত নন, এই ভেবে তিনি সমস্ত যুক্তি-তর্ক ইউক্লিডীয় পন্থায় তর্জমা করে বিশ্বের সামনে ধরেছিলেন।

যা হোক, নিউটন বৃত্তি লাভ করে, ব্যারোর ক্লাসে যোগ দেওয়ার অধিকারী হয়েছিলেন। এরপর পাঁচ বছরের মধ্যেই ব্যারো নিউটনের অনন্যসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হয়েছিলেন। এখানে বলে রাখা ভাল সে সময় কেম্ব্রিজে গণিত শিক্ষা আরম্ভ করতে হলে তার প্রস্তুতিস্বরূপ স্যান্ডারসনের যুক্তিবিজ্ঞান পড়ে নিতে হত। নিউটন ত আগেই তাঁর মামার কাছ থেকে পাওয়া ঐ বইখানা ভাল করেই আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন; ফলে তাঁর ট্রিনিটি কলেজের শিক্ষক বেঞ্জামিন পুলিঈন (Benjamine Pulleyn) এই জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে নিউটনকে ঐ ক্লাস থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। ১৬৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে নিউটন বি.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। কিন্তু ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে মহামারীরূপে প্লেগ দেখা দেয়। এই কারণে ট্রিনিটি কলেজ ১৬৬৫ ও ১৬৬৬ সালের কিছুকাল পর্যন্ত বন্ধ থাকে। ঐ সময় লন্ডনের বিখ্যাত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়, তাতে যে শুধু শহরই পুড়েছিল তাই নয়, প্লেগের জীবাণুগুলোও পুড়েছিল। যাই হোক, এই সময়টা নিউটন স্বগ্রাম উল্‌সথ্রোপে গিয়ে মাধ্যাকর্ষণের কারণচিন্তায় ব্যয়িত করেন।

এইখানে, ১৬৬৬ সালে, নিউটনের সামনে আপেল গাছ থেকে একটি ফল পড়েছিল এবং তাই দেখে তাঁর মাথায় মাধ্যাকর্ষণের চিন্তার উদয় হয় — এই ধরনের একটি প্রসিদ্ধি রয়েছে। কথাটা সত্যি কি মিথ্যা, "খোদা-এ-মা'লুম"। যাই হোক, উক্ত ফলবান বৃক্ষটা

বহুকাল জনশ্রুতি বহন করে দাঁড়িয়ে ছিল; তারপর ১৮২০ সালের প্রবল ঝড়ে এর পতন হয়। কিন্তু কথা এই যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ নিউটনের বহুকাল আগে থেকেই বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে পরিচিত ছিল। নিউটনের চিন্তাধারার নতুনত্ব এই যে, তিনি নিখিল-বিশ্বের সমুদয় পদার্থের মধ্যেই, অর্থাৎ "পৃথিবীর বাইরেও বহুদূরে অবস্থিত চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র সমুদয় পদার্থের মধ্যেই একই মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম প্রযোজ্য" এই কল্পনা করেছিলেন। তাঁর মনে যে সব চিন্তার উদয় হয়েছিল, তা খুব সম্ভব এই ধরনের ছিল : সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহগুলো ঘোরে কেন? এক সরলরেখায় ক্রমে চলে যায় না কেন? অবশ্যই প্রতি মুহূর্তে কোনও বল গ্রহগুলোকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করছে। তা'হলে এই বলের কেন্দ্র কোথায়? নিশ্চয়ই গ্রহাদির উপর প্রযুক্ত এই বল সূর্যের দরুনই বা সূর্য থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। চাঁদ সোজাসুজি একদিকে চলে না গিয়ে পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে; এ-ও নিশ্চয় পৃথিবীর বল দ্বারাই সংঘটিত হচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে আপেলটা এখনই পড়ল, পৃথিবীই একে টেনে নামিয়েছে। আচ্ছা, এই পৃথিবীর আকর্ষণ কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত?

এই গ্রামে বসেই — যেখানে একদিন কৃষকভাবেই সারাজীবন কাটিয়ে দেবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল — এই নির্জন পল্লীতেই নিউটন তাঁর ফ্লাকশনাল ক্যালকুলাস বা 'প্রবাহ-নির্ণয়ী' হিসাব প্রণালী উদ্ভাবন করেন, যার সাহায্যে তিনি বিশ্বজাগতিক মাধ্যাকর্ষণের যৌক্তিকতা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, আর যে প্রণালী গণিতজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের কাছে আজ একটা বিশেষ শক্তিশালী উপায় বলে গণ্য হয়েছে। এই উদ্ভাবনার পিছনে রয়েছে ব্যারোর শিক্ষা, আর ব্যারো নিজে ফরাসি গণিতবিদ 'ফের্মা' (Fermat)-র স্পর্শ রেখা অঙ্কন পদ্ধতিকেই একটু প্রসারিত আর সরলিত করে 'প্রবাহ-নির্ণয়ী হিসাব প্রণালী'র কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। ফের্মা ১৬২৯ সালে রোবারভাল (Roberval)-এর কাছে লিখিত এক পত্রে এই নিয়ম বর্ণনা করেছিলেন এবং তা' ১৬৪৪ সালে হেরিগোন (Herigone) প্রণীত গণিত-পাঠ Cursus Mathematicus নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছিল। নিউটন এক সময় তাঁর বন্ধুর কাছে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমি মহা মহা দৈত্যের কাঁধে চড়ে কাজ হাসিল করেছি।' অবশ্যই তিনি ভিয়েটা, গ্যালিলিও, ডেকার্ট, ফের্মা, ওয়ালিস, ব্যারো প্রমুখ মহারথীদের কথা স্মরণ করেই ও-কথা লিখেছিলেন। মোট কথা, বহুলোকের সমবেত সাধনার ফলে খণ্ডিত হিসাব প্রণালী (differential calculus) ও পরে যোজিত হিসাব প্রণালী (integratal calculus)-র উদ্ভব হয়েছে। বলা আবশ্যক আজকাল আমরা নিউটনের দেওয়া নাম fluxional calculus-এর স্থলে লাইবনিজের দেওয়া নাম differential calculus-ই ব্যবহার করে থাকি। এ ব্যাপারে নিউটন ও লাইবনিজের মধ্যে কে কার কাছে ঋণী, এ কথা পরে আলোচনা করা যাবে।

১৬৬৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবরে নিউটনকে ট্রিনিটি কলেজের 'ফেলো' করা হয়। পরের বছর তিনি এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'প্রবাহ-নির্ণয়ী হিসাব প্রণালী'-র আংশিক ব্যাখ্যা করে একটা প্রবন্ধ লিখে ব্যারোকে দেখান। ব্যারো এই প্রবন্ধ পড়ে অতিশয় মুগ্ধ হয়ে জন কলিন্স নামক কেম্ব্রিজের আর একজন গণিতজ্ঞের কাছে

নিউটনের অসাধারণ প্রতিভার কথা প্রকাশ করেন। দুঃখের বিষয় ব্যারো নিউটনকে এই প্রবন্ধ ছাপবার পরামর্শ দেওয়া সত্ত্বেও নিউটন এটা ছাপাননি। তখন এটা ছাপানো হলে আর পরিণামে ঐ নিয়ে নিউটন-লাইবনিজের মধ্যে বিবাদের কারণই ঘটত না।

এর কিছুদিন পরেই ব্যারো প্রফেসর পদ ত্যাগ করে ঐশীতত্ত্ব আলোচনায় লিপ্ত হবার সঙ্কল্প করেন। যাবার সময় তিনি নিউটনকে তাঁর পরিত্যক্ত পদে বহাল করবার জোর সুপারিশ করে যান। সেই অনুসারে সাতাশ বছর বয়সেই নিউটন ব্যারোর স্থলে অঙ্কশাস্ত্রের দ্বিতীয় লুকাসিয়ান প্রফেসর নিযুক্ত হন। সে সময় লুকাসিয়ান প্রফেসরকে ইউনিভার্সিটি খোলা থাকাকালে সপ্তাহে মাত্র একটি করে বক্তৃতা দিতে হত। বক্তৃতার বিষয়বস্তু অঙ্ক কিংবা জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, আলোকতত্ত্ব বা স্থিতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি গণিত-সংশ্লিষ্ট যে-কোনও বিষয় হলেই চলতো। এ-ছাড়া, ছেলেদের সঙ্গে আলোচনায় সপ্তাহে আরও দুই ঘণ্টা সময় দিতে হত। নিউটন তাঁর প্রথম বক্তৃতা হিসাবে আলোক-বিজ্ঞানই মনোনীত করেছিলেন। কারণ, এ বিষয়ে ইতিপূর্বেই তিনি কতকগুলো নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন; আর কয়েকটা সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর গবেষণার ফলাফল কয়েক বৎসর যাবৎ কেবল কেম্ব্রিজের ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যা হোক, ১৬৭২ খ্রীস্টাব্দে তিনি রয়াল সোসাইটির ফেলো (F.R.S.) হবার পর, এইসব বক্তৃতার বিষয়বস্তুসম্বলিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ উক্ত সোসাইটিতে প্রেরণ করেন; এইভাবে তাঁর আলোক-বিজ্ঞানের গবেষণার ফলাফল সমস্ত ইউরোপে প্রচারিত হয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এ নিয়ে বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হল। বিশেষ করে রবার্ট হুক নামক রয়াল সোসাইটির আরেক জন সভ্যের তর্কে আপত্তিকর ভাষাদৃষ্টে নিউটন বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁর আর একজন তীব্র সমালোচক ছিলেন লুকাস (Lucas) নামক লিএজ (Liege) শহরের একজন অঙ্কের প্রফেসর। বিরূপ সমালোচনায় বিচলিত না হয়ে তিনি Philosophical Transaction পত্রিকায় ক্রমে ক্রমে আলোক বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেকগুলো প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এইটিই ছিল রয়াল সোসাইটির সরকারী (official) মুখপত্র। এই সকল প্রবন্ধে নিউটন আলোকের কণাবাদ সমর্থন করেন। এই মত অনুসারে, উজ্জ্বল পদার্থ থেকে ছোট ছোট কণা (corpuscles) নির্গত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই এই মত পরিত্যক্ত হয়ে হাইগেন্স-সমর্থিত আলোকের তরঙ্গবাদ চালু হয়। এই শেষোক্ত মতবাদ অনুসারে ঈথার নামক একপ্রকার ভারহীন, অদৃশ্য, স্থিতিস্থাপক পদার্থ স্বীকার করে নিতে হল। এটা বায়বীয়, তরল বা কঠিন পদার্থের অণু-পরমাণুর ফাঁক পূর্ণ করে সমগ্র বিশ্বজগৎ ছেয়ে রয়েছে, অথচ আমরা কোনও ইন্দ্রিয় দিয়েই এই সর্বব্যাপী পদার্থের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারিনে।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শুধু তরঙ্গবাদ দিয়েই আলোকের সমুদয় তথ্য ব্যাখ্যা করা গিয়েছিল। কিন্তু তারপরেই বৈজ্ঞানিকরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, শুধু তরঙ্গবাদ দিয়ে সব ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না। ১৯০০ সালে জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক (Max Plank) প্রস্তাব করলেন আলোক পরিবাহিত হয় ঝলকে ঝলকে। D.E. Richmond-কৃত

The Dilemma of Modern Physics নামক গ্রন্থে প্ল্যাঙ্ক, কম্পটন এবং আইনস্টাইনের 'ঝলকবাদ' (Quantum theory) বিষয়ের সহজপাঠ্য অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা রয়েছে (প্রকাশক, G.P.P. & Sons)। এ সব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আমাদের বিষয়-বহির্ভূত। যা হোক, মোটামুটি এই বলা যায় যে, বর্তমানে আলোকের সমুদয় তথ্যের ব্যাখ্যা করতে হলে পদার্থ-বিজ্ঞানীরা তরঙ্গবাদ আর ঝলকবাদ দুটোই ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন। ঝলকবাদের সঙ্গে কণাবাদের কতকটা সাদৃশ্য আছে। তাই মনে হয়, নিউটন কণাবাদ অনুমোদন করে যে বিশেষ ভুল করেছিলেন তা' ঠিক নাও হতে পারে।

১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে নিউটনের আর্থিক বিষয় নিয়ে একটা মজার ব্যাপার ঘটে। এর থেকে হয় ত অনুমান করা যায়, নিউটন টাকা বেশ চিনতেন। ঘটনাটা এই : সে যুগে যাঁরা দস্তুরমত ধর্মীয় দীক্ষা গ্রহণ করেননি, তাঁরা নির্দিষ্ট কয়েক বছরের অতিরিক্ত কাল ট্রিনিটি কলেজের ফেলো থাকতে পারতেন না। এদিকে নিউটন বিশেষ ধর্মানুরাগী ব্যক্তি হলেও, ব-কায়দা দীক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কাজে কাজেই ১৬৭৫ সালের শরৎকালেই তাঁর 'ফেলো-গিরি' খতম হবার কথা। এতে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা করে তিনি রয়াল সোসাইটির সেক্রেটারীর সঙ্গে লেখালেখি করে, লুকাসিয়ান প্রফেসর হিসাবে, যাতে তিনি দীক্ষা গ্রহণ না করেও ফেলো থাকতে পারেন তার বন্দোবস্ত করে নেন।

১৬৭৩ থেকে ১৬৮৩ সাল পর্যন্ত তিনি কেম্ব্রিজে আলজাব্রা বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এই সব বক্তৃতার মর্ম একত্র করে ১৭০৭ সালে একখানা পুস্তক প্রকাশিত হয়। এতে আলজাব্রার সমীকরণে 'অবাস্তব মূল' (imaginary root) সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৬৮৪ সালে তাঁর বন্ধু, রাজ-জ্যোতির্বিদ ও হ্যালি নামীয় ধূমকেতুর আবিষ্কারক এডমান্ড হ্যালি, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। গ্রহাদির গতি সম্বন্ধে কেপলার যে-সব পরীক্ষা-ভিত্তিক নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন, সেগুলোর যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ বের করবার জন্য হ্যালি, হুক, হাইগেন্‌স (Huygens), রেন (Wren) প্রমুখ অনেকেই চেষ্টা করেছিলেন। হ্যালি উল্লেখ করলেন যে কেপলারের নিয়ম বজায় রেখে তাঁরা গ্রহাদির কক্ষপথ নির্ণয় করতে পারছেন না বলে তাঁদের চেষ্টা এগোতে পারছে না। নিউটন তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, তিনিও পাঁচ বছর আগেই প্রমাণ করে রেখেছেন যে গ্রহগুলোর কক্ষপথ বৃত্তাভাস (ellipse) হতেই হবে। কিন্তু ১৬৭৯ সালে তিনি যে কাগজে প্রমাণটি লিখে রেখেছিলেন, তা কোথাও খুঁজে পেলেন না। যা হোক, তিনি হ্যালিকে আশ্বাস দিলেন, আবার চেষ্টা করে প্রমাণ করবেন এবং তা' তাঁর কাছে পাঠাবেন। তাই ১৬৮৪ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে ঐ বিষয় চিন্তা করে 'মাইকেলমাস' টার্মে এইটিই বক্তৃতার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করলেন। হ্যালি এই টার্মে আবার নিউটনের সঙ্গে দেখা করতে এসে তাঁর হাতের লেখা বক্তৃতার খসড়া পড়ে দেখলেন। এখনও কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরীতে De Motu Corporum (বা বস্তুর গতিপরিচয়) শিরোনামায় এই হাতের লেখা নোট রক্ষিত আছে। হ্যালি বারংবার এই নোট প্রকাশ করবার জন্য নিউটনকে অনুরোধ করলেন। নিউটনও রাজী হলেন। যা হোক, এবার হ্যালির অনুরোধ রক্ষা করে তিনি

পরবর্তী বৎসরের গোড়ার দিকেই এই নোট রয়াল সোসাইটিতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নিউটন এইবার মাধ্যাকর্ষণ-সংক্রান্ত চিন্তায় গভীরভাবে নিমগ্ন হলেন। ১৬৮৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রমাণ করলেন, বহিঃস্থ যেকোনও বিন্দুর উপর একটি নিরেট বর্তুলের আকর্ষণ যত, ঐ বর্তুলের কেন্দ্রস্থলে রক্ষিত সম-পরিমাণ বস্তু-বিশিষ্ট একটি বিন্দুর আকর্ষণও ঠিক ততটুকু। এই অপ্রত্যাশিত সহজ সমতা প্রমাণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বিশ্বের গতিতত্ত্ব তাঁর মনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। ১৬৮৪ সালের বক্তৃতার সময়ও তিনি জানতেন না যে সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যেকার আকর্ষণ নির্ণয় করতে হলে শুধু এদের কেন্দ্রে অবস্থিত দু'টো বিন্দুর পারস্পরিক আকর্ষণ বিবেচনা করলেই চলে। ইতিপূর্বে তাঁর ধারণা ছিল, সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্বের তুলনায় এদের ব্যাসার্ধকে প্রায় শূন্য বলেই ধরা যায়, তাই তাঁর পূর্বের হিসাব মোটামুটি 'সন্নিকট' হিসাব মাত্র (approximate calculation); কিন্তু চন্দ্রের দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ৬০ গুণ মাত্র। সুতরাং এ-নিয়ে তাঁর মনে খুঁতখুঁতি ছিল। কিন্তু এখন দেখা গেল, এ-হিসাব নিখুঁত — কেবল চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী সম্পূর্ণ বর্তুলাকার না হওয়ার দরুন যেটুকু ভুল হতে পারে, তা'ছাড়া আর সব ঠিকই আছে। এতে তিনি এতদূর উৎসাহবোধ করলেন যে ১৬৮৬ ও ১৬৮৭ সালের মধ্যেই তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ বিরাট প্রিন্সিপিয়া লিখে শেষ করলেন; আর ১৬৮৭ সাল শেষ না হতেই হ্যালি নিজের খরচায় এই তিন খণ্ডই ছাপিয়ে ফেললেন। এক শতাব্দী পরে এই বই সম্বন্ধে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ লাপ্লাস বলেছিলেন, 'মানব প্রতিভা দ্বারা এ পর্যন্ত যত সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে, তার মধ্যে প্রিন্সিপিয়াই যে অগ্রগণ্য তাতে কোনও সন্দেহ নেই।' নিউটনের বিশ্বজাগতিক মাধ্যাকর্ষণবাদ অবিলম্বে একমাত্র ফ্রান্স ছাড়া ইউরোপের সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করল।

ফ্রান্সে প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে এর বিরুদ্ধতা চলতে থাকলো। অবশেষে ১৭৩৬ খ্রীস্টাব্দে ভল্টেয়ার তাঁর গাণিতিক বন্ধু ম্যাডাম চ্য'টেল (Chatelet)-এর সহযোগিতায় নিউটনের মতবাদ সম্বন্ধে বিরাট এক প্রবন্ধ প্রকাশ করবার পর ফ্রান্সের গণিতজ্ঞরাও মতবাদটি মেনে নিলেন। 'প্রিন্সিপিয়া' প্রকাশিত হবার পর এর চাহিদা এত বেশী হয়েছিল যে তিন-চার বছর পরেই অর্থাৎ ১৬৯১ সালেই প্রিন্সিপিয়ার এক কপিও আর বাজারে কিনতে পাওয়া যেত না।

১৬৮৭ সালে রাজা দ্বিতীয় জেম্‌স কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির কতকগুলো সুবিধা হরণ করতে উদ্যত হলে দেশময় এর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়, নিউটন তাতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই সাহসিক দৃঢ়তার স্বীকৃতিস্বরূপ উক্ত ইউনিভার্সিটি পার্লামেন্টে নিউটনকেই তাঁদের প্রতিভূ নিযুক্ত করেন। কিন্তু নিউটন পার্লামেন্টের সদস্যপদ ছেড়ে দিয়ে আবার কেম্ব্রিজে ফিরে আসেন।

এইবার আমরা কিছুক্ষণ নিউটনের বৃত্তান্ত স্থগিত রেখে তাঁর বিখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বী গণিতবিদ লাইবনিজ সম্বন্ধে কিছু বলে নিই। গটফ্রিড উইলহেম লাইবনিজ (Gottfried Wilhelm Leibniz) বয়সে নিউটন থেকে সাড়ে তিন বছরের ছোট। তিনি ১৬৪৬ সালে লাইপজিগ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এখানে তাঁর পিতা নৈতিক ফিলসফির (Moral

Philosophy) প্রফেসর ছিলেন। বাল্যকালেই লাইবনিজ পড়ুয়া ছেলে ছিলেন। তিনি নিজে নিজেই লিভির (Livy) লেখা একখানা চিত্রিত ইতিহাস বই পড়ে লাটিন্ ভাষা শিক্ষা করেন, আর বার বছর বয়সের আগেই গ্রিক ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। এর পর তিনি যুক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, আর পনর বছরে পড়তে না পড়তেই অভিমত পোষণ করতেন যে যুক্তিশাস্ত্রের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় উভয় শিক্ষা-পদ্ধতিরই সংস্কার আবশ্যক। নিউটন যখন কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে পড়তে আসেন, লাইবনিজও ঠিক সেইসময় অর্থাৎ ১৬৬১ সালের শরৎকালে, মাত্র পনর বছর বয়সে ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশ করেন। এখানে তিনি আইন পড়েন — এর শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে ছিল — কেপলার, গ্যালিলিও এবং ডেকার্ট প্রমুখ চিন্তানায়কদের সমুদয় গ্রন্থ ও মতামত যা সে সময় বিজ্ঞান ও দর্শন উভয় ক্ষেত্রেই তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল। ১৬৬৬ সালে, নিউটন যখন 'প্রবাহ-নির্ণয়ী হিসাব প্রণালী' উদ্ভাবন করতে ব্যস্ত লাইবনিজ তখন আইনের ডক্টরেট ডিগ্রীর প্রার্থী হলেন; কিন্তু বয়স কম বলে তাকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হল না। বিরক্ত হয়ে তিনি সেই যে লাইপজিগ ত্যাগ করলেন, আর কোনও দিন সেখানে ফিরে আসেননি। এইবার তিনি আল্টডর্ফ (নুর্নবার্গ) (Altdorf, Nurnberg) ইউনিভার্সিটিতে ডক্টরেট ডিগ্রীর গবেষণামূলক প্রবন্ধ (dissertation) দাখিল করলেন। এখানে ডিগ্রী ত মিললই, সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসরের পদ গ্রহণ করবার জন্যও অনুরোধপত্র পেলেন। কিন্তু লাইবনিজ প্রফেসরের পদ গ্রহণ না করে নুর্নবার্গে স্থায়ীভাবে বাস করবেন স্থির করে কিছুদিনের মধ্যেই আইন শিক্ষার নয়া পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। এই প্রবন্ধ পাঠ করে মেন্‌জ-এর ইলেকটর (Elector of Mainz) এতই চমৎকৃত হন যে, তিনি আইন-পুস্তক সংস্কারের জন্য লাইবনিজকে নিজের সহকারী নিযুক্ত করেন। পরে তিনি অনেক বৈদেশিক মিশন (diplomatic mission)-এ প্রেরিত হন। এই সময় তিনি রাজনৈতিক বিষয়েও কয়েকটা প্রবন্ধ লেখেন। এইসব প্রবন্ধের মধ্যে এমনও ইঙ্গিত ছিল যে, ফ্রান্স ইউরোপীয় শক্তিদের বিশেষতঃ জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে বরং এদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তুর্কিদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড করতে পারে; তা'হলে অনায়াসেই মিসর দখল করে নেওয়া যাবে, আর ফ্রান্সের শক্তিও বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে চতুর্দশ লুই লাইবনিজকে ডেকে পাঠালেন। এতে রাজনৈতিক জগতে বিশেষ লাভ না হলেও বৈজ্ঞানিক জগতের বেশ লাভ হয়েছিল। লাইবনিজ ইতিমধ্যেই আইন, রাজনীতি, যুক্তিবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, ঐশীবিদ্যা (Theology), যন্ত্রবিজ্ঞান (Mechanics), আলোকবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখে যশোলাভ করেছিলেন; আর পাস্কালের হিসাব-যন্ত্রের (Calculating machine) চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ একটি হিসাব-যন্ত্রও উদ্ভাবন করেছিলেন। এই যন্ত্রে শুধু যোগ-বিয়োগ নয়, সহজে গুণ, ভাগ ও বর্গমূল আকর্ষণ [নির্ণয়] করবার উপায়ও ছিল। এখন হাইগেন্‌স-এর কাছে অঙ্কশাস্ত্রও মন দিয়ে শিখতে আরম্ভ করলেন। ১৬৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি মেন্‌জ-এর ইলেকটরের তরফ থেকে বৈদেশিক দূত হিসাবে ইংল্যান্ডেও গমন করেন। এই সময় তিনি রয়াল সোসাইটির সেক্রেটারী ওল্ডেনবার্গের সঙ্গে দেখা করে উক্ত সোসাইটির সামনে তাঁর হিসাব-যন্ত্র প্রদর্শন করেন। ঐ বৎসরই তিনি রয়াল সোসাইটির ফেলো (F.R.S.) উপাধি পান।

জার্মানিতে ফিরবার পর ১৬৭৪ সালে লাইবনিজ বৃত্তের কালি সম্বন্ধে কয়েকটি নতুন উপপাদ্য আবিষ্কার করেছেন বলে ওল্ডেনবার্গকে একখানা পত্র লেখেন। ওল্ডেনবার্গ জওয়াব দিলেন যে, নিউটন আগেই অনুরূপ প্রক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। ১৬৭৬ সালে ওল্ডেনবার্গের মারফত নিউটন লাইবনিজকে একটি পত্র লেখেন, তাতে দ্বৈরাশিক শক্তিপ্রসারণ (binominal expansion), অনন্তরাশি-শ্রেণী (infinite series) ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ছিল। জওয়াবে লাইবনিজ আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠান। নিউটন যে সুদীর্ঘ জওয়াব দিয়েছিলেন, পরে তা ছাপতে ত্রিশ পৃষ্ঠা লেগেছিল; আর শেষে মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি (নিউটন) ১৬৬৯ সালেই 'ব্যারো'র কাছে তাঁর প্রবাহ-নির্ণায়ক হিসাব প্রণালীর একটা খসড়া দাখিল করেছিলেন। যা'হোক, নিউটন লাইবনিজকে উক্ত প্রক্রিয়ার কোনও আভাস বা ব্যাখ্যা দেননি, বরং এর প্রকৃতি গোপন রেখে একটা হেঁয়ালি পাঠিয়েছিলেন —

6a ccd ae 13e ff 7i 31 9n 404qrr 4s9t12vx

নিউটনের উদ্দেশ্যে ছিল, প্রক্রিয়াটা লাইবনিজের কাছে প্রকাশ না করে পরে কোনও সময় দরকার হলে, তিনিই এই প্রক্রিয়ার উদ্ভাবক বলে দাবী করতে পারবেন। আশ্চর্যের বিষয়, নিউটনের মতো প্রতিভাশালী ব্যক্তি কেমন করে তাঁর এই উদ্ভাবনের কৃতিত্ব লাইবনিজের সঙ্গে ভাগ করে নিতে এত অনিচ্ছুক হয়েছিলেন। যা হোক, অবশেষে নিউটন লাইবনিজকে লিখেছিলেন 'স্পর্শ রেখার বিপরীত প্রক্রিয়া' নির্ণয়ের দুটো উপায় তাঁর জানা আছে। এবারেও তিনি তাঁর প্রক্রিয়া উদ্‌ঘাটিত না করে আর একটি হেঁয়ালি দিয়ে চাপা দিয়েছিলেন। (আমরা স্পর্শ-রেখার সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াকে 'খণ্ডিত হিসাব প্রণালী' আর এর বিপরীত প্রক্রিয়াকে 'যোজিত হিসাব প্রণালী' বলে ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি।) লাইবনিজ কিন্তু এর জওয়াবে ২১শে জুন, ১৬৭৭ নিজের উদ্ভাবিত প্রক্রিয়া গোপন করতে চেষ্টা করেননি। তিনি তাঁর 'ব্যবধান' প্রণালী এবং সঙ্কেত অকপটে প্রকাশ করেছিলেন। আমরা বর্তমানে যে dx, dy সঙ্কেত দ্বারা দুটো সন্নিহিত x-এর ব্যবধান এবং এই x-দ্বয়ের সংশ্লিষ্ট দুটো y-এর ব্যবধান বুঝি, তা লাইবনিজ উদ্ভাবিত সঙ্কেত। নিউটনের 'প্রবাহ-নির্ণয়' থেকে লাইবনিজের 'সংশ্লিষ্ট ব্যবধানদ্বয়ের অনুপাত' $\frac{dy}{dx}$ -ই কিছু শ্রেষ্ঠ হওয়ায় আজও আমরা এর সামান্য পরিবর্তিত অর্থে এই $\frac{dy}{dx}$ -ই ব্যবহার করে আসছি। আর লাইবনিজ যে যোজিত হিসাব প্রক্রিয়াও জানতেন, সে পরিচয়ও পাওয়া যায়। ১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দে লাইবনিজ তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁর 'ব্যবধান-প্রণালী' প্রকাশ করেন। তিনি যে এই প্রণালী উদ্ভাবনে নিউটনের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাননি, তা-ও সুস্পষ্ট। সুতরাং ব্যক্তিগত বন্ধুমহলে কে আগে অনুরূপ প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, এসব ঘরোয়া কথায় আমল না দিয়ে জগতের কাছে প্রকাশের অগ্রবর্তিতা বিবেচনা করে এবং 'ব্যবধান-প্রণালী'র আপেক্ষিক উৎকর্ষ বিবেচনা ক'রে, আর নিউটন ও লাইবনিজের এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ পরস্পর নিরপেক্ষতার কথা স্মরণ ক'রে লাইবনিজকেই ক্যালকুলাস

বা 'হিসাব-প্রক্রিয়া'র উদ্ভাবক বলে গণ্য করা মোটেই অসঙ্গত হয় না। অবশ্য বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বজাতি বা স্বদেশপ্রীতি প্রণোদিত এমন অবিচারের দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

১৬৮৪ সালেও নিউটন আর লাইবনিজের সম্পর্কে কোনও তিক্ততা আসেনি। প্রিন্সিপিয়ার প্রথম সংস্করণে (১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দ) নিউটন ও লাইবনিজের মধ্যে যে পত্রালাপ হয় তার উল্লেখ ছিল; আর নিউটন একথাও উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি যে লাইবনিজের কাছে তাঁর নিজের 'প্রবাহ-সংক্রান্ত' প্রণালী একটি হেঁয়ালির মধ্যে গোপন রেখে দিয়েছিলেন, তবু 'সুপ্রসিদ্ধ' লাইবনিজ তাঁর নিজের প্রক্রিয়া তাঁর (নিউটনের) কাছে ব্যক্ত করেছিলেন, যদিও এই দুই প্রক্রিয়ার মৌলিক পার্থক্য বিশেষ কিছুই নাই; যেটুকু পার্থক্য সে শুধু বাচনিক আর প্রতীক ব্যবহারজনিত। [পরে, ১৭২৬ সালে (লাইবনিজের মৃত্যুর দশ বছর পরে) প্রিন্সিপিয়ার তৃতীয় সংস্করণে, নিউটন এই প্যারাগ্রাফটা বাদ দিয়ে দেন।]

১৬৮৪ থেকে ১৬৯৯ সাল পর্যন্ত লাইবনিজ যে 'ব্যবধান-হিসাব প্রণালী'র উদ্ভাবক এ সম্বন্ধে কেউ কোনও সংশয় প্রকাশ করেননি; কিন্তু ১৬৯৯ সালে সুইজারল্যান্ডের একজন অখ্যাত গণিতজ্ঞ রয়াল সোসাইটিতে পঠিত একটি প্রবন্ধে ইঙ্গিত করেন যে, লাইবনিজ নিউটনের 'প্রবাহ-নির্ণয়' প্রণালীর উপর ভিত্তি করেই তাঁর 'ব্যবধান হিসাব প্রণালী'র রূপ দেন। এই সুইস গণিতজ্ঞের খাপ্পা হবার কারণ এই যে, লাইবনিজ বিখ্যাত গণিতজ্ঞদের যে একটা তালিকা প্রস্তুত করে প্রকাশ করেছিলেন, তাতে এই সুইস ভদ্রলোকের নাম ওঠেনি। সে যাহোক, আশ্চর্যের বিষয়, নিউটন নিজে কিংবা ওল্ডেনবার্গ প্রমুখ (যাঁদের কাছে প্রকৃত অবস্থা নিশ্চয়ই অজ্ঞাত ছিল না, তাঁরা) এর প্রতিবাদে টুঁ শব্দটি করেননি। স্বভাবতঃই এতে লাইবনিজের বিরক্ত হবার কথা; তাছাড়া প্রিন্সিপিয়াতে নিউটনের নিজের স্পষ্ট উক্তি থাকতে এমন কথা ওঠেই বা কেন? তাই ভেবে লাইবনিজ কতকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর কাগজে এই আক্রমণের জওয়াব দিলেন, আর রয়াল সোসাইটির কাছে একখানা প্রতিবাদলিপি পাঠালেন।

১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে নিউটন আলোক-বিজ্ঞান সংক্রান্ত একটি পুস্তকের পরিশিষ্টে তাঁর 'প্রবাহ-প্রক্রিয়া'র প্রথম বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। লাইবনিজ ১৭০৫ সালে এ সম্বন্ধে একটি বিরূপ সমালোচনা করেন। লাইবনিজ নিউটনের কাছে এর আগেই তাঁর নিজের 'ব্যবধান প্রক্রিয়া'র সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়েছিলেন, অথচ নিউটন তাঁর প্রক্রিয়া বরাবর গোপন রেখে গিয়েছেন। এর থেকে লাইবনিজের মনে সন্দেহ জেগে থাকবে যে, নিউটন তাঁর প্রক্রিয়াটাই একটু বিভিন্ন আকারে 'প্রবাহ-প্রক্রিয়া' বলে চালিয়ে দিচ্ছেন — বিশেষতঃ যখন সুইস প্রফেসরের অন্যায় আক্রমণের বিষয়টা বিলকুল দেখেও দেখলেন না, আবার তাঁর উক্তিটা নিউটনের প্রিন্সিপিয়ার উক্তির প্রতিধ্বনিও হতে পারে। লাইবনিজ শুধু বলেছিলেন, তাঁর নিজের 'ব্যবধান-প্রক্রিয়া'র স্থলে নিউটন সর্বদাই 'প্রবাহ' শব্দটা ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে ভাব-চুরি বা প্রক্রিয়া-চুরির কোনও ইঙ্গিত না-ও থাকতে পারে; কিন্তু অক্সফোর্ডের একজন স্যাভিলিয়ান প্রফেসর, জন কিইল (John Keill), এই উক্তির ভিতর নিউটনের প্রতি কটাক্ষ আবিষ্কার করে ফেললেন; আর প্রিন্সিপিয়াতে নিউটনের নিজের

উক্তিও উপেক্ষা করে তিনি লাইবনিজকে আক্রমণ করে লিখলেন, নিউটনের কাছ থেকে ভাব-চুরি করে লাইবনিজ অন্য নামে চালিয়ে দিচ্ছেন।

লাইবনিজ আবার রয়াল সোসাইটিতে প্রতিবাদলিপি পাঠালেন; কিন্তু আগেরবারের মতোই এবারও কোনও ফল হল না। বিশেষ করে, ১৭০৩ সাল থেকে আজীবন নিউটন রয়াল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলে তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রিন্সিপিয়ার উক্তিটির পুনরুক্তি করলেই কিইল তাঁর অন্যায় উক্তি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হতেন, ব্যাপারটাও মিটমাট হয়ে যেতো; কিন্তু নিউটনের আনুপূর্বিক ব্যবহারে, (বিশেষ করে তাঁর 'স্নায়বিক ক্রিয়াহীনতা'র অবস্থা পার হবার পর) তাঁর প্রকৃতিতে বিনয় বা ঔদার্যের বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট ছিল বলে মনে হয় না। তিনি সমালোচনা একটুও সহ্য করতে পারতেন না। ১৭০৫ সালের লেখা 'প্রবাহ-প্রণালী' সম্বন্ধে লাইবনিজের সমালোচনা নিউটনের মনে শেলের মতো বিঁধেছিল, তাই তিনি বা রয়াল সোসাইটির পক্ষ থেকে আর কেউ, কিইল-এর উক্তি প্রত্যাহার করবার কোনও কথাই তুললেন না। এর বদলে একটি কমিটি গঠন করা হল। তার রিপোর্ট বেরোলো সাত বছর পর ১৭১২ সালে; তাতে বলা হল, 'কিইল যা করেছেন, ঠিকই করেছেন, আর তাতে লাইবনিজের প্রতি কোনও অন্যায় করা হয়নি।' ১৭১৫ সালে এই রিপোর্টের পূর্ণ বিবরণ রয়াল সোসাইটির Transaction-এ প্রকাশিত হয়।

মজার কথা এই যে, ব্রুস্টার (Brewster) তাঁর নিউটন-জীবনী গ্রন্থে বলেছেন, এই রিপোর্টের মূল খসড়ার প্রায় সমস্তটাই নিউটনের নিজের হাতের লেখা। এর থেকেই রিপোর্টের সুবিচারের নমুনা টের পাওয়া যাচ্ছে।

এর পর থেকে এই ঝগড়া ক্রমশঃ আরও কদর্য হয়ে পড়তে লাগল। এমন কি, লাইবনিজ ও নিউটনের মৃত্যুর পরেও অনেকদিন ধরে এর জের চলেছিল। ইংল্যান্ড ও জার্মানি উভয় স্থানেই ব্যাপারটা শেষমেষ দাঁড়াল জাতীয় গৌরবের। আজ দুই শতাব্দী পরে, এই বিবাদ অত্যন্ত অনর্থক ছেলেমানুষি বলে মনে হয়। দুইটি বিরাট সক্রিয় মন কাজ করে চলেছিল অতীতের ভিত্তির উপর। কাজে কাজেই তাঁরা যে প্রায় একই ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? বলতে গেলে 'খণ্ডিত হিসাব-প্রণালী'র আদি উদ্ভাবক হিসাবে ফরাসি গণিতজ্ঞ ফের্মা, আর 'যোজিত হিসাব-প্রণালী'র আদি উদ্ভাবক হিসাবে গ্রিক বৈজ্ঞানিক ও গণিতজ্ঞ আর্কিমিডিসের নাম করলেও বোধহয় অন্যায় হবে না। আসলে প্রাচীন মহারথীদের কাঁধে চড়েই ত সমুদয় জ্ঞান-বিজ্ঞান অগ্রসর হয়েছে।

১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দে 'খণ্ডিত হিসাব-প্রণালী'র যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিশপ বার্কলী (Bishop Berkeley) কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি উত্থাপন করেন। বিশপ বার্কলী আয়ার্ল্যান্ডের লোক, তিনি কয়েক বৎসর তৎকালীন বৃটিশ কলোনী রোড্ (Rhode) দ্বীপে অতিবাহিত করে সেখানকার ইয়েল কলেজের উন্নতির জন্য বিশেষ আগ্রহের পরিচয় দেন। ইংল্যান্ডে ফিরে আসবার পর তাঁকে আয়ার্ল্যান্ডের কর্ক কাউন্টি 'ক্লয়েন-এর বিশপ' পদে নিযুক্ত করা হয়। এছাড়া তিনি সুইফ্‌ট, স্টীল, য়্যাডিসন প্রমুখ সাহিত্যিক মহলেও বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

বার্কলী বললেন, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংখ্যা ব্যবহার করে যে প্রণালীতে যুক্তি করা হয়, তা ভ্রমাত্মক, সুতরাং এর থেকে যেসব সিদ্ধান্ত হয়, সেগুলোও মানা যায় না। যদি সত্য সিদ্ধান্তও হয়, তবু তা এক ভুলের দ্বারা আর এক ভুল কাটা যাওয়ার ফলেও হতে পারে। এইসব সমালোচনা বেরিয়েছিল Analyst নামক একখানা বইয়ে। এ-বইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই প্রমাণ করা যে, খ্রীস্টান ধর্মের মতবাদগুলোও সমসাময়িক গাণিতিক ভাবধারার চেয়ে কম বিশ্বাস্য নয়, অথবা অধিক অবিশ্বাস্য নয়। তিনি বললেন, আজকাল Fluxion বা প্রবাহের কথা শুনতে পাচ্ছি, এই প্রবাহ কি? না — 'বিলীয়মান বৃদ্ধির হার।' 'আর এইসব বিলীয়মান বৃদ্ধিই বা কি বস্তু?' এগুলো কোনও নির্দিষ্ট পরিমিত সংখ্যাও নয় বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নির্দিষ্ট সংখ্যাও নয়, আবার একদম শূন্যও নয়। তা'হলে যদি আমরা বলি, 'ওগুলো অতীত বা বিগত পরিমাণের ছায়া বা ভূত মাত্র — তাহলে এমন ভুলটাই বা কী হল।'

বার্কেলীর সমালোচনার ফল ফললো। একজন স্কটল্যান্ডের গণিতজ্ঞ কলিন ম্যাক্লরিন (Colin Maclaurin, ১৬৯৮-১৭৪৩), ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে 'প্রবাহ-প্রণালী' সম্বন্ধে এক পুস্তক প্রণয়ন করলেন। তিনি নিউটনের সিদ্ধান্তের যুক্তিযুক্ততা জ্যামিতিক উপায়ে প্রমাণ করে বার্কেলীয় সমালোচনা খণ্ডন করলেন; সে যা'হোক, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে সীমার ধারণা ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে হতে বর্তমানে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংখ্যা (ও এর সঙ্গে জড়িত অনন্তের ধারণা) সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে যুক্তির সাহায্যে 'খণ্ডিত-হিসাব' বা 'প্রবাহ-হিসাব'কে সমালোচকদের হাত থেকে রক্ষা করা গেছে। ইত্যবসরে সুইজারল্যান্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্সের গণিতজ্ঞেরা লাইবনিজের 'ব্যবধান-হিসাব'-এর উপরও এই 'সীমা'র ধারণা প্রয়োগ করে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে এ-সম্বধে আরও আলোচনা করা যাবে। এখন নিউটনের জীবনের শেষ পর্যায়টার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

০ ০ ০ ০ ০

গণিতের দিক থেকে বিচার করলে, নিউটন তাঁর জীবনের শেষের ত্রিশ বছর নিষ্ফলভাবে ব্যয় করেছেন। তিনি কেম্ব্রিজ-সদস্য হিসাবে যখন লন্ডন নগরে পার্লামেন্টে যাতায়াত করেছিলেন, সে সময় বিখ্যাত দার্শনিক জন লক (Locke)-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সে সময় লক, নিউটন এবং এঁদের আরও দুই-একজন বন্ধু আলোচনা করে স্থির করলেন যে, দেশের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর গণিতজ্ঞেরা যে সামান্য বেতনে কলেজের প্রফেসারি বা ফেলোগিরি করতে বাধ্য হন, এটা অত্যন্ত অসহনীয় অবিচার। এঁদের চেষ্টায় ১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে নিউটন টাকশালের ওয়ার্ডেন নিযুক্ত হলেন, বেতন বছরে ৫০০ পাউন্ড (তখনকার ক্রয়ক্ষমতা ধরলে বর্তমান মূল্য দাঁড়ায় ১২,০০০ ডলার)। কিন্তু এ কাজে এত কম সময় দিতে হত যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কেম্ব্রিজের প্রফেসরের চাকরিটাও বজায় রাখলেন। ১৬৯৭ সালে তিনি টাকশালের মাস্টার নিযুক্ত হলেন — বেতন ওয়ার্ডেনের বেতনের দ্বিগুণ ও তিনগুণের মধ্যে। তিনি তখন কেম্ব্রিজে তাঁর কাজ চালাবার জন্য একজন ডেপুটি নিযুক্ত করলেন — অবশ্য তিনি নিজে কেম্ব্রিজ থেকে পুরো বেতনটাই

নিতেন। যা হোক, ১৭০১ সালে তিনি ট্রিনিটির ফেলোগিরি আর লুকাসিয়ান প্রফেসরগিরি দুটো থেকেই ইস্তফা দেন। আগেই বলা হয়েছে ১৭০৩ সালে তিনি রয়াল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। এর দু'বছর পরে রানী এ্যান্ তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সময় উইনস্টন চার্চিলের পূর্বপুরুষ মার্লবরোর ডিউক সামরিক কমান্ডার হিসাবে যশস্বী হয়েছিলেন। রানী এ্যান-এর মৃত্যুর পর লাইবনিজের প্রভু — হানোভারের ইলেকটর প্রথম জর্জ উপাধি নিয়ে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেন। ১৭১৪ সালে রাজকীয় নৌ-বাহিনীর কয়েকজন ক্যাপ্টেন পার্লামেন্টে এক দরখাস্ত পেশ করেন যে, সমুদ্রে জাহাজের দ্রাঘিমা নির্ণয় করবার একটা সহজ ও নির্ভুল উপায় বের করবার উপযুক্ত পন্থা নির্ণয় করা হোক। এই উপলক্ষে পার্লামেন্টের এক সভায় বিভিন্ন প্রস্তাব বিবেচিত হয়। এই সভায় নিউটনের অভিমত গ্রহণ করা হয়। নিউটন সব প্রস্তাবেরই খুঁত বের করলেন, অবশেষে তাঁর প্রস্তাব অনুসারে সমুদ্রে দ্রাঘিমা মাপবার নিখুঁত উপায় বের করবার জন্য দেশ-বিদেশে প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করা হল। সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ের জন্য প্রথম পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুরস্কারের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে বিশ হাজার, পনর হাজার ও দশ হাজার পাউন্ড। ইয়র্কশায়ারের একজন ঘড়িনির্মাতা জন হ্যারিসন প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৭২৫ সালে নিউটন এডিনবরা ইউনিভার্সিটির কাছে একজন উপযুক্ত ডেপুটি প্রফেসর চেয়ে পাঠালেন — বেতন তিনিই দেবেন। কলিন ম্যাক্লরিন এই পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। (অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পুরো প্রফেসর হয়ে যান)।

জীবনের শেষ পর্যায়ে নিউটন ঐশী-বিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র পড়াশুনা করেন। এই সময় তাঁর শরীর বিশেষ ভাল যাচ্ছিল না, তবু তিনি রয়াল সোসাইটির সভায় প্রেসিডেন্ট হিসাবে সর্বদাই উপস্থিত থাকতেন। ১৭২৭ সালের ২০শে মার্চ তারিখে নিউটন ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁকে ওয়েস্টমিনস্টার য়্যাব্বি (Westminster Abbey)-তে সমাহিত করা হয়।

দুঃখের বিষয়, নিউটনের মতো এমন একজন মনীষী তাঁর প্রতিভাকে গবর্নমেন্টের উচ্চপদের মোহে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে, এক প্রকার বৃথা ব্যয় করে দিলেন। তিনি যদি আর্কিমিডিসের মতো সারাজীবন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় নিয়োজিত থাকতেন, তা' হলে হয়ত মানবীয় জ্ঞানকে আরও উচ্চসীমায় পৌছিয়ে দিয়ে যেতে পারতেন। তবু তাঁর মধ্যজীবনের ১৬৬৫ থেকে ১৬৮৭ সালের মধ্যেই তিনি গণিত ও পদার্থবিদ্যার যে প্রভূত উন্নতি সাধন করে গিয়েছেন, তার তুলনা বিরল। আর্কিমিডিসের পর আঠার শতাব্দীর মধ্যে যত মহানীষার জন্ম হয়েছে, তারমধ্যে একমাত্র নিউটনকেই আমরা আর্কিমিডিসের সমকক্ষ বলতে পারি — কিন্তু সে নিউটন টাকশালের মাস্টার নিউটন নন, তিনি প্রিন্সিপিয়ার প্রণেতা, আর বিশ্বজাগতিক মাধ্যাকর্ষণের প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

লাইবনিজ, গউস ও পরবর্তীগণ

নিউটনের মৃত্যুর পর এক শতাব্দীরও অধিককাল যাবৎ ইংল্যান্ডের গণিতজ্ঞেরা লাইবনিজের অনুবর্তীদের সঙ্গে অনর্থক বাদ-বিতণ্ডায় এত অধিক মশগুল হয়ে রয়েছিলেন যে, ওদিকে ইউরোপীয় মহাদেশে হিসাব-প্রণালীর যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হল সে দিকে তাঁরা দৃষ্টিপাতই করতে পারেননি।

নিউটনের মতো লাইবনিজও মনে করতেন, যে-কোনও পরিবর্তনশীল পরিমাণই হঠাৎ এক বারে পরিবর্তিত না হয়ে বারে বারে সামান্য পরিমাণ বাড়তে বাড়তে বা কমতে কমতে বা বাড়া-কমা করতে করতে কোনও নির্দিষ্ট মান থেকে অন্য নির্দিষ্ট মানে উপনীত হয়। এইসব ক্ষুদ্র পরিমাণ বুঝতে লাইবনিজ পরিবর্তনশীল সংখ্যা বা বস্তুর প্রতীকের আগে একটি 'd' অক্ষর দিয়ে ঐ সংখ্যা বা বস্তুর অতিক্ষুদ্র পরিবর্তন নির্দেশিত করতেন। যেমন dx বলতে বুঝায় x নামক সংখ্যা বা বস্তুটির পরিমাণ যেন x_1 থেকে সামান্য একটু বেড়ে x_1+dx বা x_2 হয়ে গেল। সুতরাং এই dx টুকু একটা অতিক্ষুদ্র x-জাতীয় সংখ্যা বা পরিমাণ। এইভাবে x-এর বৃদ্ধিজনিত y-এর অতিক্ষুদ্র পরিবর্তনটুকুর পরিমাণ dy। লাইবনিজ ১৬৭৭ খ্রীস্টাব্দে নিউটনের কাছে যে পত্র দেন, তাতে এই কথার সবিশেষ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

নিউটনের মতো লাইবনিজও সর্বদা একইভাবে dx ও dy-এর প্রকৃতি স্পষ্ট ও যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থিত করতে পারেননি। তিনি কখনও বলেছেন dx ও dy সসীম রেখা, আবার কখনও বা বলেছেন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংখ্যা বা পরিমাণ। মনে হয়, তাঁর মতে যে - কোনও সীমায়িত (finite) পরিমাণ, অগণিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাণের সমষ্টি দ্বারা গঠিত হয়। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাণের ক্ষুদ্রতার সীমা নির্দেশ করা না হলেও এদেরও নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে; আর 'অগণিত' বলতে সংখ্যায় অত্যন্ত অধিক হলেও তা (অন্ততঃ কল্পনার সাহায্যে) গণনীয় বটে। যে সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের সংযোগে নির্দিষ্ট পরিমাণ গঠিত হয়, সেগুলো সমান সমান অংশ। তাই $\frac{dy}{dx}$ বলতে তিনি y-এর ক্ষুদ্রাংশ আর x-এর ক্ষুদ্রাংশের অনুপাত বুঝতেন, আর এই অনুপাতের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে বলে মনে করতেন। এই মত অনেকদিন হল পরিত্যক্ত হয়েছে বটে; কিন্তু এখনও আমরা $\frac{dy}{dx}$ দ্বারা x-এর উপর

নির্ভরশীল y-এর 'derivative' বা 'উৎপাদিকা' বুঝে থাকি। আসলে কিন্তু এটি অতিক্ষুদ্র dy আর অতিক্ষুদ্র dx-এর অনুপাতের চেয়ে কিছু ভিন্ন জিনিস। তাই x-এর নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষুদ্র বৃদ্ধিকে Δx, আর y-এর সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র বৃদ্ধিকে Δy বলে আমরা $\frac{dy}{dx}$ বলতে বুঝি $\lim\frac{\Delta y}{\Delta x}$, বেশ জবরজঙ্গ ব্যাপার। এর মানে হচ্ছে Δx-কে ক্রমশঃ কমাতে কমাতে একদম শূন্যের কাছে এনে ফেললে $\frac{\Delta y}{\Delta x}$নামক অনুপাতটার একটা নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছোতে চায়, $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ -এর এই সীমার নাম $\frac{dy}{dx}$। বর্তমানে অনেক সময় $\frac{dy}{dx}$-এর স্থলে Dy বা $D_x y$ ব্যবহার করা হয়। 'উৎপাদিকা' যে দুটো ক্ষুদ্র অথচ নির্দিষ্ট পরিমাণের অনুপাত নয়, তার উপর জোর দিবার জন্যই D-এর প্রচলন হচ্ছে। বলা যেতে পারে $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ -এর 'সীমান্ত' অনুপাতের নাম $\frac{dy}{dx}$ বা উৎপাদিকা। যুক্তিশাস্ত্রের মান রক্ষার জন্যই এত সতর্কতা; তবে বার্কেলী বেঁচে থাকলে তিনি এতেও নিঃসন্দেহ হতেন কিনা সন্দেহ। তিনি হয়ত বলতেন Δx একেবারে শূন্য হয়ে গেলে যখন এই অনুপাতের কোনও মানেই হয় না, তখন এটা 'শূন্যের ছায়া' বা 'শূন্যের ভূত' ছাড়া আর কিছুই নয়।

Derivative বা 'উৎপাদিকা'কে অনেক সময় 'Differential Co-efficient' বলা হয়; এই co-efficient একটা হার, অর্থাৎ x-কে শূন্যের থেকে সামান্য একটু বাড়ালেই y-এর পরিমাণ যে হারে বাড়ে তাই; আর y-এর বৃদ্ধিটাকে বলে differential। অতএব দেখা যাচ্ছে, আমরা অনেক কায়দা করেও হার বা অনুপাতের ধারণাটা একদম বিদায় করে দিতে পারছিনে।

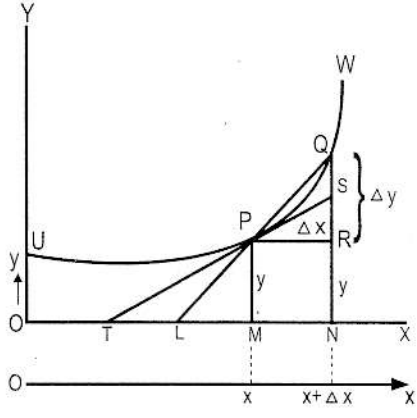

কথাটা একটু বুঝে দেখবার চেষ্টা করা যাক।

ধরুন, OX আর OY যেন কাগজের সমতলে যথাক্রমে x আর y-এর অক্ষরেখা। x যখন o, y তখন OU; x যখন x=OM, y তখন MP; x যখন x+Δx=ON, y তখন NQ। এইভাবে x যখন x-অক্ষ দিয়ে ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে, তখন y-এর মাথাটা যেন UPQW রেখাটির উপর দিয়ে যাচ্ছে। y-এর এই চলনকে নিউটন fluxion বা প্রবাহ বলেছিলেন। আবার x যখন বাড়তে বাড়তে x+Δx হল, y যেন তখন MP=y থেকে NQ=y+Δy হয়ে গেল। সুতরাং x-এর বৃদ্ধি Δx, আর তজ্জনিত y-এর বৃদ্ধি হল Δy। এই বৃদ্ধির হার হল $\frac{\Delta y}{\Delta x}$, এক্ষেত্রে $\frac{RQ}{PR}$। অবশ্য এই হার সাধারণতঃ Δx-এর উপর নির্ভর করে। আমরা নির্ণয় করতে চাই, কিছুটা চলতে চলতে যখন P-তে পৌঁছে গেছে, ঠিক সময়ে y-এর বৃদ্ধির হার আর x-এর বৃদ্ধির হারের মধ্যে সম্পর্ক কি? অর্থাৎ x এক একক

বাড়লে y কয় একক বাড়বে? আমরা এক দিকে বলছি, '(x,y) বিন্দুটা যখন P-তে পৌঁছে গেছে' আবার সঙ্গে সঙ্গে 'x-এর বৃদ্ধি y-এর বৃদ্ধির' কথাও বলছি। কথা দুটোর মধ্যে সামান্য একটু বৈপরীত্য আছে বৈ কি! আবার এ-ও ঠিক, বিন্দুটা তো আর P-তে বসে থাকেনি; গতি না থাকলে Q-তে যায় কি করে? যুক্তিশাস্ত্রের ফ্যাঁকড়া এখানেই। লাইবনিজ অবশ্য, x-এর গতির উপর বিশেষ জোর না দিয়ে এর বিভিন্ন অবস্থানের উপরেই জোর দিয়েছেন — বিভিন্ন অবস্থান অবশ্য, বিশেষ বিশেষ স্থিতাবস্থা। তিনি differential বা ব্যবধানের উপর বেশী জোর দিয়েছিলেন। এখানে গতির চিন্তা না করেও x-এর দুটো অবস্থানের মধ্যে ব্যবধানের কথা ভাবা যায়। Δx যখন MN=PR, তখন $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{RQ}{PR} = \tan RPQ = \tan NLQ = \tan\theta_0$। এখন Q বিন্দুর অবস্থান ক্রমশঃ P-এর দিকে অথবা N-এর অবস্থান M-এর দিকে প্রায় গায় গায় ঘেঁষে লাগালেও N আর M-এর মধ্যে অসংখ্য বিন্দুর ব্যবধান থাকে, আর Q যদি একদম P-এর উপরে এসে পড়ে, তা'হলে Δx আর Δy দুটোই শূন্য হয়ে যায়। এমন অবস্থায় SPT যদি P বিন্দুতে UPQW রেখাটির উপর স্পর্শ রেখা হয়, তা'হলে বলা হয় $\frac{dy}{dx} = \frac{RS}{PR} = \frac{NS}{TN} = \tan\theta$; এই $\tan\theta$ বা $\frac{dy}{dx}$-কেই $\frac{\Delta y}{\Delta x}$-এর 'সীমান্ত অনুপাত' বা 'উৎপাদিকা' বা derivative নাম দেওয়া হয়। এটাকে সংজ্ঞা হিসাবে ধরে নেয়া যেতে পারে। সুতরাং এই সংজ্ঞা অনুসারে $\frac{dy}{dx}$ বা Dy-কে $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ -এর সীমান্ত অনুপাত বলা যেতে পারে। তখন আমরা Δy বা $\frac{dy}{dx}$ Δx-কে, differential, এমনকি $\frac{dy}{dx}$ dx-কেও differential বলে গণ্য করতে পারি। অবশ্য, তবুও ভাবতে হবে, dx প্রায় শূন্যের কাছাকাছি; আবার Δx ও শূন্যের যত কাছাকাছি হবে ততই differential-এর মান-নির্ণয়ে ভুল কম হবে। ব্যাপারটা তা'হলে এই দাঁড়ালো: $\frac{dy}{dx}$ =tan θ হচ্ছে সঠিক পরিমাণ, এর মধ্যে ভুল নেই; আর $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ =tan θ_0 হচ্ছে 'সন্নিকট' পরিমাণ, Δx (সুতরাং Δy)-এর পরিমাণ যত কম হবে সামীপ্য ততই নির্ভুল হবে। এতেও যে সব সমস্যা মিটে গেল, তা হয়ত শুধু যুক্তি দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা কঠিন হবে। ঐ একটুখানি 'কি যেন' থেকেই গেল। গতি-বিজ্ঞানে কোনও বিশেষ মুহূর্তে (velocity) বা 'বেগ'-এর যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তা এইরকম:– যে-কোনও নির্দিষ্ট মুহূর্তে, একটি গতিশীল বিন্দুর বেগ অপরিবর্তিত থাকলে ঐ বিন্দু প্রতি সেকেন্ডে যতদূর যেতো তাই উক্ত মুহূর্তে ওর প্রতি সেকেন্ডের গতিবেগ। এখানে 'বেগ অপরিবর্তিত থাকলে' কথাটায় বার্কেলী নিশ্চয়ই আপত্তি তুলতে পারেন; কারণ, এখানে 'যে গতি অতীত হয়ে গেছে তার ছায়া বা ভূত' কল্পনা করা হচ্ছে। তা' যতই সন্দেহ থাক, আসলে $\frac{dy}{dx}$ =tan θ মেনে নেওয়াতে কোনও প্রকৃতি-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি বলে, হয়ত পাল্টা বলা যেতে পারে, যুক্তি ঠিকই আছে; এখন যুক্তিশাস্ত্র এর অনুগত করে প্রমাণ গড়ে নিক।

লাইবনিজ Calculus Summatorius বা 'যোজিত হিসাব-প্রণালী' সম্বন্ধেও প্রথমে ১৬৮৪ সালে, পরে আবার ১৬৮৬ সালে, প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন। আমরা এখন যে 'যোজন চিহ্ন', $\int$ (Sign of integration) ব্যবহার করি, এটা লাইবনিজের কাছ থেকেই নেওয়া।

লাইবনিজ 'যোজন-প্রণালী'কে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ক্ষেত্রফলের যোগফল হিসাবেই বর্ণনা করেছেন। ব্যবহারিক দিক দিয়ে এর একটা বিশেষ মূল্য আছে। নিউটন একে 'স্পর্শ রেখা প্রক্রিয়া' বা 'খণ্ডিত হিসাব প্রক্রিয়া'র বিপরীত প্রক্রিয়া হিসাবেই গণ্য করেছিলেন। নিউটনের ধারণারও উপপত্তিক বা উপপাদ্যিক মূল্য আছে।

এই দুই ধারণার যে-কোনও একটা স্বীকার করে নিলেই অপরটি তার থেকে যুক্তির সাহায্যেই এসে পড়ে। তাই কোনটাকেই অপরটি থেকে ভাল বা মন্দ বলা যায় না; তবে এ কথা ঠিক, আমরা কি 'খণ্ডিত-প্রণালী'তে, কি 'যোজিত-প্রণালী'তে লাইবনিজের সঙ্কেতাদি আজও ব্যবহার করছি। এর থেকে মনে হয়, হয়ত তাঁর প্রক্রিয়াই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অধিক স্বাভাবিক ছিল। অবশ্য মনে রাখতে হবে শুধু নিউটন আর লাইবনিজ থেকেই যে 'যোজিত-হিসাব'-এর সূচনা হয়েছে, তা নয়। বহু পূর্বে আর্কিমিডিস, তারপর ক্যাভালিয়ারী, প্যাস্কাল, ওয়ালিস প্রমুখ এর অনুরূপ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে গেছেন।

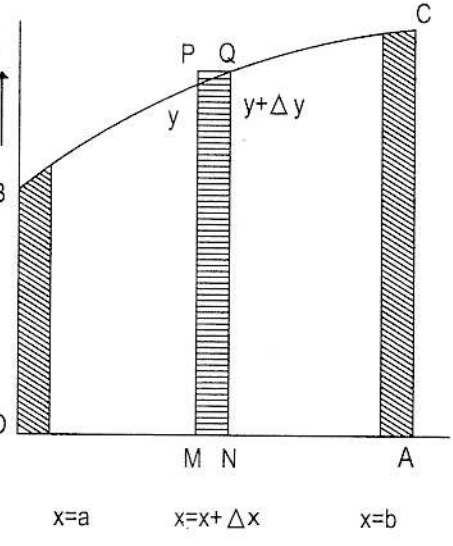

চিত্রে x ও y-এর মধ্যেকার সম্পর্ক BPQC রেখা দ্বারা দেখান হয়েছে। সম্পর্কটি যাই হোক না কেন, তাকে $y=\int(x)$ বলে প্রকাশ করা যায়, অর্থাৎ y হচ্ছে x-এর ফাংশন বা x-এর উপর নির্ভরশীল। a ও b-এর মধ্যে x-এর যেকোনও মানই নেওয়া হোক না কেন, তার সংশ্লিষ্ট y-এর একটি মাত্র নির্দিষ্ট সীমিত মান রয়েছে। চিত্রে P ও Q বিন্দুর অবস্থান যথাক্রমে (x,y) ও (x+Δx, y+Δx)। এখানে MNQP-এর ক্ষেত্র-পরিমাণ yΔx-এর চেয়ে কিছু বেশী, আবার (y+Δy)Δx-এর থেকে কিছু কম। Δx-এর পরিমাণ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র করে দিলে ক্ষেত্র-পরিমাণ দুটোর মধ্যে পার্থক্য খুব কমে আসবে, তখন তাকে প্রায় yΔx বলা যেতে পারে। এখন MNQP-এর মতো ক্ষেত্র-পরিমাণ একেবারে O থেকে শুরু করে A-তে এসে শেষ করলে সমগ্র OACB পরিমাণ ক্ষেত্রফল সীমাবদ্ধ হবে। এই ক্ষেত্রফল বহুসংখ্যক MNQP-এর মতো আংশিক (বা খণ্ডিত) ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান। এখন Δx-কে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র করায় যদি আমরা এর বদলে dx লিখি, তাহলে MNQP-এর ক্ষেত্রফল =ydx, আর সমগ্র OACB-র ক্ষেত্রফল $= \int_a^b ydx$। যোজন চিহ্নের নিচে a আর উপরে b দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, ক্ষেত্রফলের ভূমি x=a থেকে x=b পর্যন্ত অর্থাৎ OA পর্যন্ত বিস্তৃত। এস্থলে a ও b কে যোজনের নিম্নসীমা ও উচ্চসীমা বলে। আরও দেখা

যাচ্ছে x সামান্য একটু অর্থাৎ dx পরিমাণ বাড়লে ক্ষেত্রফল বাড়ে ydx পরিমাণ। এখানে y (লম্বাক্ষ বা কোটি)-কে বলা যায় ক্ষেত্রফলের বর্ধন-হার। সে যা হোক, $y=\int(x)$ দেওয়া থাকলে, আমরা এমন আর একটা function (নির্ভরণ), F(x) বের করতে পারি, যার খণ্ডাংশ হবে $\int(x)$। $\int(x)$ থেকে F(x) নির্ণয় করবার প্রক্রিয়াকেই নিউটন 'স্পর্শ রেখার বিপরীত' প্রক্রিয়া বলে উল্লেখ করেছেন। নিউটনের বর্ণনা দ্বারা অর্থটি পরিষ্কার বুঝা যায় না। যা হোক, আজকাল F(x)-কে integrand বলা হয়, তাতে বিখণ্ডনের উল্টো জোড়ন বা সংযোজন বুঝায়। এ স্থলে হিসাব করে ক্ষেত্র পরিমাণ দাঁড়ায় F(b)--F(a)। এতে শুধু $\int(x)$ থেকে F(x) বের করতে পারলেই আর অগণিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ক্ষেত্রফল নির্ণয় ক'রে যোগ দেবার প্রয়োজন নেই, কেবল উচ্চসীমার 'সংযোজন' থেকে 'নিম্নসীমার সংযোজন' বাদ দিলেই ক্ষেত্র পরিমাণ পাওয়া যায়।

লাইবনিজ যে শুধু 'খণ্ডিত আর যোজিত' হিসাব-প্রণালীই উদ্ভাবন করেছিলেন, তা' নয়। তিনি বহু সময় ব্যয় করে পররাষ্ট্র-ঘটিত কূটনৈতিক কাজও করেছেন। তিনি চতুর্দশ লুই-এর সমর-অভিযান জার্মানির থেকে তুর্কির বিরুদ্ধে ফিরিয়ে দেবার যে ফন্দি করেছিলেন, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। পরবর্তী কূটনৈতিক কাজ তিনি মেনজের ইলেকটরের জন্য না করে ব্রান্সউইক পরিবারের পক্ষ থেকেই করেছিলেন। তিনি ১৬৭৩ সালে ব্রান্সউইকের ডিউক ল্যুনবার্গ বা হানোভারের অধীনে নৌকরি গ্রহণ করে পরবর্তী চল্লিশ বছর যাবৎ সেখানেই পর পর চারজন ডিউকের অধীনে কাজ করেন। কাগজ-পত্রে তাঁর চাকরি ডিউকের লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান হিসাবে থাকলেও প্রায়ই দেশ-বিদেশে কূটনৈতিক মিশনে যাওয়ার জন্য তাঁর ডাক পড়তো। এই ব্যাপারে তিনি হানোভারের ডিউককে ইলেকটর পদে উন্নীত করবার জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত ছয় সাতটি জার্মান রাজ্যের রাজারা নির্বাচক বা ইলেকটর হিসাবে ভোট দিয়ে 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের রাজাধিরাজ' (Emperor)-কে নির্বাচিত করতেন (যদিও সপ্তদশ শতাব্দীতে 'রাজাধিরাজ' কেবল নাম মাত্র মহারাজের পর্যায়ে গিয়ে পড়েছিলেন)। তাঁর ডিউক প্রভুদের দাবী জোরদার করবার জন্য তিনি বহু মূল্যবান সময় নষ্ট করে ব্রান্সউইক-ল্যুনবার্গ পরিবারের একখানা ইতিহাস রচনা করেন; তবু তিনি ৭৬৪ থেকে ১০০৫ খ্রীস্টাব্দের বেশী এগুতে পারেননি। এই উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি ১৬৮৭ সাল থেকে ১৬৯০ সাল পর্যন্ত জার্মানি ও ইটালির বহু স্থানে ভ্রমণ করেন। এই সময় প্রটেস্টান্ট ও ক্যাথলিক মতবাদীদের মধ্যে পুনর্মিলন স্থাপনের জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব হয়ে তিনি একখানা পুস্তক রচনা করেন; কিন্তু তা' প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর শতাধিক বছর পরে, ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে। এত দিনে পুনর্মিলনের আশা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

১৭০০ খ্রীস্টাব্দে একটা একাডেমী খুলবার পরিকল্পনা নিয়ে তিনি বার্লিন পরিদর্শন করেন। ১৭১১ খ্রীস্টাব্দে তাঁকেই এই একাডেমীর প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয়। তিনি পিটার-দি-গ্রেট-এর আমন্ত্রণে সেন্টপিটার্সবার্গেও একটা একাডেমী খুলবার খসড়া প্রণয়ন করেন। তাঁর খসড়া অনুমোদিত হয়েছিল; কিন্তু মহান পিটারের অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ায়, তাঁর পত্নী প্রথম ক্যাথারিনের আমলে তা' কার্যে পরিণত করা হয়। ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে

লাইবনিজ জার্মান সাম্রাজ্যের ব্যারন উপাধিতে ভূষিত হন। তবে এই আকাঙ্ক্ষিত সম্মানই তাঁর জীবনের শেষ সম্মান হয়েছিল; এরপর তিনি কতকটা অবহেলার মধ্যেই জীবনযাপন করেন। ১৭১৪ খ্রীস্টাব্দে ইলেকটর জর্জ লুই, প্রথম জর্জ নাম ধারণ করে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। লাইবনিজ ইংল্যান্ডে তাঁর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁকে হানোভারে থেকেই ব্রান্সউইক পরিবারের ইতিহাস রচনার কাজ করে যেতে বলা হয়। ১৭১৬ সালে তিনি বন্ধুহীন উপেক্ষিত অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। একমাত্র তাঁর সেক্রেটারী 'একহার্ট' ছাড়া আর কেউ তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে যাননি। বার্লিনে যেখানে তিনি একাডেমী স্থাপন করে তার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, কিংবা লন্ডনে যেখানে তাঁর পুরাতন প্রভু রাজত্ব করছিলেন, কোথাও তাঁর মৃত্যুতে কোনও সাড়া পড়ে নাই; কেবল ফ্রেঞ্চ একাডেমী তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে সম্মান প্রদর্শন করেছিল।

সারাজীবনই লাইবনিজ খুব দ্রুততার সঙ্গে, আর একাদিক্রমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কাজ করে গেছেন। এমন কি, ভ্রমণ করবার সময়ও তিনি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতেন। এছাড়া তিনি দর্শন সম্বন্ধেও বিস্তারিত প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেছিলেন। এগুলোতে কিছুটা ডেকার্টের মত আর কিছুটা স্পিনোজার মতের ছায়া দেখা যায়। ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি দর্শন বিষয়ে একখানা পুস্তক রচনা করে একপ্রকার গণিতাশ্রয়ী তর্কশাস্ত্র প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। তাতে অঙ্কের মতো প্রতীক এবং নিয়ম-কানুন থাকবে, আর এক একটা বিষয় পৃথকভাবে চিন্তা করা লাগবে না। তাঁর মতে, এই প্রতীক যে-কোনও ভাষায় বোধগম্য হবে, আর সত্য-মিথ্যা শুধু মতামতের ব্যাপার না হয়ে — হিসাবের শুদ্ধতা বা অশুদ্ধতার ব্যাপার হয়ে পড়বে।

আজকার দিনে, লাইবনিজকে স্মরণ করি তাঁর রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক বুদ্ধির জন্য নয়, তাঁর ঐশীতত্ত্ব, বিজ্ঞান বা দর্শনের জন্যও নয়, বরং ক্যালকুলাস বা 'হিসাব-প্রণালী'র উন্নয়নে তাঁর বিরাট দানের জন্যই। প্রথম প্রথম জার্মান গণিতজ্ঞদের কেউ তাঁর 'হিসাব-প্রণালী'র উন্নয়নে বিশেষ নজর দেননি। হয়ত তাঁর বিবৃতি অনেক সময় তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হত। যা হোক, তাঁর প্রবন্ধাবলীর প্রতি সুইজারল্যান্ডের খ্যাতনামা গণিতবিদ জ্যাকব বার্নৌলী অতিশয় আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

বার্নৌলী পরিবারে কমসে কম আটজন বিখ্যাত গণিতবিদ জন্মেছেন। তাঁদের মধ্যে জ্যাকব (Jakob, 1654-1705), তাঁর ভ্রাতা জোহান্ (Johann, 1667-1748) এবং জোহানের পুত্র দানিয়েল (Daniel, 1700-1782) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জ্যাকবের পিতার ইচ্ছা ছিল, তাঁর ছেলে ধর্মীয় যাজক হবেন। তাই জ্যাকব্‌কে ব্যাসেল ইউনিভার্সিটিতে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি গণিতের দিকে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন; পিতার অজ্ঞাতে লুকিয়ে লুকিয়ে অঙ্কশাস্ত্র চর্চা করতেন। যা'হোক, আটাশ বছর বয়সে তিনি ব্যাসেলেই গণিত ও বিজ্ঞানের স্কুল খুলে দেন, আর এর পাঁচ বছর পরে ব্যাসেল ইউনিভার্সিটির অঙ্কের প্রফেসর নিযুক্ত হন। শিক্ষক হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন; তাঁর বহু ছাত্র বিশিষ্ট গণিতবিদ

হয়েছিলেন। লাইবনিজের 'হিসাব-প্রণালী' জনপ্রিয় করবার জন্য তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেননি। Acta Eruditorum-এ প্রকাশিত লাইবনিজের দুরূহ প্রবন্ধগুলো তিনি নিজে নিজে পড়েই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন।

১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি একটি 'সম-পরিধীয়' সমস্যা সমাধানের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। কিন্তু এটি গ্রীকদের সমপরিধীয় সমস্যার চেয়ে কিছু ভিন্নপ্রকৃতির ছিল। প্রাচীন গ্রীকদের এই ধরনের সমস্যা লঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ পরিমাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকত। যেমন, ইউক্লিডের সম্পাদ্য একটি বৃত্তের বহিঃস্থ কোনও বিন্দু থেকে ঐ বৃত্তের পরিধি পর্যন্ত ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম রেখা অঙ্কন করা; কিংবা একটি সরলরেখাকে এমন দুই খণ্ডে বিভক্ত করা, যাতে ঐ খণ্ডদ্বয়ের সন্নিহিত বাহু নিয়ে আয়তক্ষেত্র অঙ্কন করলে ঐ ক্ষেত্রের পরিমাণ সর্ববৃহৎ হয়।

ইউক্লিডের পরবর্তীকালে গ্রিক গণিতজ্ঞেরা প্রমাণ করেছিলেন যে, সমান সংখ্যক বাহু এবং নির্দিষ্ট পরিধি-বিশিষ্ট বহুভুজের মধ্যে সম-বহুভুজটির ক্ষেত্রফলই সর্বাধিক এবং সমান পরিধি-বিশিষ্ট যে-কোনও বহুভুজ বা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে বৃত্তের ক্ষেত্রফলই সর্বাধিক। এরপর ক্রমে ক্রমে 'লঘিষ্ঠ' ও 'গরিষ্ঠ' ধারণা প্রসারিত হয়েছিল। যেমন, নিম্নস্থ ABCDEFGH রেখাটিতে একাধিক লঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ y বা কোটি-অক্ষাঙ্ক আছে। এখানে CC ও GG লঘিষ্ঠ; আর BB ও DD গরিষ্ঠ লম্বাক্ষ রেখা।

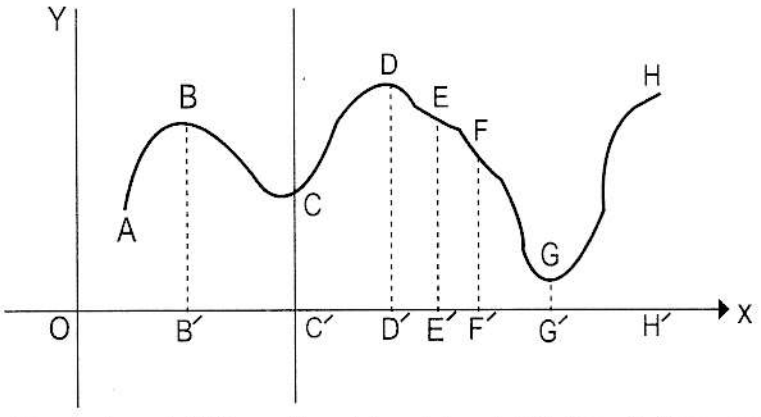

কিন্তু জ্যাকব বার্নৌলী ও তাঁর ভ্রাতা জোহান বার্নৌলী উভয়েই বিভিন্ন ধরনের 'সমপরিধীয়' সমস্যা নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে জ্যাকব অন্য সব গণিতবিদের প্রতি যে সমস্যা সমাধানের আহ্বান (Challenge) দিয়েছিলেন তা এই : সমতলের উপর এমন একটা রেখা অঙ্কন (বা নির্ণয়) করতে হবে যার দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্রফল লঘিষ্ঠ (বা গরিষ্ঠ) হবে এবং সেই সঙ্গে উক্ত রেখার প্রত্যেকটি লম্বাক্ষ অন্য একটি প্রদত্ত রেখার অনুরূপ (corresponding) লম্বাক্ষের কোনও নির্দিষ্ট ফাংশন (বা সম্বন্ধ-বিশিষ্ট পরিমাণ) হবে। জোহান বার্নৌলীসহ বহু ইউরোপীয় গণিতজ্ঞ এই সমস্যার

সমাধানের চেষ্টা করেন। জ্যাকব যখন ঘোষণা করলেন যে, তাঁর ভ্রাতার সমাধানটা ভুল হয়েছে, তখন দুই ভাইয়ের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্বের সূচনা হল। জোহান-এর মেজাজ খুব কড়া আর দুর্দান্ত ছিল, তবে তিনি তাঁর বিশিষ্ট বন্ধুদের সঙ্গে আবার ভাব রেখেও চলতে পারতেন। তাঁর বিশিষ্ট বন্ধুদের মধ্যে লাইবনিজ ও অয়লারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জ্যাকবের মৃত্যুর পর জোহান একটি সমাধান প্রকাশিত করে নিজের বলে দাবী করেন, কিন্তু আসলে সেটিই ছিল তাঁর ভাইয়ের সমাধান। সে যা হোক, এই জাতীয় সমস্যা থেকে ক্যালকুলাস বা 'হিসাব-প্রণালী'র এক নতুন শাখার সৃষ্টি হয়েছে যার নাম 'Calculus of Variations' বা 'সন্নিধান-ব্যবধান প্রণালী'।

যে সব গণিতবিদ প্রায়শঃ কার্টিসীয় অক্ষের পরিবর্তে পোলার অক্ষ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিলেন, জ্যাকব বার্নৌলী তাঁদের সর্বপ্রথম যদি নাও হন, তবু নিশ্চয়ই তাঁদের মধ্যে অন্যতম। জ্যাকবের পূর্বে কেবল 'পেঁচক' (Spiral) অঙ্কনের জন্য পোলার অঙ্ক ব্যবহৃত হত। আজকাল অবশ্য পোলার অক্ষ বেশ চালু হয়ে গেছে। এ পদ্ধতিতে সমতলের উপর একটি কেন্দ্র O, আর একটি প্রাথমিক সরলরেখা OX দেওয়া থাকলে, ঐ সমতলের যে-কোনও বিন্দু P-র অবস্থান নির্ণয় করবার জন্য এর কেন্দ্রিক দূরত্ব OP কে r এবং OX ও OP-র মধ্যেকার কোণকে θ ধরা হয়। এই দুটো অক্ষাঙ্কই P বিন্দুকে নিঃসন্দেহে

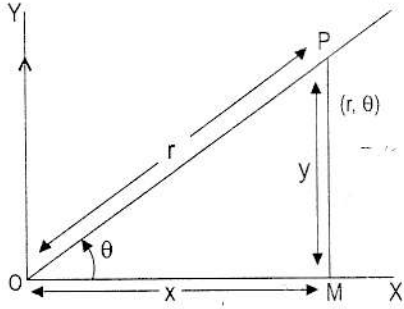

প্রকাশ করবার পক্ষে যথেষ্ট। অবশ্য OX-কে কার্টিসীয় পদ্ধতির x-axis ধরে এর সঙ্গে লম্বভাবে অক্ষ পাতন করে অনায়াসেই দেখা যায় $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$।

এই পোলার অক্ষ ব্যবহার করে জ্যাকব একটি নতুন রেখা আবিষ্কার করেন যার নাম leminiscate (অর্থ, ফিতে, যার উপর দুল বা মতি লটকানো হয়)।

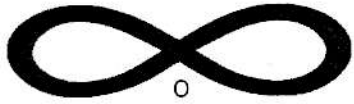

লেমিনিস্কেট (লটকন)

বাংলায় এর নাম 'লটকন' রাখা যেতে পারে; এটা অবশ্য দেখতে দুলার্ধের মতো। আর্কিমিডিসের মতো জ্যাকব বার্নৌলীও ওসিয়ত রেখে গিয়েছিলেন যে, তাঁর সমাধি-ফলকে যেন কোনও গাণিতিক-চিত্র অঙ্কিত করে দেওয়া হয়। তিনি নিজেই এজন্য লগারিদমকে পেঁচক মনোনীত করে গিয়েছিলেন; আর ফলকে খোদিত লিপি হিসাবে তিনি

যে বাক্যটি স্থির করে গিয়েছেন তা হচ্ছে : আমি আবার পুনরুত্থিত হব, সেই আমি — তবে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত। বোধ হয় এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার জন্যই তিনি লগারিদম পেঁচক নির্বাচন করেছিলেন; কারণ — এরও প্রত্যেক প্যাঁচ আগের নিয়মেই পড়ে, যদিও সামান্য একটু সরে সরে। মৃত্যুর আট বছর পরে তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। এতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে 'সম্ভাবনা-তত্ত্ব' (theory of probability)-ও ছিল। এতে তাঁর সম্ভাবনা সংক্রান্ত অনেক নতুন দান লিপিবদ্ধ হয়েছে যার দ্বারা ফের্মা ও প্যাস্কাল প্রবর্তিত এই বিষয়টার ক্রমবিকাশের প্রচুর সহায়তা হয়েছে।

জোহান বার্নৌলীও (তার বড় ভাইয়ের মতো) শিক্ষাজীবনে পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন। পিতা চেয়েছিলেন, এ ছেলেটি তাঁর জমজমাট ব্যবসায়-বাণিজ্য দেখে শুনে পরিবারের সমৃদ্ধি বজায় রাখবে; কিন্তু এক বছর বাণিজ্য করে ফিরে এসেই তিনি ব্যাসেলে দর্শন ও অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে লেগে গেলেন। তারপর কিছুকাল ফ্রান্সে অবস্থান করে লাইবনিজের ক্যালকুলাসের মূল সূত্র কি, সে সম্বন্ধে শিক্ষাদান করেন। এই ছাত্রদের মধ্যে 'মার্কুইস ডেল হোপিটাল' পরে ক্যালকুলাস সম্বন্ধে সর্বপ্রথম সুবিন্যস্ত পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করেন।

জোহান নেদারল্যান্ডের গ্রনিঞ্জেন (Groningen)-এ দশ বছর শিক্ষকতা করেন। পরে ১৭০৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর ভ্রাতার মৃত্যু হলে তিনি সে স্থলে ব্যাসেলের প্রফেসর নিযুক্ত হন। এখানে তিনিও শিক্ষক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ইতিমধ্যেই তিনি সারা ইউরোপে 'ব্রাকিস্টোক্রোন' (স্বল্পতমকাল)-এর উদ্ভাবক হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, নিউটন তাঁর আহ্বানে অবিলম্বে সাড়া দিয়েছিলেন। এখন তিনি লাইবনিজের ক্যালকুলাসের অন্তর্নিহিত ভাবের বিকাশ সাধনে ও প্রয়োগক্ষেত্র সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি অনেক সময় প্রবল বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়তেন, আর ইংরেজ গণিতবিদদের সঙ্গে ক্যালকুলাসের উদ্ভাবনা বিষয়ে বিতর্কে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

জোহানের তিন পুত্র ছিল — নিকোলস, দানিয়েল ও জোহান (২য়)। এঁদের প্রত্যেকেই অঙ্কের প্রফেসর হয়েছিলেন। প্রথম দুইজন রানী প্রথম ক্যাথারিনের স্থাপিত সেন্টপিটার্সবার্গ একাডেমীর প্রফেসর হয়েছিলেন। নিকোলস অল্পবয়সেই মারা যান; দানিয়েল কয়েক বছর সেন্টপিটার্সবার্গে থাকার পর সেখানে স্বাস্থ্য টেকে না দেখে ১৭৩৩ খ্রীস্টাব্দে ব্যাসেলে ফিরে আসেন; আর কনিষ্ঠ পুত্র জোহান (২য়) ব্যাসেলেই তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত হলেন। এঁদের মধ্যে দানিয়েলই সবচেয়ে অধিক যশস্বী হয়েছিলেন। তিনি ফ্রান্সের বিজ্ঞান একাডেমীর ঘোষিত দশ দশটি পুরস্কারের অধিকারী হন। এর একটায় নিজের পিতার সঙ্গে অংশীদার ছিলেন; পিতা এতে অতিশয় রুষ্ট হয়েছিলেন। একবার এক মজার ব্যাপার ঘটে। একজন অপিরিচিত লোক তাঁকে নাম জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বললেন, 'আমি দানিয়েল বার্নৌলী', তখন আগন্তুক বললেন, 'আর আমি আইজাক নিউটন'। অবশ্য, নিউটনের সাক্ষাৎ পেয়ে দানিয়েল অতিশয় প্রীত হয়েছিলেন।

দানিয়েল বার্নৌলী সেন্টপিটার্সবার্গ-এর প্রফেসরের পদ ছেড়ে চলে আসার পর সেখানে তাঁর বন্ধু লিউনার্ড অয়লার (Leonard Euler) প্রফেসর হন। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ, আর সুইজারল্যান্ডেরও একজন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ।

অয়লার ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে ব্যাসেলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ক্যালভিন মতাবলম্বী একজন যাজক ছিলেন এবং জ্যাকব বার্নৌলীর কাছে গণিত শিক্ষা করেছিলেন। ইনি জ্যাকব ও জোহানের পিতার মতো নিজের ছেলেকে গণিত শিক্ষায় নিরুৎসাহ করেননি, বরং উৎসাহই দিয়েছিলেন। এক সময় তিনিও অবশ্য আশা করেছিলেন, ছেলে যেন তাঁর মতো ক্যালভিন মতের যাজক হয়। যা হোক, ছেলের অঙ্কে মাথা আছে দেখে, তিনি তাঁকে জোহান বার্নৌলীর কাছে গণিত শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে দেন। বাল্যকালে অয়লার যে ধর্মীয় আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলেন তার প্রভাব সারাজীবনই অব্যাহত ছিল। বোধহয় এই সরল ধর্ম-বিশ্বাসই তাঁর শেষ জীবনের অন্ধতা বিনা ফরিয়াদে সহ্য করবার শক্তি যুগিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই গণিতশাস্ত্রের বিকাশ হবার মতো অনুকূল অবস্থা সৃষ্ট হয়েছিল। ডেকার্ট প্রায় সত্তর বছর আগেই তাঁর 'বিশ্লেষণ জ্যামিতি' প্রবর্তন করেছিলেন, প্রায় ত্রিশ বছর আগে ইউরোপ লাইবনিজের ক্যালকুলাস পেয়েছিল; ত্রিকোণমিতির ছয়টা অনুপাতেরই তালিকা প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু তখনও ইউরোপে এগুলোকে অনুপাত না ভেবে দৈর্ঘ্য বলেই ভাবা হত, আর প্রাচীন পদ্ধতিমত বৃত্তস্থ জ্যা-এর সঙ্গে এদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছিল। ত্রিকোণমিতিক জ্ঞানের অনেক বিচ্ছিন্ন অংশই জানা হয়ে গেলেও একটা সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়ে সেগুলোকে একসূত্রে গেঁথে পরস্পর সম্পর্কিত করা হয়নি।

যা হোক, প্রায় পঞ্চাশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে অয়লার ডেকার্টের জ্যামিতিকে সম্পূর্ণ বিশ্লেষণমূলক গণিতে পরিণত করেন; ক্যালকুলাস সম্বন্ধে তাঁর সময় পর্যন্ত যত জ্ঞান সঞ্চিত হয়েছিল সে সব তিনি সংক্ষেপে একত্র করে এবং এতে আরও কতকগুলো নতুন ভাবধারা সংযোজিত করে পরবর্তীদের গবেষণার পথ খুলে দেন; আর তিনি ত্রিকোণমিতিকে জ্যামিতিক ভিত্তি থেকে আলজাব্রিক ভিত্তিতে উন্নীত করেন।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে গণিতশাস্ত্রের যুক্তির আরও নির্ভুল, স্পষ্ট ও শাণিত হয়েছে বটে, তবু অয়লার আলজাব্রাকে যে ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, আজও কলেজ আলজাব্রা মূলতঃ সেখানেই রয়েছে। তাঁর উৎসাহ ও কার্যক্ষমতা অসাধারণ ছিল। তাঁর অনেক লেখা ছাপাই হয়নি, তবু যা ছাপা হয়েছে তার সংখ্যাও চল্লিশের ঊর্ধ্বে।

অয়লার যে এত কাজ করে যেতে পেরেছেন, সেজন্য গাণিতিক জগৎ ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের কাছে অনেকখানি ঋণী। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গণিত ও বিজ্ঞানে ইউরোপ মহাদেশে যেসব গবেষণা হয়েছিল তার অধিকাংশই তৎকালীন একাডেমীগুলোর উৎসাহ ও অর্থানুকূল্যেই সাধিত হয়েছিল। 'একাডেমী' নামটা কি কারণে প্লেটোর দার্শনিক স্কুল-এর প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, সেকথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণার জন্য সর্বপ্রথম ১৫৬০ সালে নেপল্‌স শহরে গুণীজনের যে সংঘ গঠিত হয় তার

নাম দেওয়া হয় — 'প্রাকৃতিক রহস্য-উদ্‌ঘাটনের একাডেমী'। কিন্তু নামটা শুনলেই তখন সাধারণ লোকের মনে মধ্যযুগীয় ম্যাজিকের কথাই উদিত হত। তাই এ একাডেমী অধিক দিন স্থায়ী হয়নি।

আমরা আগেই বলেছি, কিশোর প্যাস্কালকে প্যারিসের গণিতজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক সমাবেশে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এই সমাবেশই কালক্রমে ফরাসি বিজ্ঞান একাডেমীতে পরিণত হয়। গণিতজ্ঞ ও বিজ্ঞানীরা যাতে অবাধে গবেষণা করে যেতে পারেন, এই একাডেমী থেকে সে জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের মাসিক বেতন বরাদ্দ করার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাছাড়া, গণিত-বিজ্ঞান সংক্রান্ত সমস্যাদি সমাধান করবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করায় বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। ফরাসি বিজ্ঞান একাডেমী কয়েকবার পুনর্গঠিত হয়েছে। এই একাডেমীর সভ্যদের মধ্যে শুধু খ্যাতনামা ফরাসিরাই নন, বিদেশীয় সেরা সেরা গাণিতিক ও বিজ্ঞানীরাও এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

বিভিন্ন সময়ে অয়লার ইউরোপের দুটো একাডেমীর ঘনিষ্ঠ সংস্রবে এসেছিলেন। এ দুটোই লাইবনিজের প্রণীত পরিকল্পনা অনুসারেই স্থাপিত হয়েছিল। ১৭০০ সালে প্রাশিয়ার রাজা প্রথম ফ্রেডারিক বার্লিনে 'রাজকীয় বিজ্ঞান একাডেমী'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৭১১ সালে লাইবনিজের সভাপতিত্বে এই একাডেমীর কাজ শুরু হয়। লাইবনিজ সেন্টপিটার্সবার্গে একাডেমী স্থাপনের যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন, তা ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দে (লাইবনিজের মৃত্যুর ৮ বছর পর) মঞ্জুর হয়। তারপর পিটার দি গ্রেটেরও মৃত্যু হয়। অবশেষে এই ইম্পিরিয়াল বিজ্ঞান একাডেমী স্থাপিত হয় সম্রাজ্ঞী প্রথম ক্যাথারিনের সময়।

বার্লিন ও সেন্টপিটার্সবার্গ উভয়স্থলেই রাজকীয় তহবিল থেকে একাডেমীর জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হ'ত, যাতে উপযুক্ত গবেষকরা নিশ্চিন্ত মনে গণিত ও বিজ্ঞানের সাধনা করতে পারেন। এর তুলনায় অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে দীক্ষিত ধর্ম যাজকদের জন্য ফেলোশিপের যে ব্যবস্থা ছিল তা অতিশয় অপর্যাপ্ত ছিল।

আমরা আগেই বলেছি, অয়লার ১৭৩৩ সালে সেন্টপিটার্সবার্গ একাডেমীতে যোগ দিয়েছিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে ১৭৩৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। এর ফলে তাঁর ডান চক্ষুতে দৃষ্টিহীনতা জন্মে; তবু তিনি পুস্তক রচনা ও প্রকাশের গতি শ্লথ করেননি। তিন বৎসর পরে তিনি ফরাসি বিজ্ঞান একাডেমীর ঘোষিত পুরস্কার লাভ করেন; আবার ১৭৪০ সালে ম্যাক্লরিন ও দানিয়েল বার্নৌলীর সঙ্গে ভাগে আর একটি পুরস্কার লাভ করেন।

১৭৪১ সালে, রাশিয়ার রাজনৈতিক গোলযোগ ও হত্যাযজ্ঞের বিভীষিকা সহ্য করতে না পেরে, ফ্রেডারিক দি গ্রেটের আহ্বানে তিনি বার্লিন একাডেমীতে যোগ দেন। এখানে তিনি পঁচিশ বছর কাজ করেন; কিন্তু ফ্রেডারিকের কোর্টে ভল্টেয়ার প্রমুখ যে-সব লোকের

আনাগোনা ছিল, তাঁদের সঙ্গে নিরীহ ধর্মপ্রাণ অয়লারের রুচির মিল ছিল না। তাই বহু বৎসর যাবৎ ছোটখাটো খিটিমিটি ব্যাপার সহ্য করে অবশেষে ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের আমন্ত্রণে আবার সেন্টপিটার্সবার্গ চলে যান। রাশিয়ানরা বরাবরই অয়লারকে সম্মানের চোখে দেখতেন, এমন কি, তিনি ১৭৪১ সালে যখন প্রাশিয়ায় চলে যান, তার পরেও। ১৭৬০ সালে রাশিয়া ও অন্যান্য শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাশিয়া সাত বৎসর ব্যাপী এক যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ফ্রেডারিক যখন সৈন্য নিয়ে সাইলেশিয়ার অন্তর্গত ব্রেস্‌ল শহরে গিয়েছিলেন, সে সময় রাশিয়া প্রাশিয়া আক্রমণ করে বার্লিন অধিকার করে নেয়। এই সময় বার্লিন থেকে চার মাইল দূরে শার্লোটবার্গে অয়লারের যে খেত-খন্দ ছিল রাশিয়ান সৈন্যরা তা লুট করে; কিন্তু ঐ ফার্মের মালিকের নাম শুনবা মাত্র রাশিয়ান সেনাপতি তৎক্ষণাৎ অয়লারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেন; এছাড়া, রাশিয়ান সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথও তাঁকে অতিরিক্ত চার হাজার ক্রাউন পাঠিয়ে দেন। তাঁর প্রতি রাশিয়ানদের উদার ব্যবহারের কথা স্মরণ করে, আর ফ্রেডারিকের কোর্টে তাঁর হতাদর দেখে, অয়লার যে ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে ক্যাথারিন-দি-গ্রেট-এর আহ্বানে আবার সেন্টপিটার্সবার্গ একাডেমীতে ফিরে যাবেন, তা এমন কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়। এইখানেই তিনি জীবনের অবশিষ্ট সতের বছর কাটিয়ে দেন।

'জার'-দের রাজধানীতে ফিরে আসবার অল্প কিছুদিন পরেই অয়লারের বাঁ চোখে একটা ছানি পড়ে; কিন্তু এতেও তিনি স্থৈর্য না হারিয়ে অটলভাবে কাজ করে যেতে লাগলেন। ১৭৭০ সালে তিনি একখানা আলজাব্রার বই মুখে মুখে বলে যান, অন্যে তা লিখে নেয়। এরপরের বছর তাঁর ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সে সময় একজন অনুগত সুইস্ নৌকর তাঁকে বয়ে ঘরের বাইরে নিয়ে না গেলে, দৃষ্টিহীন অয়লার পুড়েই মারা যেতেন। এর কিছুদিন পরে তাঁর বাঁ চোখের ছানিতে অস্ত্রোপচার করা হয়। প্রথমে একটু ভাল বোধ হলেও, কিছুদিন পরেই তিনি আবার সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান; কিন্তু তখনও তাঁর মনোবল আর কর্মশক্তি ব্যাহত হয়নি। তিনি মুখে মুখে বলে নিজের ছেলেদের দ্বারা বহুসংখ্যক গণিত-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়ে নিতে লাগলেন। এর অনেক প্রবন্ধই তাঁর মৃত্যুর পরে সেন্টপিটার্সবার্গ একাডেমীর সরকারী দপ্তর থেকে ছাপা হয়েছিল।

অয়লারই বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতকে গ্রিক অক্ষর π দ্বারা নির্দেশিত করবার রীতি অনুমোদন করেন। তিনিই e অক্ষর দ্বারা নেপিরিয়ান লগারিদমের ভিত্তি

$$e = ১ + \frac{১}{১!} + \frac{১}{২!} + \frac{১}{৩!} + \ldots$$

নির্দেশ করেন। (৩!=১X২X৩ i ৭!=১X২X৩X৪X৫X৬X৭, ইত্যাদি) উচ্চ গণিতে এই 'e' একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তিনি x-এর ফাংশনকে y না লিখে $f(x)$ লেখার রীতি প্রবর্তন করেন। তিনিই $\sqrt{-১}$ বুঝাবার জন্য 'i' প্রতীকটি উদ্ভাবন করেন; আবার

তিনিই নেপিয়ারের লগারিদম প্রক্রিয়াকে একটি সম-বৃদ্ধি শ্রেণী আর এর অন্য একটি সমগুণিত শ্রেণীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাখবার জটিলতা থেকে উদ্ধার করে সোজাসুজি একে 'ভিত্তি'-র 'সূচক'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেন। ত্রিকোণমিতিতেও ত্রিভুজের কৌণিক বিন্দুগুলোকে বড় হাতের অক্ষর আর বিপরীত বাহুগুলোকে ছোট হাতের অক্ষর দিয়ে বুঝাবার রীতিও তিনিই চালু করেন। তিনি উচ্চ গণিতে এমন অনেক দান রেখে গেছেন, যা অতিমাত্রায় পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার না করে সহজ কথায় প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। বিজ্ঞানেও তিনি চন্দ্র, উপগ্রহ ও ধূমকেতু সম্বন্ধে প্রস্তাবাদি লিখে গেছেন, আর ফ্রেডারিক-দি-গ্রেট-এর ভাগ্নীর জন্য যন্ত্রবিজ্ঞান, জ্যোতিষবিজ্ঞান আর সাধারণ বিজ্ঞান সম্বন্ধে একখানা 'জনপ্রিয়' বই লিখেছিলেন। এই শেষোক্ত বইখানা ফ্রেঞ্চ ভাষায় লিখিত হয়; তার কারণ, জার্মানীতে তখনও জার্মান ভাষাকে বর্বরের ভাষা বলে মনে করা হত, ফ্রেঞ্চ-ই ছিল অভিজাত ভাষা। ফ্রেডারিক নিজেও সদাসর্বদা ফ্রেঞ্চই বলতেন, আর তাঁর দরবারেও ভল্টেয়ার, মপার্টই (Maupertuis) প্রভৃতি ফরাসি লেখকের সমধিক আদর ছিল।

অয়লার অন্ধ হয়ে যাবার পর তাঁর অপূর্ব স্মরণশক্তি খুব কাজে লেগেছিল। ভার্জিলের সমগ্র এনিয়েড তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল, আর তিনি বড় বড় জটিল গাণিতিক হিসাব মনে মনেই করে ফেলতেন। ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে নাতি-নাতনীদের সঙ্গে খেলা করতে করতে একসময় তিনি হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এর অল্পক্ষণ পরেই তাঁর প্রাণবিয়োগ হয়।

১৬০০ থেকে ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ডেকার্টে, ফের্মা ও প্যাস্কালের জন্য ফ্রান্সের গাণিতিক গৌরব বৃদ্ধি পায়; তারপর আসে ইংল্যান্ডের গৌরবের পালা — উয়ালিস, ব্যারো ও নিউটনের দরুন। ওদিকে জার্মানীতে ছিলেন লাইবনিজ। তারপর সুইজারল্যান্ডে আসলেন বার্নৌলী বংশ আর অয়লার। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ফ্রান্সে আর কোনও উল্লেখযোগ্য গণিতবিদ জন্মগ্রহণ করেননি। তারপর এলেন যোসেফ লুই লাগ্রাঞ্জ (Lagrange, ১৭৩৬-১৮১৩), যিনি পৃথিবীর একজন সেরা গণিতজ্ঞ হিসাবে ফ্রান্সের জন্য নতুন গৌরব অর্জন করেন; সেই সময় তাঁর স্বদেশবাসী পিয়ারে লাপ্লাসও জ্যোতির্বিদ্যা, সম্ভাবনা-তত্ত্ব ও গণিতশাস্ত্রে অক্ষয় কীর্তি লাভ করেন।

লাগ্রাঞ্জের জন্ম হয় টিউরিনে, — ফ্রান্সের এক সমৃদ্ধিশালী রাজকর্মচারীর ঘরে; কিন্তু পরে ব্যবসায়িক ফটকাবাজীতে লাগ্রাঞ্জের পিতা নিঃস্ব হয়ে পড়েন। লাগ্রাঞ্জ বলতেন নিঃস্বতাই তাঁর সৌভাগ্যের মূল। অর্থের প্রাচুর্য থাকলে তিনি অঙ্কশাস্ত্র পড়তেন কিনা, সন্দেহ। যা হোক, তিনি টিউরিনে কলেজে থাকাকালেই জ্যামিতির মূল সূত্র অধ্যয়ন করেন; কিন্তু পরবর্তীকালে দৈবক্রমে লন্ডনস্থ রয়াল সোসাইটির ফিলসফিক্যাল ট্র্যানস্যাকশন পত্রিকায় হ্যালীর একটি প্রবন্ধ পাঠ করবার পরই তাঁর গাণিতিক ঔৎসুক্য ও উৎসাহ জাগ্রত হয়। এই সূত্রে অঙ্কশাস্ত্রের যুগান্তর সৃষ্টিকারী নতুন প্রণালীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। দুই বছরের মধ্যেই তিনি নতুন পদ্ধতি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে ফেলেন; এমন

কি, সমপরিধীয় প্রশ্নাদি সমাধান করবার প্রচলিত প্রণালী সম্প্রসারিত করে অধিক শক্তিশালী একটি উপায় বের করে সে সম্বন্ধে অয়লারকে এক পত্র লেখেন। অয়লার এই পন্থার উৎকর্ষ স্বীকার করে এ সম্বন্ধে নিজেও এই প্রণালী ব্যবহার করে লাগ্রাঞ্জের গবেষণাকে আরও কিছুদূর অগ্রসর করে দেন। কিন্তু লাগ্রাঞ্জ নিজের উন্নততর প্রণালী প্রকাশ করবার পূর্বে অয়লার তাঁর নিজের গবেষণাটুকু প্রকাশ করেন নাই। এটি অবশ্য অয়লারের স্বভাব-সুলভ মহানুভবতারই নিদর্শন।

১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দে লাগ্রাঞ্জ টিউরিনের রয়াল স্কুল-অব-আর্টিলারীতে জ্যামিতির প্রফেসর নিযুক্ত হন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকতে থাকতেই তিনি টিউরিনের বিজ্ঞান একাডেমী প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সোসাইটির মুখপত্রেই ইতিপূর্বে অয়লারের কাছে পেশ করা প্রবন্ধটা প্রথম ছাপা হয়। এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু থেকেই পরে Calculus of variations বা 'সন্নিধান ব্যবধান প্রণালী'র উদ্ভব হয়। এ নামটি ১৭৬৬ সালে অয়লারের প্রস্তাবক্রমে গৃহীত হয়েছিল। ১৭৬৪ থেকে ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যার বিভিন্ন সমস্যায় তাঁর 'সন্নিধান ব্যবধান প্রণালী' প্রয়োগ করে তিনি ফরাসি বিজ্ঞান একাডেমী থেকে পাঁচটি পুরস্কার লাভ করেন। তারপর ১৭৬৬ সালে অয়লারের স্থলে বার্লিন একাডেমীর গণিত বিভাগের পরিচালক (Director) নিযুক্ত হন। দুই জন বিখ্যাত গণিতবিদ ফ্রেডারিক-দি-গ্রেটের কাছে লাগ্রাঞ্জের পক্ষে জোর সুপারিশ করেন। একজন ড্য' লেম্বার্ট — যিনি এই পদের জন্য একবার আমন্ত্রিত হয়ে পড়লে, শেষে প্রত্যাখ্যান করে যাতে বিড়ম্বনা ভোগ করতে না হয়, এই মতলবে; আর একজন অয়লার — যিনি এই পদ ত্যাগ করে সেন্টপিটার্সবার্গে যাবার জন্য উৎসুক ছিলেন। দেখা যাচ্ছে, ফ্রেডারিক-দি-গ্রেটের কাছে ঘেঁষতে অনেকের মনেই রীতিমত দ্বিধা-সঙ্কোচ ছিল।

বার্লিনে আসবার অল্প কিছুদিন পরেই লাগ্রাঞ্জ নিজের একজন দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়াকে বিবাহ করেন। তিনি ড্য' লেম্বার্টের কাছে বলেছিলেন তাঁকে দেখাশুনা করবার মতো একজন লোক দরকার, সেই জন্যই তিনি বিবাহ করলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র মর্জি ছিল অন্যরকম। বিবাহের পর নববধূ সাংঘাতিক পীড়িতা হয়ে পড়লেন, কাজেই লাগ্রাঞ্জকেই তাঁর স্ত্রীর দেখাশুনা করতে হল। কিন্তু লাগ্রাঞ্জের শত যত্ন সত্ত্বেও তিনি আর স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন না — শীঘ্রই ইহলোক ত্যাগ করলেন।

বার্লিনে থাকাকালেই লাগ্রাঞ্জ তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'Mechanique Analytique' (বিশ্লেষণমূলক যন্ত্র-বিজ্ঞান) প্রকাশ করেন। এতে তিনি কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থে গতির সাধারণ সূত্রাবলী উদ্ভাবন করেন, যা প্রয়োজন মতো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ বইয়ে তিনি জ্যামিতিক-পদ্ধতি সর্বৈব পরিহার করেন; এমন কি সমগ্র গ্রন্থে একটি মাত্র চিত্রও সন্নিবিষ্ট করেননি। ফ্রেডারিক-দি-গ্রেটের মৃত্যুর পর ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে লাগ্রাঞ্জ বার্লিনের পদ ছেড়ে দিয়ে ষোড়শ লুইয়ের আমন্ত্রণে ফরাসি বিজ্ঞান একাডেমীতে যোগ দেন। লাগ্রাঞ্জ প্যারিসে আগমন করলে রানী মেরী এনটিওনিট্টে তাঁকে বহু সম্মানে অভ্যর্থনা করেন। লুভারের রাজপ্রাসাদেরই এক প্রকোষ্ঠে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়, আর বার্লিনে তিনি যে বেতন পেতেন তাই তাঁকে দেওয়া হয়।

কিন্তু এত রাজ-সম্মান সত্ত্বেও হঠাৎ তাঁর মানসিক অবসাদ উৎপন্ন হয়, যার ফলে তিনি তাঁর প্রিয় গণিত ও বিজ্ঞানের প্রতিও অতিশয় বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। এমন কি, পুরো দুই বৎসর যাবৎ তাঁর সেরা গ্রন্থ Analytique-এর ছাপান কপি পর্যন্ত পাতা উল্টিয়ে দেখতেও তিনি রাজি হননি। আশ্চর্যের বিষয়, ফরাসি বিপ্লবের তাণ্ডবলীলা শুরু হওয়ার পর এই শান্তিপ্রিয় ঠাণ্ডা মেজাজের লোকটি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। তিনি এই সামাজিক বিপ্লবের গতি-প্রকৃতি বুঝে দেখতে উৎসাহী হন। আইনতঃ বিদেশী লোক বলে ইচ্ছা করলে তিনি ফ্রান্স ত্যাগ করে চলে যেতে পারতেন; কিন্তু তা না করে তিনি বরং সরেজমিনে উপস্থিত থেকে বিপ্লবের পরিণতি লক্ষ্য করাই সিদ্ধান্ত করলেন। কিন্তু অত্যাচার-অবিচার চরমে উঠলে পর তাঁর আত্মা পীড়িত হয়ে উঠলো, তিনি নিজেকে এই বলে ধিক্কার দিতে লাগলেন, 'কেন আমি স্বেচ্ছায় এ-সব ব্যাপার দেখবার জন্য রয়ে গেলাম?' — সে যা হোক, তিনি ফ্রান্সে থেকে গিয়ে আর এক দিক দিয়ে বিশেষ লাভবান হয়েছিলেন। ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে (ষোড়শ লুইকে যে বছর গিলোটিনে নিয়ে গিয়ে বধ করা হয়, তার আগের বছরে) জ্যোতির্বিদ লেমোন্নিয়ারের রূপবতী ও গুণবতী ষোড়শী কন্যা প্রথমে বিষয়সঙ্গতিহীন লাগ্রাঞ্জের প্রতি কৃপান্বিত হয়ে পরে অনুরক্তা হয়ে পড়েন এবং তাঁর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধা হন। সুখের বিষয়, বয়সে এঁদের মধ্যে প্রায় চল্লিশ বছরের ব্যবধান থাকলেও, তাঁদের মিলন খুব সুখের হয়েছিল — লাগ্রাঞ্জও ক্রমে ক্রমে তাঁর পূজারিণী স্ত্রীর বিশেষ অনুরাগী হয়ে পড়েছিলেন।

ফ্রান্সের (এবং গণিতশাস্ত্রের) সৌভাগ্যক্রমে লাগ্রাঞ্জকে কোনও বিপ্লবী বিচার-সংস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি। তাঁর বেতন নিয়মিত প্রদত্ত হয়েছিল এবং এর উপর তাঁর ভাগ্যে মোটা পারিশ্রমিকের অন্য কার্যও ন্যস্ত হয়েছিল। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি একটি কমিটির প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন, যার উপরে ওজন ও এককাবলীর সংস্কারের ভার দেওয়া হয়েছিল। এ কমিটি অবশ্য বিপ্লব যুগের পূর্বেই ফরাসি বিজ্ঞান-একাডেমীর উদ্যোগেই গঠিত হয়েছিল; কিন্তু এই বৎসর বিপ্লবীরা একাডেমী ভেঙে দিয়ে নতুন মেম্বর নিযুক্ত করেন। পরে নতুন মেম্বরদেরও কয়েকজনকে ছাঁটাই করা হয় — কারণ তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে রাজ-বিদ্বেষ, অথবা রিপাবলিকান গুণাবলী (!) বর্তমান ছিল না। এই ছাঁটাইয়ের দলে লাপ্লাস ও লাভয়সিয়রও ছিলেন। লাভয়সিয়রকে ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে 'গিলোটিন' দ্বারা হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় বিচলিত হয়ে শান্তশিষ্ট লাগ্রাঞ্জ পর্যন্ত বলে উঠেছিলেন, 'হায়, এক মুহূর্তের মধ্যেই এ মস্তকটা ছিন্ন হয়ে গেল, কিন্তু এক শতাব্দীর মধ্যেও হয়ত এমন আর একটা মাথা জন্মাবে না।'

ফ্রান্সের এইসব বিপর্যয় সত্ত্বেও লাগ্রাঞ্জের নেতৃত্বে উপরোক্ত কমিটির কাজ চলতে থাকলো। ফ্রান্সের প্রায় প্রত্যেক জেলায় ভিন্ন ভিন্ন ওজন আর রৈখিক মাপ ছিল। উদাহরণস্বরূপ, শুধু ক্ষেত্রফল মাপবারই তিনশতাধিক একক বর্তমান ছিল। আগেকার কমিশন দৈর্ঘ্যের মাপ থেকে আরম্ভ করে, সম্পূর্ণ নতুন প্রণালীর মাপ অবলম্বনের বিষয় সিদ্ধান্ত করেছিল। সর্বস্বীকৃতভাবে পৃথিবীর উত্তর মেরু থেকে বিষুব রেখা পর্যন্ত দূরত্বের

কোটি ভাগের এক ভাগকে দৈর্ঘ্যের একক হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করা হয়। যদিও দ্রাঘিমা মাপতে কিঞ্চিৎ ভুল হয়ে গিয়েছিল, তবু এই মাপকেই শুদ্ধ ধরে নিয়ে সরল রৈখিক মাপের একক ধরা হল এক মিটার। এক মিটারে ৪০ ইঞ্চির কিছু কম (৩৯·৩৭০১০৪ ইঞ্চি)। এই এককের ১০ গুণ, ১০০ গুণ, ১,০০০ গুণ ও ১০,০০০ গুণকে যথাক্রমে ডেকামিটার, হেক্টোমিটার, কিলোমিটার ও মিরিয়া মিটার বলা হল; আর এর এক-দশাংশ, এক শতাংশ — ইত্যাদির পরিমাণকে যথাক্রমে ডেসিমিটার, সেন্টিমিটার, মিলিমিটার ও মাইক্রোমিটার নাম দেওয়া হল; তবে মিরিয়া ও মাইক্রো সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। এইভাবে ১০ মিটার লম্বা ও ১০ মিটার চওড়া ক্ষেত্র-পরিমাণকে একক ধরে তার নাম দেওয়া হল এক 'আর' (are); তারপর ঊর্ধ্বদিকে ডেকা, হেক্টো, কিলো ও নিম্ন দিকে ডেসি, সেন্টি, মিলি লিখে তার শেষে 'আর' বসিয়ে দিলেই ক্ষেত্রফলের আর্যা সহজেই পাওয়া যায়। আয়তনের মাপে ১০ সেন্টিমিটার লম্বা, ১০ সেন্টিমিটার চওড়া আর ১০ সেন্টিমিটার উচ্চতাবিশিষ্ট একটি কিউবের ঘন পরিমাণকে এক লিটার বলা হল। অবশ্য ১ লিটারে ১,০০০ ঘন সেন্টিমিটার। আবার ওজনের একক ধরা হল 'গ্রাম'। ১ ঘন সেন্টিমিটার পানি প্রায় ৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপে থাকলে তার যে ওজন হয়, তাই এক গ্রাম। তারপর অবশ্য উপর দিকে ডেকা-হেক্টো-কিলো-(গ্রাম) আর নিচের দিকে ডেসি-সেন্টি-মিলি-(গ্রাম)। ১ কিলোগ্রামে আমাদের প্রায় (৮০ তোলার) ১ সের ১ ছটাক হয়।

বর্তমানে আমাদের দশমিক প্রণালীর মুদ্রা চালু হয়েছে। এতে হিসাব করতে খুব সুবিধা। ভবিষ্যতে ক্ষেত্রফল, ওজন, দৈর্ঘ্য ইত্যাদিতেও দশমিক নিয়ম প্রচলিত হলে আরও অনেক সুবিধা হবে। প্রধানতঃ লাগ্রাঞ্জের চেষ্টার ফলেই বর্তমানে পৃথিবীর তিরিশ পঁয়ত্রিশটি জাতি দশমিক প্রণালীর সুবিধা ভোগ করছে।

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবীদের হুকুমনামা (decree) অনুসারে ফ্রান্সের সমুদয় ইউনিভার্সিটি-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পরে ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে 'ইকোলে পলিটেকনিক' নামক এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করে লাগ্রাঞ্জকে তার গণিতাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। এখানে তিনি শিক্ষক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর ছাত্রদের অধিকাংশেরই গাণিতিক পটভূমিকা দৃঢ় ছিল না, তাই তিনি ছাত্রদের দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত প্রশ্ন বিবেচনা করে তাদের সমতলে নেমে এসেই চমৎকারভাবে সুষ্ঠু জ্ঞান পরিবেশন করতে পারতেন। ধাপে ধাপে ক্রমশঃ অগ্রসর হতে হতে তিনি ক্যালকুলাস পর্যন্ত শেষ করে ফেলতেন, অথচ ছাত্রেরা যে নতুন একটা বিষয়ে উপনীত হয়েছে, তা টেরই পেতো না। তিনি ক্যালকুলাস পড়াবার এক নিয়ম উদ্ভাবন করেন, যাতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাণের অবতারণাই করতে হয় না। তিনি জ্যামিতিক ধারণাদি বর্জন করে, কেবল আলজাব্রীয় ফাংশনের শ্রেণী দ্বারাই সমস্ত ক্যালকুলাস পড়িয়ে ফেলতেন। এ সম্বন্ধে তিনি ১৭৯৭ সালে আর ১৮০৬ সালে দুইখানা উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেন। তাঁর এই সব পদ্ধতি দ্বারা এখন আর ক্যালকুলাস শেখানো হয় না বটে, কিন্তু তাঁর এই সব ধারণা অবলম্বন করে উচ্চতর গণিতশাস্ত্রের অনেক নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁর মেকানিকে এনালিটিকের দ্বিতীয় সংস্করণে আবার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাণ সংযোজিত করেন। ঐ গ্রন্থের

ভূমিকায় তিনি বলেছেন — 'ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাণের মূলভাবটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে, (জ্যামিতিক প্রমাণ দ্বারা) এর থেকে নির্ণীত সিদ্ধান্তগুলোর সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারলে, অবশ্যই এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংখ্যা ব্যবহার করে সঙ্গতভাবেই প্রমাণ সংক্ষেপ করতে কোনও দোষ নাই'।

লাগ্রাঞ্জ বিশুদ্ধ গণিতের প্রায় প্রত্যেক শাখার উৎকর্ষেই সহায়তা করেছেন। তাঁর ক্যালকুলাস, বিশেষ করে 'সন্নিধান ব্যবধান ক্যালকুলাস', 'সীমিত ব্যবধান ক্যালকুলাস ও ব্যবধানিক সমীকরণ' (differential equation) বিষয়ে প্রধান অংশ গ্রহণ করা ছাড়াও, তিনি অবিরত ভগ্নাংশ ব্যবহার করে আলজাব্রিক সমীকরণের আসন্ন মান নির্ণয়ের উপায় বের করেন, আবার সংখ্যাতত্ত্বেও (Theory of numbners) ফের্মার কতকগুলো প্রশ্নের সমাধান করেন, আর কতকগুলো নতুন তথ্যও আবিষ্কার করেন। এ ছাড়া পরীক্ষণ ক্ষেত্রেও তিনি নিউটনের বিশ্বজাগতিক মাধ্যাকর্ষণবাদের সত্যতা যাচাই করবার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই শেষোক্ত বিষয়ে লাপ্লাস (Laplace) বিনা স্বীকৃতিতে তাঁর অনেক লেখা ব্যবহার করেছিলেন। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে যে সময় তাঁর 'মেকানিকে এনালিটিকে'-র দ্বিতীয় খণ্ডের নতুন সংস্করণ বের করবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, তখন ৭৭ বছর বয়সে তাঁর আয়ু ফুরিয়ে যায়। মৃত্যু শয্যায় তিনি বলেছেন,– 'মৃত্যু যন্ত্রণাদায়কও নয়, ভয়ঙ্করও নয়।'

পিয়েরে লাপ্লাস ১৭৪৯ সালে এক সাধারণ দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে পড়বার সময় তাঁর অসাধারণ মেধা দেখে ধনী পাড়া-পড়শীরা তাঁর পড়ার ব্যয়ভার বহন করেন। কিন্তু লাপ্লাসের জীবনে লাগ্রাঞ্জ বা অয়লারের চরিত্রগত সুষমার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি সফলতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পুরাতন অবস্থার কথা ভুলে যেতে কিছুমাত্র সংকোচ করেননি। দেখা গেছে, তিনি ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিদের পদ-লেহন করে কাজ উদ্ধার হয়ে যাবার পরক্ষণেই তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। এসব কারণে তিনি একমাত্র উদার-হৃদয় লাগ্রাঞ্জ ছাড়া সমসাময়িক গণিতজ্ঞদের সবারই বিরাগ-ভাজন হয়েছিলেন। এর প্রধান কারণ তিনি বিনা স্বীকৃতিতে অন্যান্য গণিতজ্ঞের আবিষ্কার নিজের বলে চালিয়ে দিতে বিশেষ অভ্যস্ত ছিলেন; কিন্তু তা হলেও কেউ তাঁর অসামান্য প্রতিভা স্বীকার না করে পারেননি।

আঠার বছর বয়সে কোনও বিশিষ্ট লোকের কাছ থেকে পরিচয়-পত্র নিয়ে লাপ্লাস একবার বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ড্য' লেম্বার্টের সঙ্গে দেখা করেন। তখন ড্য' লেম্বার্ট সে পত্রের কোনও গুরুত্বই দেননি। কিন্তু পরে তিনি যখন ড্য' লেম্বার্টের কাছে যন্ত্র-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব সংক্রান্ত একখানা নোট নিয়ে উপস্থিত হন, তখন ড্য' লেম্বার্ট সচকিত হয়ে ওঠেন। 'তুমি এখন নিজেই নিজের সুপারিশ করেছ, এখন তোমার সহায়তা করা আমার অবশ্যই কর্তব্য।' ড্য' লেম্বার্টের সুপারিশে তিনি প্যারিসের সামরিক 'একোলে' (Ecole)-তে অঙ্কের প্রফেসর নিযুক্ত হলেন। এখন থেকে তাঁর ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ খুলে গেল। তিনি তাঁর যুগের 'বিশ্লেষণবিশারদ' বলে বিখ্যাত হয়ে পড়েন; আর জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর গতিপথ

পর্যালোচনা করে নিউটনের বিশ্বজাগতিক মাধ্যাকর্ষণবাদের সত্যতা নিরূপণে তাঁর বিশ্লেষণ-জ্ঞানের বহুল প্রয়োগ করেন। এ সম্বন্ধে তিনি 'জ্যোতিষ্কের গতি বিজ্ঞান' (Mechanique Celeste) নামক একখানা গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া'র ঠিক নিচেই এর স্থান নির্দেশ করা হয়। এ বিষয়ে তিনি আর একখানা 'জনপ্রিয়' পুস্তক রচনা করেন, তাতে অঙ্ক বা বিশ্লেষণের নামগন্ধও ছিল না। এ বইয়ের রচনা এতই চমৎকার হয়েছিল যে ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে 'ফরাসি ভাষা পরিমার্জন' সংক্রান্ত ফ্রেঞ্চ একাডেমী তাঁকে এর সভ্য নির্বাচিত করেন। অবশ্য অনেক আগে ১৭৮৫ সালেই তিনি ফরাসি 'বিজ্ঞান একাডেমী'র সভ্য হয়েছিলেন।

আমরা আগেই বলেছি, বিপ্লবকালে ওজন ও এককাবলীর কমিটি থেকে লাপ্লাসকে ছাঁটাই করা হয়েছিল। এটা কিন্তু তাঁর জীবনের একটি সাময়িক অবনতি মাত্র। তাঁর রাজনৈতিক নেতা (Politician) হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল; আর তাতে বিশেষ অসুবিধাও ছিল না। কারণ রাজনৈতিক হাওয়া-নির্দেশক যন্ত্র (weather-cock)-এর মতো যদৃচ্ছাক্রমে মোড় ঘুরতে তাঁর কিছুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না। এমন কি, নেপোলিয়ন পর্যন্ত এক সময়ে কৃপাবর্ষণ করে তাঁকে আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী (Minister of Interior) পদ প্রদান করেছিলেন। অবশ্য, নেপোলিয়ন তাঁর পরিচালন-ক্ষমতার অভাব লক্ষ্য করে তাঁকে এ পদ থেকে অপসারণ করতেও বিলম্ব করেননি।

লাপ্লাসের কতকগুলো গবেষণার ফলে মাধ্যাকর্ষণ, বিদ্যুৎ-বিজ্ঞান ও তরল পদার্থের গতিবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি সাধিত হয়েছে। এছাড়া তিনি সম্ভাবনা-তত্ত্ব (Theory of Probability) সম্বন্ধেও একখানা প্রামাণ্য পুস্তক প্রণয়ন করে গেছেন। তিনি বলেছেন, সম্ভাবনা-তত্ত্ব গাণিতিক ভাষায় রূপান্তরিত সাধনার জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়।

জীবনের শেষভাগে তিনি নিজের গ্রাম-ভবনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অবসর জীবনযাপন করেন। এইখানেই ১৮২৭ সালে তাঁর জীবনাবসান হয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে এক ধরনের গণিতশাস্ত্র গড়ে উঠেছিল, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই ধারার অবসান হল। ক্যাভালিয়ারী, ডেকার্ট, ওয়ালিস, নিউটন, লাইবনিজ — এঁরা, আর্কিমিডিস যে রাজ্যের সীমা স্পর্শ করেছিলেন, সেই রাজ্যের অনাবিষ্কৃত পথে দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়েছিলেন, যে অভিযান আর্কিমিডিসের পরে সতের শতাব্দী ধরে কেউ করতে পারেননি। তাঁদের সাহস ও মননশক্তি দ্বারা তাঁরা এমন সব ঐশ্বর্যের আবিষ্কার করেছেন, যা প্রাচীন গ্রীকদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তাঁরা যে সব প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছিলেন, বিশুদ্ধ যুক্তি দিয়ে সেগুলো গ্রীকদের কাছেও (বার্কেলির মতো) অত্যন্ত আপত্তিকর বলেই মনে হত। এ সম্পর্কে ড্য' লেম্বার্টের যে সব ছাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্যালকুলাসের বিরুদ্ধ-পক্ষীয় যুক্তিকে অপ্রতিরোধ্য বলে মনে করত তাদেরকে একটা চমৎকার উপদেশ দিয়েছিলেন — 'বোঝ আর না বোঝ, এগিয়ে চল, শেষে বিশ্বাস আসবেই।' এই একটা বাক্যের মধ্যে অষ্টাদশ শতকের গণিতজ্ঞদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হচ্ছে। এ মত হয়ত

পরবর্তী গণিতবিদদের মতেরও সম্পূর্ণ উল্টো। অপকৃষ্ট যন্ত্রপাতি নিয়েই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর গণিতজ্ঞেরা প্রকৃতির গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন তাঁদের নিয়োজিত পদ্ধতি গ্রীকদের প্রবর্তিত বিশুদ্ধ যুক্তিশাস্ত্রের ঠিক অনুগত হচ্ছে না, তবু তাঁরা বসে না থেকে নিরুদ্দেশ পথের যাত্রী হয়েছিলেন। এঁদের বিশ্বাস ছিল, আগে তো অস্পষ্ট যুক্তিতেই যে আভাস পাওয়া যাচ্ছে সেইটে অবলম্বন করেই বিশ্বের সমস্যা সন্ধানে লেগে পড়ি, পরে বসে বসে অবসর মতো যুক্তি শানিয়ে নিয়ে সেই আবিষ্কৃত সত্যকে যাচাই ও সংস্কৃত করে নেওয়া চলবে। তাই তাঁরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের সূক্ষ্ম, নিখুঁত অর্থ নিয়ে বেশী মাথা ঘামাননি। কখনও বা একে নির্দিষ্ট সংখ্যা বলে বর্ণনা করেছেন, আবার কখনও বা ইচ্ছানুসারে পরিবর্তনীয় পরিমাণ বলে মনে করেছেন। তাঁরা 'বহমানতা' (Continuity)-র সঠিক অর্থটা কি, একথা ভাবতে বসেন নাই — সময় যে অর্থে 'বহমান' অর্থাৎ একটি মুহূর্ত যেমন পরবর্তী মুহূর্তের সঙ্গে বেমালুম মিশে যায়, 'পরিমাণ'ও সেই অর্থে বহমান কিনা, এসব কথাও চিন্তা করবার অবসর পাননি। তাঁদের প্রয়োজন ছিল, 'অজানা' জগৎটা তাড়াতাড়ি দেখে যতটা জানতে পারি, আগে জেনে নেই। উদাহরণস্বরূপ, ডেকার্টে যখন স্বীকৃতি হিসাবে ধরে নিলেন, 'যে কোনও সংখ্যার সঠিক অবস্থান গ্রাফ কাগজের উপর একটি বিন্দু বা রেখা দ্বারা নির্দেশ করা যায়।' তখন এই স্বীকৃতির সম্পূর্ণ তাৎপর্য কি, তা ভাবতে বসেননি। তিনি এইটুকু মেনে নিয়েই সন্তুষ্ট হলেন যে, একটি রেখার উপরকার অসংখ্য বিন্দুর সঙ্গে সংখ্যা-স্কেলের যে-কোনও দুটো সংখ্যার মধ্যবর্তী অগণিত সংখ্যা-নির্দেশক বিন্দুর মধ্যে একক সম্বন্ধ বিদ্যমান রয়েছে। রেখার উপরকার 'অসংখ্য' বিন্দুর সংখ্যা আর দুটো পরিমাণ বা রাশির ভিতরকার 'অগণিত' রাশির সংখ্যাকে সমান বলে ধরে নেওয়া চলে কিনা, এসব কথা ভাবেননি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ, 'গউস' (Gauss)-ই গণিতকে বর্তমান খাতে পরিচালিত করে দিয়েছেন। তাঁর কথা আলোচনা করবার পূর্বে বর্তমান উচ্চ গণিতের কয়েকটা বিশেষ ধারণার উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে দু'-একটি কথা বলে নিই। গাণিতিক ফাংশনাদির নামকরণে সর্বদা হুঁশিয়ার থাকা যায়নি। তাই অতীতের অনেক বে-মানান নাম বর্তমানেও চালু থেকে বেশ খানিকটা গোলমাল বাধিয়ে দেয়। যেমন — sine-এর অর্থ বক্ষ, কিংবা বক্ররেখা কিন্তু নির্দেশ করে বৃত্তস্থ একটি জ্যা-র অর্ধাংশ; surd-এর অর্থ বধির বা ঠসা, কিন্তু নির্দেশ করে এমন একটি সংখ্যা যা দুটো পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত দিয়ে প্রকাশ করা যায় না; algebra-র অর্থ পুনর্মিলন, কিন্তু নির্দেশ করে 'সংখ্যা বিজ্ঞান' যার গ্রিক নাম ছিল arithmetike; calculus-এর অর্থ নুড়ি, কিন্তু নির্দেশ করে অঙ্কের এমন একটা শাখা যার সঙ্গে নুড়ি কিংবা প্রাচীন গণন-তক্তা 'আবাকাস'-এ ব্যবহৃত দানার সঙ্গে এর কোনও দূর-সম্পর্ক নেই; mathematical induction-এর অর্থ গাণিতিক পরীক্ষা-সাপেক্ষ কিছুটা সংশয়যুক্ত সম্প্রসারণ যুক্তি, কিন্তু এর সঙ্গে প্রকৃত পক্ষে সংশয়ের

লেশমাত্রও নেই; plus মানে অধিক, minus মানে উন, অথচ প্রয়োগ-ক্ষেত্রে 'দিক'-ও নির্দেশ করে। inertia মানে চলৎশক্তিহীন; অথচ এটা বস্তুর এমন একটা গুণ, যার জন্য উক্ত বস্তু হয় নিশ্চল থাকে, কিংবা অপরিবর্তিত গতিতে চলতে থাকে; আর real অর্থ প্রকৃত এবং imaginary অর্থ কাল্পনিক, অথচ যাকে কাল্পনিক সংখ্যা বলে, তা-ও সমতলের উপর একটি বিন্দু, আবার যাকে প্রকৃত সংখ্যা বলে সে-ও তাই।

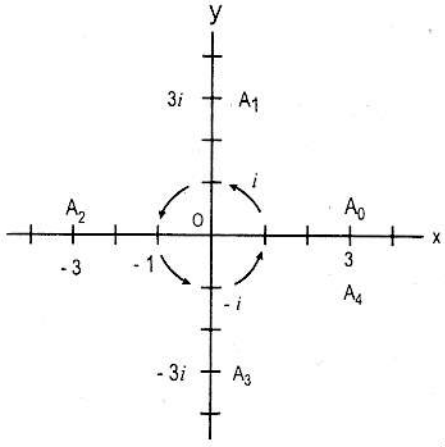

চিত্রে OA_0 একটি সংখ্যা, কেন্দ্রবিন্দু O থেকে তিন ইঞ্চি দূরে, পূর্বদিকে অথবা ইচ্ছামত কল্পিত x-অক্ষের উপর অবস্থিত। একে আমরা বলি সংখ্যাটার পরিমাণ ও একক। আবার যদি সেই তিন ইঞ্চি দূরেই y-অক্ষের উপর হয়, তবে আমরা বলি OA_1 সংখ্যাটার পরিমাণ $3i$ একক। পার্থক্য শুধু এই যে OA_0 যেখানে ছিল, তার থেকে এক সমকোণ ঘড়ির উল্টো দিকে ঘুরে গিয়েছে। তাই i দিয়ে গুণ হয়েছে। আবার ঐ দিকেই আর এক সমকোণ ঘুরে গেলে x-অক্ষের বিপরীত দিকে যাবে, তাই তখন আমরা বলি OA_2 সংখ্যাটার পরিমাণ $3ii=3i^2$ বা -3। এইভাবে মোট তিন সমকোণ ঘুরলে বলি OA_3 সংখ্যাটার পরিমাণ $3iii=3i^3$ বা $-3i$, আর চার সমকোণ ঘুরে পূর্ব স্থানে আসলে বলতে পারি, OA সংখ্যাটার পরিমাণ $3iiii=3i^4$ বা 3।

আসলে, আমরা এক সমকোণ ঘোরার প্রক্রিয়াটার একটা নাম দিয়েছি i; আর দুই সমকোণ ঘোরাকে i^2, তিন সমকোণ ঘোরাকে i^3 ও চার সমকোণ ঘোরাকে i^4 বলেছি। এতে দেখা যাচ্ছে যে, $i^2=-1$, $i^3=-i$ আর $i^4=1$ অর্থাৎ আমরা -1 এর বর্গমূল $\sqrt{-1}$ এর একটা নাম দিয়েছি i। ঘুরণ প্রক্রিয়ার সম্পর্কে ফেলে ব্যাপারটা দেখলে i সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, অর্থাৎ প্রকৃত; এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। আমরা ত ষোড়শ শতাব্দীর আগে -1-কেও সংখ্যা বলে স্বীকার করতে ইতস্ততঃ করতাম। খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে ডাইওফ্যান্টাস $4x+20=4$ সমীকরণটিকে অসম্ভব বলে রায় দিয়েছেন; আবার ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফিবোনাক্কি (Fibonacci)-ও বিয়োগ সংখ্যা সাধারণতঃ অগ্রাহ্য করেছিলেন, তবে লাভ-ক্ষতি সম্পর্কিত সমীকরণে বিয়োগাত্মক সমাধানকে লাভ না বলে ক্ষতি বলে ব্যাখ্যা করেছেন। অবশেষে ষোড়শ শতাব্দীতে এসে দেখতে পাই ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দে কার্ডান সমীকরণের বিয়োগ-চিহ্নিত সমাধান স্বীকার করে গেছেন। তখনও এ ধারণা কেবল গণিতজ্ঞদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশেষে ভিয়েটা, নেপিয়ার, ফের্মা ও ডেকার্টের চেষ্টায় ধীরে ধীরে বিয়োগ সংখ্যা সর্বজনের স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাই এখন

বিয়োগ সংখ্যার কথা শুনবামাত্র আমাদের মনে চট করে একটা বিপরীত 'দিক'-এর কল্পনা আসে; (সোজা দিকটা অবশ্য আগে থেকেই যোগ সংখ্যার জন্য রক্ষিত হয়ে আছে।) আবার $\sqrt{-1}$-এর সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় হয়ে গেলে; i দেখেই সঙ্গে সঙ্গে ৯০° ডিগ্রী বা এক সমকোণ পরিমাণ সংখ্যার স্কেল ঘুরে যাওয়ার কথা মনে আসবে। এই 'প্রকৃত' ও 'কাল্পনিক' সংখ্যার নামকরণ করেন ডেকার্ট। যা হোক, কাল্পনিক সংখ্যার ধারণা পরিচিত হতে কয়েক শতাব্দী লেগে গেছে। ১৫৮৫ খ্রীস্টাব্দে Simon Stevin স্বীকার করেছেন যে $\sqrt{-1}$-এর ধারণা অনেকের মনেই স্পষ্ট হয়নি। ডেকার্ট তো $\sqrt{-1}$-কে 'কাল্পনিক' সংখ্যা বলেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু লাইবনিজ প্রমাণ করেছিলেন যে, এসব সংখ্যার উপর কতকগুলো আলজেব্রিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অয়লার ও ডি' মোয়াভার ত্রিকোণমিতিতে এর প্রয়োগ করেছিলেন। ১৮৩২ সালে গউস i যুক্ত সংখ্যার নাম দেন complex বা 'জড়িত' সংখ্যা। 'জড়িত সংখ্যা'র খানিকটা 'প্রকৃত' সংখ্যা আর খানিকটা তথাকথিত 'কাল্পনিক' সংখ্যা; যেমন $a+bi$। যে-কোনও প্রকৃত সংখ্যাকে 'জড়িত সংখ্যা'র বিশেষ একটা sub-group বা 'উপশাখা বলা যায়। কেবল এখানে 'কাল্পনিক' অঙ্কটুকুর পূরক শূন্য, অর্থাৎ a+0i। তা'হলে সমুদয় সংখ্যাকেই জড়িত সংখ্যা বলে। সংখ্যার নিম্নলিখিত শ্রেণী বিভাগ করা যেতে পারে :

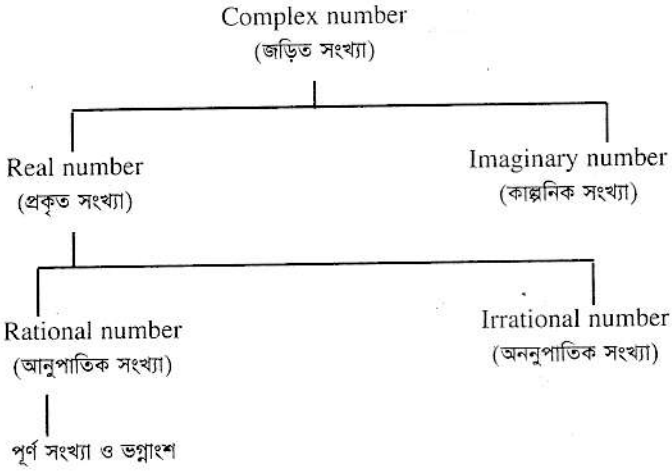

জড়িত সংখ্যাকে 'ভেক্টর' বা সদিক সংখ্যারূপে গ্রাফ কাগজে প্রকাশ করা যায়।

সামন্তরিক চিত্রটিতে (পরের পৃষ্ঠায়) যদি OP-এর দিকে একক ভেক্টরকে $\vec{i}$ এবং OQ-এর দিকে একক ভেক্টরকে $\vec{j}$ বলা হয়, তবে এই দুটো যোগ দিলে হবে যোজিত ভেক্টর OR। এখন OR-এর দিকে একক ভেক্টর ধরলে, যদি OP, OQ, OR-এর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে x, y, r একক হয় — তা' হলে বলা যাবে :

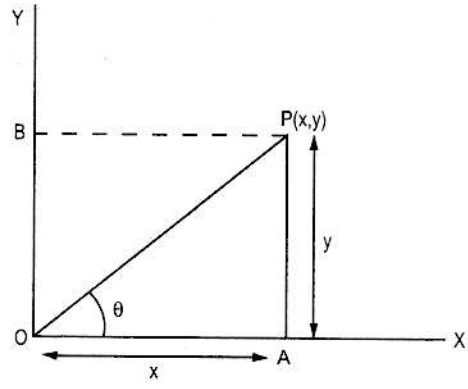

(আয়ত চিত্র)

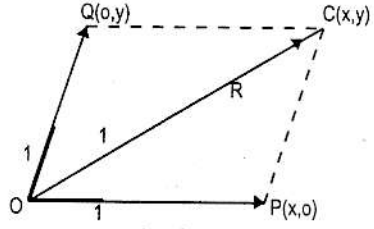

(সামন্তরিক চিত্র)

$\vec{x}\,a + \vec{y}\,b = \vec{r}\,c$

এস্থলে a, b, c তিনটেই আপন আপন দিকে একক ভেক্টর, আর x, y, r এ তিনটে 'স্কেলার' বা 'নির্দিক' গুণিতক।

আয়ত চিত্রে P যদি x, y বিন্দু, O মূল বিন্দু, আর x ও y অক্ষের দিকে ভেক্টরের একক যথাক্রমে $\vec{i}$ ও $\vec{j}$ হয়, তবে বলা যায় P বিন্দুটি xi+yj ভেক্টর নির্দেশ করে, অথবা $\vec{OP}$ Vector-এর পরিমাণ $\vec{x}\,i + \vec{y}\,j$।

আমরা পোলার অক্ষ ব্যবহার করে xi+yj বিন্দুকে r Cos θ হিসাবে লিখতে পারি।

$xi+yj$-এর দৈর্ঘ্য $= \sqrt{x^2 + y^2} = r$

$\vec{OA}$(=x), $\vec{OP}$(=xi+yj)-এর মধ্যেকার কোণকে θ ধরলে $\tan\phi = \frac{y}{x}$, অন্যকথায় $\phi = \tan^{-1}\frac{y}{x}$। এ স্থলে r-কে বলে ভেক্টরের মড্যুলাস (Modulus) এবং θ-কে এর আর্গুমেন্ট (Argument)।

এখন পোলার অক্ষ ব্যবহার করে xi=yj ভেক্টরটাকে লেখা যায় $r_e{}^{i\theta}$ বা r(Cos θ+i Sin θ) রূপে। একক বিন্দু O থেকে x অক্ষ ধরে r একক অগ্রসর হয়ে, যদি θ পরিমাণ কোণে ঘুরে যায়, তা' হলে P বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছাবে। এইভাবে যে-কোনও বিন্দুতে পৌঁছাতে পারা যায়। অবশ্য θ এক সমকোণ হলে ঐ বিন্দুটি ri অবস্থানে, দুই সমকোণ

হলে –r অবস্থানে, তিন সমকোণ হলে –ri অবস্থানে এবং চার সমকোণ হলে আবার r অবস্থানে ফিরে আসবে।

কার্টিসিয়ান অক্ষ ব্যবহার করে সহজে যোগবিয়োগ করা যায়; আর পোলার অক্ষের সাহায্যে অতি সহজে গুণ-ভাগ, বর্গমূল, ঘনমূল ইত্যাদি মূল আকর্ষণ [নির্ণয়]করা যায়। জড়িত সংখ্যাগুলো যদি $r_1e^{i\phi_1}$ ও $r_2e^{i\phi_2}$ হয়, তবে এদের গুণফল হবে $r_1r_2e^{i(\phi_1+\phi_2)}$, আর ভাগফল হবে $\frac{r_1}{r_2}e^{i(\phi_1-\phi_2)}$; $re^{i\phi}$ -এর বর্গ $r^2e^{2i\phi}$, বর্গমূল হবে $r^{\frac{1}{2}}e^{\frac{1}{2}i\phi}$ ইত্যাদি। জড়িত সংখ্যার গুণাবলী নির্ণয়ে ডি' মোয়াভারের উপপাদ্য প্রচুর কাজে লেগেছে, যদিও তখন পর্যন্ত 'জড়িত-সংখ্যা' নামকরণ হয়নি।

এব্রাহাম ডি' মোয়াভার জন্মগ্রহণ করেন ১৬৬৭ সালে ফ্রান্সের অন্তর্গত ভিট্রী নামক স্থানে। তাঁর পিতামাতা প্রটেস্ট্যান্ট খ্রীস্টান ছিলেন। তাই ১৬৮৫ খ্রীস্টাব্দে 'নান্টিস' আদেশ প্রত্যাহার করার ফলে তাঁদের ফ্রান্স ত্যাগ করতে হয়। চতুর্থ হেনরীর আমলে ১৫৯৮ খ্রীস্টাব্দে নান্টিস আইন ঘোষণা করা হয়েছিল। এই আইন বলে 'হুগুনট' অর্থাৎ ফরাসি প্রটেস্ট্যান্টরা তাঁদের ধর্মানুষ্ঠানের অধিকার এবং আরও কয়েকটা নাগরিক অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ১৬৮৫ খ্রীস্টাব্দে ম্যাডেম ডি' মেন্টিননের প্রভাবে পড়ে চতুর্দশ লুই এই আদেশ প্রত্যাহার করেন। তার ফলে দেশ থেকে বহু উপযুক্ত লোক আর সুদক্ষ কারিগর (worker) উৎখাত হয়। ডি' মোয়াভার লন্ডনে গিয়ে অঙ্কের শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। শোনা যায়, তিনি নিউটনের একখানা প্রিন্সিপিয়া জোগাড় করে তার দু'-একটা পাতা ছিঁড়ে পকেটে করে নিয়ে বেড়াতেন; আর অবসর পেলেই তা পড়তেন। সে যা হোক, নিউটনের সঙ্গে তাঁর খুব সদ্ভাব হয়েছিল আর নিউটন-লাইবনিজ বিতণ্ডার বিচারের জন্য তিনিও রয়াল সোসাইটি কর্তৃক একজন সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ডি' মোয়াভার তাঁর উপপাদ্য ব্যবহার করে ত্রিকোণমিতির উচ্চশাখার রূপই একদম বদলে দিয়েছিলেন; তবু 'সম্ভাবনা-তত্ত্বের' বিকাশ সাধনেই তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ দান রেখে গেছেন। তিনি রয়াল সোসাইটির মেম্বর ত ছিলেনই, তাছাড়া ফরাসি বিজ্ঞান একাডেমী ও বার্লিন একাডেমীরও বৈদেশিক সভ্য ছিলেন। তবু, সাতাশি বছরের দীর্ঘ জীবনের শেষের দিকে তিনি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েন — তাঁকে সেন্ট মার্টিন লেনের এক সরাইখানায় বসে সম্ভাবনা-নির্ভর জুয়াখেলা সংক্রান্ত প্রশ্নাদির সমাধান করে জীবনধারণ করতে হয়। অবশেষে তিনি অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন, প্রতি রাত্রেই তাঁর ঘুমের মাত্রা বাড়তে থাকে। শেষবার তিনি ত ২৪ ঘণ্টারও অধিক ঘুমিয়ে থেকে ঘুমোতে ঘুমোতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

ডি' মোয়াভারের উপপাদ্যের সাহায্যেই, সর্বপ্রকার এককের যে-কোনও মূলকে একক বৃত্তের উপরিস্থিত বিন্দুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু জার্মানির সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ গউস (Gauss), যিনি 'জড়িত সংখ্যা' নামটা উদ্ভাবন করেছিলেন, তিনিই বিশদভাবে এই সংখ্যার জ্যামিতিক তাৎপর্য পর্যালোচনা করেন। গউস-এর জন্ম হয় ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রান্সউইক শহরে। তিনি যে পরিবার থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন, তাঁরা বহু পুরুষ ধরে মালী, রাজমিস্ত্রী, ভাস্কর প্রভৃতি পরিশ্রমের কাজ করে জীবিকা অর্জন করতেন। গউসও যে রাজমিস্ত্রীর কাজেই জীবন অতিবাহিত করেননি, তা একরকম দৈব ঘটনা। তিনি প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়েই বিশেষ অঙ্ক-নিপুণতার পরিচয় দেন। এমন কি, তাঁর

বয়স যখন মাত্র দশ বছর তখনই তাঁর স্কুলের শিক্ষক বলেছিলেন, গউস তাঁর সব বিদ্যাই আয়ত্ত করে ফেলেছে,। পরে গউস আলজাব্রা শিখতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর প্রতিভার কথা ব্রান্সউইকের ডিউকের কর্ণগোচর হয়। তখন তিনি গউসের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। ১৭৯২ সালে (পনর বছর বয়সে) গউস-এর ল্যাটিন ভাষায় বেশ দখল হয়ে গিয়েছিল; আর অঙ্কশাস্ত্রেরও মোটামুটি জ্ঞান হয়েছিল। তিনি ব্রান্সউইকের ক্যারোলিন কলেজ থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন, তারপর ডিউকের ইচ্ছায় আঠার বছর বয়স পর্যন্ত সেখানে থেকেই অয়লার, লাগ্রাঞ্জ ও নিউটনের সমুদয় পুস্তক এত সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেন যে, তাঁর প্রফেসরেরাও স্বীকার করলেন যে গউসও তাঁদের সমকক্ষ হয়ে গেছেন। তারপর গউস গোটিঙ্গেনে গিয়ে অঙ্কশাস্ত্রের চর্চা করে 'সংখ্যাতত্ত্ব' (Theory of Numbers)-এ কতকগুলো প্রধান আবিষ্কার করে ফেললেন। এরপর ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে ব্রান্সউইকে ফিরে এসে অঙ্কের টিউটর হিসাবে সামান্য বেতনে কাজ করতে থাকেন; এই সময়ের মধ্যে (১৮০১ সালে) তিনি Disquisitione Arithmeticae (গণিত-প্রসঙ্গ) নামে একখানা পুস্তক প্রকাশ করেন। এর ফলে 'সংখ্যাতত্ত্বে' এক যুগান্তর উপস্থিত হয় এবং নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তন হয়। গউস জীবনের প্রথম দিকেই এইসব গবেষণা করেছিলেন এবং তাঁর পুস্তকই এ বিষয়ে আদর্শ পুস্তক বলে পরিচিত ছিল।

সারাজীবনই গণিতের এই শাখাটা তাঁর অতিশয় প্রিয় ছিল। এ বিষয়টা দেখতে সহজ মনে হলেও আসলে কিন্তু বেশ জটিল ও দুরূহ। তিনি বলতেন, 'অঙ্কই বিজ্ঞানের সম্রাজ্ঞী, আর অঙ্কশাস্ত্রের রানীই হচ্ছে পাটীগণিত'। (অবশ্য গউসের আমলে অঙ্ক বা পাটীগণিত বলতে সংখ্যা সংক্রান্ত সমুদয় তত্ত্বই বুঝাত, এখনকার মতো শুধু খড়ি পেতে যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ করাই নয়।)

জ্যোতিষ্ক-সংক্রান্ত বিষয়ে গউস বহু সংখ্যক আবিষ্কার ও হিসাব করেন। এতে তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ১৮০৭ সালে তিনি দুটো লোভনীয় প্রস্তাব পান। প্রথম, সেন্টপিটার্সবার্গে গণিতশাস্ত্রের প্রফেসরের পদ; আর দ্বিতীয়, গোটিঙ্গেনের নব-প্রতিষ্ঠিত বীক্ষণাগারের ডাইরেক্টর ও জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রফেসরের যুগ্ম-পদ। গউস এই দ্বিতীয় প্রস্তাবটিই গ্রহণ করে ৪৮ বৎসর কাজ করে এখানেই জীবনাবশেষ করেন।

জীবনের অধিকাংশ সময়েই তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় নিয়োজিত থেকে ব্যবহারিক জ্যোতিষ্ক-বিজ্ঞানের অনেক উন্নতিসাধন করে গেছেন; তবু তিনি বিদ্যুৎ ও চুম্বক সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেছেন। এই সম্পর্কে তিনি গোটিঙ্গেন থেকে নিকটবর্তী এক শহরে টেলিগ্রাফিক সঙ্কেত প্রেরণের সম্ভাব্যতা সকলের সামনে প্রদর্শন করেন। এইভাবে তিনি গ্যালভানি (১৭৩৭-১৭৯৪), ভল্টা (১৭৪৫-১৮২৭) এবং অ্যামপিয়র (১৭৭৫-১৮৩৬) প্রভৃতি বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা যে ধারায় চিন্তা করেছিলেন, তার বিকাশ সাধন করেন।

তাঁর জ্যোতিষ-বিদ্যা ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের চর্চার ফাঁকে ফাঁকে তিনি বিশুদ্ধ গণিতের প্রায় প্রত্যেক শাখায় গবেষণা করে নতুন দান রেখে গেছেন। সংখ্যা-তত্ত্বের কথা ত আগেই বলা হয়েছে। 'কাল্পনিক সংখ্যাকে' 'জড়িত সংখ্যা' আখ্যা দিয়ে তিনি যে সব মৌলিক সম্পদ রেখে গেছেন তাও উল্লিখিত হয়েছে। সংখ্যা-স্কেলের বিচ্ছিন্ন (discrete) সংখ্যা-বিষয়ক তথ্যাদি ছাড়াও নিউটন ও লাইবনিজ যে সব বর্ধিষ্ণু বিবর্ধমান সংখ্যার গুণাদি বিচার করে নতুন ক্যালকুলাস সৃষ্টি করেছিলেন, সেদিক দিয়েও লাগ্রাঞ্জ ও লাপ্লাসের সঙ্গে তিনিও আধুনিক গাণিতিক বিশ্লেষণের ভিত্তি নির্মাণকারক হিসাবে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

অন-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির অগ্র-সাধকদের মধ্যে তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। এই ধরনের প্রথম জ্যামিতিক উদ্ভাবক হিসাবে কাজান (Kazan) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকোলাস আইভ্যানোভিচ লোবাচেভ্স্কী (Nikolas Ivanovitch Lobachevsky)-র নাম বিখ্যাত। ইউক্লিডীয় ও অন-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির পার্থক্য অনুধাবন করবার সহজ উদাহরণস্বরূপ সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত একটি সরল রেখার দুইটি পৃথক বিন্দুর ভিতর দিয়ে ঐ সরল রেখার উপর একই সমতলে দুটো লম্ব কল্পনা করুন। এই শেষোক্ত সরল রেখাদ্বয় উভয় দিকে যতদূর ইচ্ছা বর্ধিত করলেও কখনও এরা পরস্পর ছেদ করে না। এখন পৃথিবীর দুটো দ্রাঘিমার কথা ধরুন। এদের উভয়ে বিষুব রেখার সঙ্গে সমকোণে মিলিত হয়েছে, তবু এরা উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু — এই দুটো বিন্দুতে পরস্পর ছেদ করেছে। ইউক্লিডের জ্যামিতি সমতল ক্ষেত্রের উপর অঙ্কিত রেখা ও ক্ষেত্রাদি সম্বন্ধে কতকগুলো স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকৃতির উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এর মধ্যে এক স্বীকৃতি হচ্ছে সমতল ক্ষেত্রের উপর অঙ্কিত সমান্তর সরল রেখা সম্বন্ধে। কিন্তু যখন বক্রতলের উপর অঙ্কিত চিত্রাদি বিবেচনা করা হয়, তখন ইউক্লিডের জ্যামিতির বহির্ভূত অন্য স্বীকৃতিও গ্রহণ করায় কোনও আপত্তি থাকতে পারে না; কারণ এদের প্রয়োগক্ষেত্র স্বতন্ত্র।

এইরকম একটা জ্যামিতি লোবাচেভ্স্কীর আর একটি গউসের স্বল্পকালীন শিষ্য রিমান্ন (Reimann)-এর রচিত। ফেলিক্স ক্লেন (১৮৪৯-১৯২৫) দেখিয়েছেন, এই তিন ধরনের জ্যামিতিকেই অপর একটি 'সাধারণ জ্যামিতি'র বিশেষ বিশেষ শাখা বলে কল্পনা করা যায়।

গণিতশাস্ত্রের সব শাখাতেই পারদর্শী যে-সব মহারথী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে গউসকেই সর্বশেষ গণিতজ্ঞ বলা যায়। এরপর থেকে গণিতশাস্ত্র বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে এত তাড়াতাড়ি এত বিচিত্র ধারায় অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে যে, এখন এর সমস্ত শাখার অধিকার লাভ করা কোনও একজনের পক্ষে সম্ভবপর নয়। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বহু সহস্র গণিতজ্ঞ এক-একটি ক্ষুদ্র শাখা অবলম্বন করে বিশুদ্ধ অথবা ফলিত গণিতের পাতায় পাতায় বিচরণ করেছেন ও করছেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁরা যে শুধু বিভিন্ন শাখায় অভাবনীয় উন্নতিই করেছেন, তা নয়, তাঁরা ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর অগ্র-পথিকদের সৃষ্ট গাণিতিক অস্ত্র-শস্ত্রগুলোকে ঘষে-মেজে তীক্ষ্ণ ও শাণিত করে ফেলেছেন।

কিন্তু এসব বিষয়ের বর্ণনা দিতে যাওয়ার চেষ্টা বৃথা। একে ত অতি বিশিষ্ট পারিভাষিক ভাষার ব্যবহার না করে এগুলোর বিবরণ দেওয়ায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে, তা'ছাড়া গউসের সময় থেকে এ পর্যন্ত এত বিভিন্ন ও বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গবেষণা হয়েছে যে, সে-সবের একটা সংক্ষিপ্ত খসড়া দিতে গেলেও কয়েকশো পৃষ্ঠার প্রয়োজন। আবার বিশুদ্ধ গণিতের বিবিধ উন্নতির সঙ্গে পরিচিত না হয়ে বিদ্যুৎ, আলোক, তাপ, শব্দ, স্থিতিস্থাপকতা, গতিবিজ্ঞান, তরল ও বায়ুর গতি-প্রবাহ প্রভৃতি বিষয়ে যে বিপুল উন্নতি সাধিত হয়েছে সে-সবের তাৎপর্য বোঝাও অসম্ভব। প্রাচীন গ্রিক গাণিতিক, দার্শনিক ও যুক্তিবিদেরা যতদূর অগ্রসর হয়ে থেমে গিয়েছিলেন, তার সীমার বহির্দেশের বিস্তীর্ণ অনাবিষ্কৃত রাজ্যে যুক্তি-তর্কের সূক্ষ্মজাল অগ্রাহ্য করে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর গণিতজ্ঞেরা অবাধ বিচরণ শুরু করেছিলেন। তারপর যুক্তি-তর্কের সামঞ্জস্যের দিক দিয়ে আর বিষয়বস্তুর প্রাচুর্যের দিক দিয়ে বহু উন্নতি সাধিত হয়েছে। গণিতশাস্ত্রের অন্তর্নিহিত দর্শন সম্পর্কেও বহু গবেষণা হয়েছে। এই সবের মধ্যে সাধারণ জীবন-যাপনের

প্রয়োজনের বাইরে এমন সব আজগুবি বিষয় রয়েছে যে, এ-সব যে-কোনও দিন কোনও বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে, তা মনেই হয় না। তবু দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখা যায়, আজ যা বিশিষ্ট গণিতজ্ঞের সম্পূর্ণ চিন্তাজাত কল্পনা, কালই তা সকলের চিন্তায়ত্ত হয়ে পড়ছে।

আরিস্টোটল অঙ্কশাস্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন — 'গণিত হচ্ছে পরিমাণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান'। আজকার দিনের গণিতজ্ঞেরা আর এ সংজ্ঞা গ্রহণ করতে রাজি নন। ১৯০৩ সালে বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছিলেন, 'যুক্তিনীতির উপর যুক্তিনীতি প্রয়োগ করে যে সব সিদ্ধান্ত করা যায়, তারই নাম বিশুদ্ধ গণিত'। আর এক সময় তিনি বর্তমান বিশুদ্ধ গণিতের বস্তু-নিরপেক্ষ ভিত্তির উপর বিশেষ ঝোঁক লক্ষ্য করে বলেছিলেন — 'গণিত এমন একটি বিদ্যা যাতে কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তা-ও জানা নাই, আবার যা বলা হচ্ছে তা-ও সত্যি কিনা তার ঠিক নাই।'

সাধারণ লোকের, অবশ্য এসব ফিলজফিতে আসক্তি নাই; তবু তারা এসবের ভিতর মাথা না গলিয়েও মোটের উপর সত্যভাবেই এই ধারণা পোষণ করতে পারে যে, বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা সৃষ্টিতে গণিত এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছে, আর একে বজায় রাখবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চালাচ্ছে। তা'ছাড়া, মানুষের ইতিহাসে গণিতের অগ্রগতি ও স্থিতিশীলতার পর্যায় লক্ষ্য করে সাধারণ মানুষেও দেখতে পারে যে, চার-পাঁচ শতাব্দী যাবৎ গ্রিক সভ্যতার স্বর্ণযুগ বর্তমান ছিল, সেই সময়েই তাঁদের গণিত বিদ্যারও সর্বাধিক উন্নতি হয়। তারপর ইউরোপীয় রেনেসাঁর আবির্ভাব হওয়ার পরেও পাঁচ শতাব্দী ধরে বিপুল উৎসাহে চিন্তা-চর্চা চলেছিল। পক্ষান্তরে আর্কিমিডিসের মৃত্যুর কিছু পর থেকেই অন্ধকার যুগ ও মধ্যযুগের স্থিতিশীল অবস্থায় গণিতেরও স্থিতিশীল ঘুরপাক খাওয়ার বিষয় লক্ষণীয়। বাণিজ্যিক ক্রয়-বিক্রয়ের খসড়া দেখে যেমন দেশের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি মানুষের গাণিতিক অগ্রগতির তালিকাও তার মনন-শক্তি ও জীবন-শক্তির পরিচয় বহন করে।

কেমন সহজ আটপৌরে চিন্তা থেকে ধীরে ধীরে গণিতের বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে, আর গণিতের বিভিন্ন শাখার মধ্যে পারস্পরিক সংস্রব থাকাতে কেমন করে এক বিষয়ের উৎকর্ষ অন্য বিষয়ে খাটিয়ে শেষোক্ত বিষয়েরও উন্নতি সাধিত হয়েছে, এ-সব কথা ইতিহাসের মারফত সাধারণের কাছে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি।

গণিতবিদ্যা যে শুধু বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার এবং আনুষঙ্গিক সম্পদ ও ক্ষমতার চাবিকাঠি মাত্র, তা নয়। এর সাহায্যে আমাদের রহস্যজনক বিশ্ব সম্বন্ধেও পূর্ণতর জ্ঞান লাভ হয়; আর এর চেয়েও বড় কথা — এর চর্চা দ্বারা চিন্তাশীল নরনারী মাত্রেই এমন একটা মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারেন, যার বর্ণনায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেছেন :

'... that held acquaintance with the stars and wedded soul to soul in purest bond of reason, undisturbed by space or time' — 'গণিতশাস্ত্রের বিশুদ্ধ জ্ঞান-চর্চা ও রহস্য-উদ্‌ঘাটন প্রচেষ্টায় মানুষ সুদূর নক্ষত্রের সঙ্গেও আত্মীয়তা পাতায় এবং নির্মল যুক্তির বন্ধনে আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন ঘটায়; আর সে মিলনে দেশ-কালের ভেদ নাই'।

গণিত-ইতিহাস পর্যালোচনা দ্বারা এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের, এবং সনাতনের সঙ্গে অধুনাতনের চিন্তাধারার সংযোগ, সমন্বয় ও পরিপুষ্টি লক্ষ্য করে বিশ্ববাসী সকলের পরস্পর নির্ভরশীলতা আর একই বিরাট লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রগতি সম্বন্ধে ধারণা কিছুটা স্পষ্ট হলে হয়ত সামগ্রিক জীবনযাপনের মধ্যেও ঔদার্য ও মাধুর্যের সঞ্চার হওয়া অসম্ভব নয়।

সেকায়েপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট

২০১৬ শিক্ষা বছরে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির মূল্যায়ন পরীক্ষায় বিজয়ীদের জন্য মুদ্রিত

দশম শ্রেণির পুরস্কার

বিক্রির জন্য নয়